প্রশ্নোত্তরের মুখোমুখি বই এর লেখা নিচ থেকে

লেখকের কথা

আমি মনে প্রানে বিশ্বাস করি একজন মানুষের দৃষ্টিঙ্গীর পরিপূর্নতাপ্রাপ্তি ঘটা উচিত। মানুষের শুধু আকৃতির মানুষ নয়, প্রকৃত মানুষ হওয়া উচিত। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকেই হওয়া উচিত ইতিবাচক মনোভাব সম্পূর্ণের অধিকারী। ইতিবাচক মনোভাব সম্পন্ন মানুষ স্বভাবগুনেই হোক আর যে কোনও কারনেই হোক তারা-সব কাজেই ইতবাচক ফলাফল প্রত্যাশা করে। পÿান্তরে, নেতিবাচক মনোভাব সম্পন্ন মানুষের জীবনে এসে ভীড় করে অসহিষ্ণুতা ÿোভ, অধৈর্য, অসুস্থতা। পরিবারে, সমাজে সর্বত্র তাদের ÿেত্রে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি হয় যা কোনও ভাবেই কাম্য নয়। আর আমি আমার দীর্ঘ ১৬ বৎসরের গবেষনা, চর্চার আলোকে বহু মানুষকে কাছে থেকে দেখেছি। চেষ্টা করেছি তাদের নেতিবাচক মনোভাব দূর করে ইতিবাচক মনোভাব সম্পন্ন করে তুলতে। তাদের সমস্যার কারন নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছি।

সেই সমস্যাগুলোর সমাধানও দিতে চেষ্টা করেছি। এর পরিপ্রেÿিতে আমাকে মানুষের মনোজগত নিয়ে প্রচুর গবেষনা করতে হয়েছে। সেই সঙ্গে অ্যাস্ট্রোলজি নিয়েও প্রচুর গবেষনা করতে হয়েছে। কারন সমস্যার সমাধান কখনও কখনও অ্যাস্ট্রোলজির দিক নির্দেশনা মোতাবেক দিতে হয়েছে। সর্বোপরি মেডিটেশন নিয়ে প্রচুর গবেষণালব্ধ ফলাফল ***"লাইফ শাইনিং মেথড"*** এর সাহায্যে আমি মেডিটেশনের জগতে নতুন কিছু দিতে চেষ্টা করেছি। এসবই করেছি মানুষের জন্য। আপনাদের জন্য। ফলkÖæতিতে আমাকে বহু সেমিনার, আলোচনায়, ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের মনোজগত, জ্যোতিষশাস্ত্র, মেডিটেশন সম্পর্কে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমি সবসময়ই সবার প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি। সেই সব প্রশ্নগুলো থেকে উjøখ্যযোগ্য কিছু প্রশ্ন মানুষের মনোজগত, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং মেডিটেশন ইত্যাদি সম্পর্কে এই বইয়ে সন্নিবেশিত হল এবং সেই সঙ্গে তার উত্তরও সন্নিবেশিত হল।

আমি আপনাদের সবাইকে আমার এই বইটি পড়ার জন্য আহবান করছি। সেই সঙ্গে এও আহবান করছি আপনার সবাই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমার বইটি পড়ুন।

আমাকে আরও প্রশ্ন করার থাকলে কiæন। এই বইটিতে সন্নিবেশিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার জন্য আমি যথেষ্ট গবেষনা করেছি যাতে উত্তরগুলো সবার কাছে গ্রহন যোগ্য হয়।

আশা করি পাঠক তার কৌতুহল নিবৃত্ত করতে পারবেন। এছাড়া ভবিষ্যতে মানুষের মনোজগত, অ্যাস্ট্রোলজি, মেডিটেশন ইত্যাদি সংক্রান্ত গবেষনার ব্যাপারে এই বইটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

সবাইকে ধন্যবাদ

গুiæজী
জীবন চৌধুরী গোল্ড মেডেলিষ্ট)
সাধক-জ্যোতিষী, উদ্ভাবক ও প্রশিÿক
LIFE SHINING METHOD
Method of Enhancement of mind power
সাইকি ভবন
১৬৯/১, কণকর্ড গ্রান্ড (৩য় তলা)
কÿ নং-২১০, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।
ফোনঃ ৮৩১৬৪৩৯, ৮৩১৭৫৮৭
ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩১৬৪৩৯

মানসিক চাপ/হতাশা সংক্রান্ত ২০টি প্রশ্ন এবং উত্তর

প্রশ্ন ঃ হতাশা কি অত্মহত্যার প্রবণতা বেশী বাড়ায়?

উত্তর ঃ অবশ্যই হতাশা আত্মহত্যার প্রবণতা বেশী বাড়ায়। যদিও হতাশাগ্রস্থদের সবাই আত্মহত্যার কারনে মারা যায় না। কিন্তু আত্মহত্যার প্রবণতা হতাশাগ্রস্থদের মাঝেই বেশী দেখা যায়। এÿেত্রে নারী-পুiæষ ভেদেও এক বিশেষ পার্থক্য পরিলÿিত হয়। চমকপ্রদ ব্যাপার হল যে, শতকরা ৭ ভাগ হতাশাগ্রস্থ পুiæষদের মাঝে আত্মহত্যার প্রবণতা বিদ্যামান, পÿান্তরে শতকরা ১ ভাগ হতাশাগ্রস্থ মহিলাদের মাঝে আত্মহত্যার প্রবণতা বিদ্যামান। এছাড়া আমরা যদি, আত্মহত্যার কারনে যারা গেছেন এমন লোকদের লাইফ টাইম হিস্টরী গবেষনা করি তাহলে দেখতে পাব যে, তারা কোন না কোন ভাবে হতাশায় ভুগছিলেন। সুতরাং হতাশা অবশ্যই আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন ঃ একজন মানুষ হতাশাগ্রস্থ কি না সেটা কিভাবে বোঝা যায়?

উত্তর ঃ মানুষ হতাশাগ্রস্থ কিনা সেটা বিভিন্ন ভাবেই বোঝা যায়। যেমন-একজন হতাশাগ্রস্থ মানুষের অনুভূতি হয় সাধারনতঃ দুঃখিত হওয়া কিংবা বেদনায় নীল হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। সে জীবনের কোনও কিছুই উভোগ করতে পারে না। কোনও সহজ কাঝ সম্পূর্ণ করতে যেয়ে সে কঠিন মনে করবে। অন্যরা যে বিষয়টিতে আনন্দ উচ্ছাস প্রকাশ করে হতাশাগ্রস্থ মানুষটি সে বিষয়টিতে বিরক্তি প্রকাশ করবে। সুতরাং একজন মানুষের মাঝে নিম্ন লিখিত লÿনগুলো দেখা গেলে আমরা বুঝবো যে সে হতাশাগ্রস্থ

(১) দুঃখিত থাকা, উদ্বিগ্ন থাকা, জেদী হওয়া কিংবা খালি মুডে থাকা,
(২) সব বিষয়ে আশা-ভরসাহীনতা প্রকাশ করা অর্থাৎ হতাশাগ্রস্থতা প্রকাশ করা,
(৩) সব সময় অসহায় বোধ হওয়া এবং নিজেরকে অকারনে দোষী সাব্যস্থ করা,
(৪) কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলা অথবা কাজে আনন্দ খুঁজে না পাওয়া,
(৫) সব সময় ক্লান্ত বোধ হওয়া কিংবা এনার্জি খুঁজে না পাওয়া, সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা,
(৬) কোন কিছুতে মনযোগ কেন্দ্রীভূত করনে ব্যার্থ হওয়া,
(৭) অকারনে বিরক্তি প্রকাশ করা,
(৮) খাদ্য গ্রহন অভ্যাস কিংবা ÿুধা প্রবৃত্তিতে অযাচিত পরিবর্তন,
(৯) অব্যক্ত মাথা ব্যথা কিংবা শরীরের কোনও স্থানে অব্যক্ত ব্যথা,
(১০) অব্যক্ত মাথা ব্যথা কিংবা শরীরের কোনও স্থানে অব্যক্ত ব্যথা,
(১১) আত্মহত্যার প্রবণতা হওয়া ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ ডিপ্রেশনে ভুগছে এরকম একজন মানুষের চিকিৎসার উপার কি?

উত্তর ঃ হতাশাগ্রস্থ একজন মানুষ তার চিকিৎসার জন্য একজন সাইকিয়াট্রিস্ট এর কাছে যেতে পারেন। সাইকিয়াট্রিস্ট তাকে প্রয়োজন বুঝে সাইকোথেরাপী দিতে পারেন। সাইকোথেরাপীর মাধ্যেমে একজন হতাশাগ্রস্থ মানুষ তার চিন্তাশীলতাকে আস্তে আস্তে উন্নত করতে পারে। এভাবে তার অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে। সাইকোথেরাপী একা একা তাকে দেওয়া যেতে পারে কিংবা তার অবস্থা বুঝে পরিবার পরিজনদের সাথেও দেওয়া যেতে পারে এছাড়া একজন হতাশাগ্রস্থ মানুষ মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে তার হতাশাগ্রস্থতা একেবারে দূর করতে পারে। একজন দÿ প্রশিÿকের সঠিক দিক নির্দের্শনা মোতাবেক সঠিক মেডিটেশন চর্চা একজন হতাশাগ্রস্থ মানুষের হতাশা সমূলে উৎপাটন করতে পারে। এছাড়া একজন মানুষ যদি আত্মসচেতন কিছু মাত্রায় হতে পারে তাহলে তার হতাশার কারন অনুসন্ধান করে নিজেই নিজেকে হতাশা থেকে মুক্ত করতে পারে। এ ব্যাপারে তার পরিবার পরিজনরা, প্রিয় বন্ধু-বান্ধবরা সাহায্য করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ সাধারনত কোন বয়সের মানুষের মাঝে মানসিক অসুস্থতা বেশী দেখা যায়? এর কারন কি?

উত্তর ঃ সব বয়সের মানুষই মানসিক অসুস্থতা বা অস্থিরতা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। শিশু, নারী পুiæষ সর্বোপরি সবাই-ই মানসিক অসুস্থতার শিকার হতে পারে। কিন্তু তারপরও ১৫-২৪ বছর বয়সেই প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে উঠে না। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তাদেরকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। নিজেদের সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, শিÿাগত অবস্থার সম্পর্কে সঠিক ধারনা তাদের তখনই হয়ে উঠে না। এ অবস্থার প্রেÿিতে তার চারপাশের পরিস্থিতি, বন্ধ-বান্ধব, চাওয়ার সাথে পাওয়ার অসমতা, পরিবার ইত্যাদি কারনে প্রভাবিত হয়ে সহজেই মানসিক অসুস্থার শিকার হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ হতাশায় ভোগা কি একটি মানসিক অসমতা?

উত্তর ঃ অবশ্যই হতাশায় ভোগা একটি মানসিক অসমতা। কিন্তু তাই বলে একজন মানুষ কখনই তার জীবদ্দশায় হতাশ হবে না তা নয়। অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতা, দুর্ঘটনা, অপ্রীতিকর পরিস্থিতি, অসুস্থতা ইত্যাদি কারনে সাময়িক ভাবে হতাশ হতেই পারে একজন মানুষ। কিন্তু তার ব্যাপ্তিকাল যেন কখনই দীর্ঘ না হয়, সেদিকে লÿ্য রাখতে হবে। হতাশা দীর্ঘস্থায়ী হলে কখনই মানুষ সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারবে না। সর্বোপরি মন-মানসিকতা, ইচ্ছাশক্তি বিনষ্ট হতেই থাকবে। বেইন আর কাজ করতে পারবে না সঠিকভাবে। মানসিক সমতা বিনষ্ট হলে কখনই মানুষ স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারে না। স্বাভাবিক কাজ কর্ম, সৃজনশীল কাজ-কর্ম করতে পারে না। আর হতাশা যদি সেই মানসিক অসমতার কারন হয়ে থাকে তাহলে হতাশায় ভোগা অবশ্যই একটি মানসিক অসমতা।

প্রশ্ন ঃ   হতাশাগ্রস্থ হওয়ার সাথে কেমিক্যাল ইমব্যালেন্স (Chemical Imbalance) এর কোনও সম্পর্ক আছে কি?

উত্তর ঃ স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের মানসিক কার্যাবলী পরিচালনার জন্য ব্রেইনে যে রাসায়নিক কার্যাদি সম্পন্ন হয় যখন আমরা হতাশাগ্রস্থ থাকি তখন ব্যাপারটি সেরূপ থাকে না। অর্থাৎ তখন স্বাভাবিক রাসায়নিক কার্যাদিতে কিছুটা হলেও পরিবর্তন পরিলÿিত হয়। সুতরাং হতাশাগ্রস্থ হওয়ার সাথে অবশ্যই Chemical Imbalanc-এর সম্পর্ক আছে।

প্রশ্ন ঃ   মানুসক অসুস্থতা কি চিকিৎসার উপযোগী ?

উত্তর ঃ অবশ্যই মানসিক অসুস্থতা চিকিৎসার উপযোগী। শারীরিক অসুস্থতার যেমন লÿন আছে। রোগের লÿন প্রকাশিত হওয়ার পর মানুষ ডাক্তারের কাছে যায়। তেমনি মানসিক অসুস্থতারও লÿন আছে। রোগ লÿন প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই সঠিক চিকিৎসার প্রয়োজন। তা যে কোনও ভাবেই হোক না কেন। কিন্তু আমাদের সমাজে ভ্রান্থ ধারনা প্রচলিত যে, মানসিক অসুস্থতা চিকিৎসার উপযোগী নয়। তাই আমরা মানসিক অসুস্থতাকে অবহেলা করি। আবার আমরা অনেকে এও জানি না যে, মানসিক অসুস্থতা আদৌ চিকিৎসা করা সম্ভব কি না। উপরন্থ, মানসিক অসুস্থতাকে বেশী গুiæত্ব দিয়ে চিকিৎসা করা উচিত। কেননা মনের শক্তি হচ্ছে অপরিসীম। মানসিক সুস্থতা ছাড়া কখনোই শারীরিক সুস্থতা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তাই অবশ্যই মানসিক অসুস্থতা চিকিৎসার উপযোগী।

প্রশ্ন ঃ   একজন অত্যান্থ আবেগ প্রবন মানুষের মাঝে কি আত্মহত্যার প্রবণতা বেশী পরিলÿিত হয়ে?

উত্তর ঃ অবশ্যই একজন অত্যন্থ আবেগ প্রবণ মানুষের মাঝে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশী পরিলÿিত হয়। কারন মানুষের জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-কষ্ট, বেদনা, ব্যর্থতা এগুলো আসবেই। এগুলোকে যে যতটা মোকাবেলা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে সে ততই সফল। কিন্তু একজন অত্যান্থ আবেগপ্রবন মানুষ জীবনে দুঃখ কষ্ট বেদনা, ব্যর্থতাকে বিচার বিক্øষন করে আবেগ দিয়ে। একজন আবেগপ্রবন মানুষের যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিক্øষন করার ÿমতা ততটা থাকে না। আর সেই আবেগের বশবর্তী হয়ে জীবনে ব্যর্থতার যে কোনও পর্যায়ে হঠাৎ করে আত্মহত্যার সিদ্ধান্থ নেয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে, একজন অত্যন্থ আবেগপ্রবণ মানুষের মাঝে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশী পরিলÿিত হয়।

প্রশ্ন ঃ   মদ, নেশাগ্রস্থতা, নীলছবি এগুলো মানসিক অসুস্থতার জন্য কি পরিমান দায়ী থাকে?

উত্তর ঃ মদ, নেশাগ্রস্থতা, নীলছবি এগুলোর প্রত্যেকটিই মানসিক অসুস্থতহার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। কারন মদ্য পান করে মানুষ মাতাল হয়। আর মাতাল অবস্থা কখনই একটি স্বাভাবিক অবস্থা নয়। আর এরকম আস্বাভাবিক অবস্থা যদি দিনের পর দিন চলতে থাকে তাহলে একটি মানুষের স্বাভাবিকতা তা যে কোন প্রকারের হোক না কেন ব্যাহত হতে থাকবে। এভাবে মানুষ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে সেটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। অনেকেই বলেন যে, সামান্য মদ্যপান না করলে তারা সুস্থ বোধ করেন না। কিন্তু এটাও যে এক ধরনের অস্বাভাকতা তা তারা ভুলে যান। তেমনিভাবে নেশাগ্রস্থতা হতে পারে কোনও মাদকদ্রব্যের, সিগারেটের বা অন্য কোনও কিছুর সেটা মানুষের জন্য শুভ ফলাফল বয়ে আনে না। কারন মানুষ যখন নেশাগ্রস্থ থাকে তখন স্বাভাবিকতা থেকে বিচ্যুত অবস্থায় থাকে। আর এরকম দিনের পর দিন চলতে থাকলে মানুষ মানসিক সমতা হারিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়বে খুব সহজেই। নীলছবি সম্পূর্ণই একটি বিকৃত বিনোদন। আর বিকৃত বিনোদন যারা চর্চা করবে তারাও যে সুস্থ থাকবে না এটা খুবই স্বাভাবিক সুতরাং মদ, নেশাগ্রস্থতা, নীলছবি এগুলোই মানসিক অসুস্থাতর জন্য বহুল পরিমানে দায়ী।

প্রশ্ন ঃ   মদাসুক্ত, নেশাগ্রস্থতা এগুলোকি আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ায়?

উত্তর ঃ মদাসক্তি, নেশাগ্রস্ত্মতা এগুলো আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ায়। কারন মানুষ যখন মদ্যপান করে মাতাল হয়, তখন সে স্বাভাবিক অবস্থা থাকে না। তার আবেগ নিয়ন্ত্রনে এবং ব্যালেন্স থাকে না। সেে্যত্রে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত্ম কেউ যদি নিয়ে বসে তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। তেমনি নেশাগ্রস্ত্মতা মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আর আচ্ছন্ন অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারে না। তখনও যে কেউ আত্মহত্যা করে বসতে পারে। সুতরাং মদকাসক্তি নেশাগ্রস্ত্মতা এগুলো আত্মহত্যা প্রবণতা বাড়ায়। কারন এমন বহু ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে মদ পান করে মাতাল অবস্থায় কিংবা নেশাগ্রস্ত্ম অবস্থায় মানুষ যে ধরনের আচরন করে বা যে ধরনের কথাবার্তা বলে হয়ত স্বাভাবিক অবস্থায় একই ঘটনার পরিপে্যিতে সে সেরকম আচরন করছে না বা কথাবার্তাও বলছে না। সুতরাং মদাসক্তি, নেশাগ্রস্ত্মতা আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ায় একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

প্রশ্ন ঃ মন কি?

উত্তর ঃ মন কি, মন সম্পর্কে ধারনা এখনও যথেষ্ট অস্পষ্ট। বহু বছরের রিসার্চ এবং পর্যবে্যন থেকে বলা যায় যে, মনই হচ্ছে সকল শক্তির নিয়ন্ত্মা তবে ব্রেইন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু ব্রেইন ছাড়া মনের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারন একজন মানুষের অস্তিত্বও ব্যাখ্যা করা যায় না তার মানসিক কার্যাবলীর অস্তিত্ব ছাড়া। আর মানসিক কার্যাবলী সেটাই, যা একজন মানুষকে চিন্ত্মা করায়, কোন কিছুর তাৎপর্য উপলব্ধি করায়, ভালবাসার অনুপ্রেরনা জাগায়, ঘৃনা করতে শেখায়। সৃজনশীলতা জাগায় এমন কি যে কোনও ধ্বংসাত্বক কার্যাবলীও শেখায়। আর এসব কার্যাবলী ব্রেইনের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। কারন মন থেকে তাগাদা আসবে, প্রেরনা আসবে যে কোনও কাজ করার জন্য। আর ব্রেইন তখন চিন্ত্মা শক্তির যোগান দেবে কিভাবে কাজটি ত্বরান্বিত করা যায়, এভাবেই মনের শক্তিকে বাস্ত্মবে রূপ দেয় ব্রেইনের চালিকাশক্তি।

সুতরাং মনকে সঠিকভভাবে সংজ্ঞায়িত কারতে গেলে এককভাবে আমরা কখনই মনকে সংজ্ঞায়িত করতে পারব না। ব্রেইনের চালিকা শক্তি দ্বারা মন পরিপূর্ণতা লাভ করে। আবার জীব কোষের ডিএনএ যা বংশগতির শারীরিক বৈশিষ্ট্য, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য সবকিছুর ধারক-বাহক সেটাও মনের গতি প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। যারা আধ্যাত্মিক লাইনে গবেষনা করেন তারা মনকে আত্মার সাথে সম্পর্কযুক্ত করেন। সেটাও বহুলাংশে ঠিক। কারন আত্মার শক্তি যা স্রষ্টা কতৃক পরিচালিত, পরিশীলিত সেটাও মনকে চালিকাশক্তির যোগান দেয়। তবে মন কি এ সম্পর্কে আরও গবেষনা বর্তমানে হচ্ছে। ভবিষ্যতে হয়ত কোনও গ্রহন যোগ্য একক সংজ্ঞা ঠিকই বেরিয়ে আসবে।

প্রশ্ন ঃ মানসিক চাপ কি ?

উত্তর ঃ মানসিক চাপকে একটি শারীরিক কৌশলগত টার্ম বলে বিবেচনা করা হয়। প্রতিটি মানুষই জীবনের বিভিন্ন সময়ে কষ্ট, দুর্দশা, অবসাদ, না পাওয়ার বেদনা, অসুস্থতা, ে্যাভ প্রভৃতি কারনে স্ট্রেস বা চাপের শিকার হয়। স্ট্রেস বা মানসিক চাপকে বহুভাবেই সংজ্ঞায়িত করা যায়, কিন্ত্ম একটি গ্রহনযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে- জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যখন বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং ঘটনা সমূহ আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয় তখন মানসিক চাপ বা স্ট্রেস হচ্ছে খুব সাধারন এবং স্বাভাবিক রেসপন্স। স্ট্রেস বা মানসিক চাট শুধুমাত্র খারাপ ঘটনাবলী, কষ্ট, দুঃখ দুর্দশা ইত্যাদির কারনে হতে পারে তা নয়। অনেক সময় অনেক ভাল কোনও কারনেও মানুষ মানসিক চাপের স্বীকার হয়। উদাহরনস্বরূপ বলা যায় যে, একজন মানুষের চাকুরীতে হঠাৎ করে কোনও সমস্যা সৃষ্টি হলে তখন সে মানসিক চাপের শিকার হতে পারে। আবার একজন বেকার মানুষ যদি হঠাৎ করে চাকুরী পেয়ে বসে তখনও সে মানসিক চাপের শিকার হতে পারে। অল্প বিস্ত্মর যদি কেউ স্ট্রেসের সম্মুখীন হয় তাহলেই সেটা খুব খারাপ এটা বলা যাবে না। বরং সামান্য স্ট্রেস বা মানসিক চাপ আমাদের শরীরকে গতিময় করে। তবে স্ট্রেস বা মানসিক চাট যদি দীর্ঘায়িত হয় বা তার পরিমান যদি বেশী হয় তাহলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত্ম অনেক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন- মাথা ব্যথা, পেটের পীড়া, উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট অ্যাটাক ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ মানসিক চাপের কারন সমূহ কি কি?

উত্তর ঃ বিভিন্ন কারনে আমাদের স্ট্রেসের সম্মুখীন হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।
যেমন-

(১) ফ্যামিলি এবং ফ্যামিলি বাইন্ডিংস
(২) হতাশা
(৩) ক্যারিয়ার
(৪) শি্যাগ্রহনের যে কোনও পর্যায়ে যে কোনও ধরনের সমস্যা

(৫) দরিদ্রতা
(৬) সামাজিক টানা পোড়ন
(৭) একাকীত্ব
(৮) বিভিন্ন ধরনের নেশা (ধূমপান, মদ্যপান নারী আসক্তি)
(৯) শারীরিক অসুস্থতা
(১০) সেক্সুয়াল অবসাদ
(১১) আত্মঘাতী প্রবণতা, ইত্যাদি

প্রশ্ন ঃ মানসিক চাপকে দূর করার জন্য মেডিটেশন কিভাবে ভূমিকা রাখে?

উত্তর ঃমানসিক স্ট্রেস বা চাপের কারনের সাথে জড়িত রয়েছে দুটি রাসায়নিক পদার্থ ল্যাকটেট এবং কর্টিসোল মেডিটেশন চর্চার কারনে রক্তে ল্যাকটেট এবং কর্টিসোল কমে যায়, ফলে দুশ্চিন্তা অনেক কমে যায়। মানসিক চাপ বা স্ট্রেস অনেক কমে যায়। মানুষ যখন খুব উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, টেনশনে ভুগতে থাকে তখন তার রক্তে ল্যাকটেট নামক একটি পদার্থের পরিমান বাড়তে থাকে। ল্যাকটেট হচ্ছে এমন একটি পদার্থ যা কংকাল সম্বন্ধীয় মাসলের বিপাকীয় প্রক্রিয়া থেকে সৃষ্টি হয়। এমনি স্বাভাবিক বিশ্রাম নিতে থাকলে রক্তে ল্যাকটেটের পরিমান যে হারে কমে যেত, মেডিটেশন করা অবস্থায় রক্তে ল্যাকটেটের পরিমান চারগুন `ªæত গতিতে কমে যায়। ফলে মানুষের মানসিক চাপ, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, টেনশনও কমে যায়। আর এ অবস্থাটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ এবং উপযোগী।

প্রশ্ন ঃ কান্নার সাহায্যে কিভাবে মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

উত্তর ঃপ্রকৃত পÿে কান্না কিংবা চোখের পানি মনের আবেগ প্রকাশের একটি উপায়। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, মানসিক চাপের ÿতিকর প্রভাব থেকে মন, শরীর এবং মনোদৈহিক সিস্টেমকে রÿা করার এক প্রাকৃতিক নিরাপত্তা প্রক্রিয়াই হচ্ছে কান্না। মনোবিজ্ঞানী প্রফেসর ফ্রেডরিক ফ্লেচ বলেন যে, মানসিক চাপ ভারসাম্য নষ্ট করে আর কান্না ভারসাম্য পুনiæদ্ধার করে। চমকপ্রদ ব্যাপার হল দুঃখ, আবেগ, কষ্ট ইত্যাদির কারনে আসা চোখের পানি আর ধূয়া, ধূলা, যে কোন জ্বালা-পোড়ার কারনে আসা চোখের পানির মধ্যে রাসায়নিক পার্থক্য রয়েছে। আর এ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটার পল রামসে মেডিকেল সেনটারের সাইকিয়াটি বিভাগের বায়োকেমিষ্ট ডঃ ইউলিয়াম ফ্রাই বলেছেন যে, দুঃখ, বেদনা মানসিক আঘাত দেহে টক্সিন বা বিষাক্ত অনু সৃষ্টি করে আর কান্না এই বিষাক্ত অনুগুলোকে শরীর থেকে বের করে দেয়। যে কারনে দুঃখ ভারাক্রান্ত ব্যক্তি, মানসিক চাপে আক্রান্ত ব্যক্তি ভালোভাবে কাঁদতে পারলে নিজেকে অনেক হালকা মনে করে।

প্রশ্ন ঃ হাসির সাহায্যে কিভাবে মানসিক চাট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

উত্তর ঃহাসি একটি ভিন্নতর আবেগ। হাসি এক ধরনের ব্যায়ামের কাজও করে হাসিতে পেশী সক্রিয় হয়ে উঠে সাইকিয়াট্রিস্ট গবেষক ডঃ ইউলিয়াম ফ্রাই বলেছেন যে, কেউ যদি মানসিক চাপের শিকার হয় তখন সে ব্রেইনকে প্রশান্ত করার জন্য কোনও হাসির সিনেমা দেখতে পারে, জোক্‌সের বই পড়তে পারে। অর্থাৎ তখন হাসির উদ্যেক করে এমন কিছু সে করতে পারে। এত একজন শুধু যে মানসিকভাবে প্রাশান্তি লাভ করবে তা নয়, শারীরিকভাবেও অনেক উপকৃত হবে। ডঃ ইউলিয়াম ফ্রাই আরও বলেছেন যে, প্রত্যেকটি মানুষ যেন তার সেন্স অফ হিউমার সম্পর্কে অর্থাৎ তার হাস্য রস জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হয়। এতে একজনের পÿে হাসির উপাদান প্রকৃতি থেকে, মানুষ থেকে, অভিজ্ঞতা থেকে খুঁজে নেয় সহজতর হবে। ফলে যে কোন মানসিক চাপকে নিয়ন্ত্রন করা সহজতর হবে।

প্রশ্ন ঃ এককীত্ব কিভাবে মানসিক চাপ সৃষ্টি কর?

উত্তর ঃএকাকীত্ব যে কত বড় মারাত্মক মানসিক চাপের কারন সেটা বলে শেষ করা যাবে না। মানুষ বিভিন্ন কারনে একা হয়ে যেতে পারে। মাতৃবিয়োগ, পিতৃবিয়োগ কিংবা যে কোন প্রিয়জন হারানো। অথবা যে কোন কারনে একজন মানুষের চারপাশেত তার পছন্দনীয় লোকদের অনুপস্থিতি তাকে একা করে তুলতে পারে। আর একাকীত্বের কারনে যা হয় মানুষ মারাত্মক মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়ে উঠে। এরপর বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতার শিকার হতে থাকে। এছাড়া একেবারে বন্ধুহীন হয়ে যাওয়ার জন্যও মানুষ মানসিক চাপের শিকার হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ নেশাগ্রস্থতা কিভাবে মানসিক চাপের জন্য দায়ী?

উত্তর ঃকোনও কারন ছাড়াই মানুষ বিভিন্ন ধরনের নেশায় আসক্ত হয়ে যেতে পারে। যেমনঃ- ধুমপান, মদ্যপান, নারী আসক্তি। এসমস্ত্ম নেশার মানুষ সঙ্গ দোষেও আসক্ত হয়ে যেতে পারে কিংবা কৌতুহল বশত অথবা পরিস্থিতির কারনেও হতে পারে। কিন্তু যে কারনেই হোক না কেন যে ওখানও নেশাগ্রস্ত্মতার ফলাফল মারাত্মক। মানুষের জীবনীশক্তি, উদ্যম, উচ্ছ্বাস সবই ফুরাতে থাকে নেশায় আসক্তির কারনে। ফলkÖæতিতে একসময় মানুষ অবসাদগ্রস্ত্ম হয় পড়ে। ফলে মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে থাকে। পত্রিকার পাতা উল্টলেই আমাদের চোখে পড়ে নারী আসক্তির জন্য কত সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে। মদ্যপানের জন্য মানুষ লিভার সেরোসিস সহ নানারকম মারাত্মক অসুস্থতার শিকার হচ্ছে। নেশার টাকা যোগাড় করতে না পেরে কত অল্পবয়সী ছেলেরা অন্ধকার জগতে পা বাড়াচ্ছে। কিন্তু যাই ঘটুক নেশায় আসক্তি কখনই কোনও শুভ ফল বয়ে আনে না। জীবনের একটা পর্যায়ে যেয়ে মানুষ অনুভব করে মারাত্মক মানসিক চাপ।

প্রশ্ন ঃ সাধারনতঃ আত্মহত্যার প্রবণতা নারী/পুiæষ কাদের মাঝে বেশী পরিলÿিত হয়?

উত্তর ঃসাধারনতঃ আত্মহত্যার প্রবণতা নারীদের মাঝে বেশী পরিলÿিত হয় কিংবা পুiæষদের মাঝে বেশী পরিলÿিত হয় এরকম সার্বজনীন কথা বলা যাবে না। কারন আত্মহত্যার ব্যাপারটির জন্য একটি দেশ, স্থানীয় রীতি-নীতি, কালচার সব্যতা, সমাজ, সময় এগুলো বিশেষভাবে দায়ী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমাদের দেশে মেয়েরা ধর্ষণের শিকার হলে আত্মহত্যা করে। কিংবা ধর্ষনের শিকার হতে হবে বা এসিড নিÿেপের শিকার হতে হবে এ ভয়েও আত্মহত্যার করে। পÿান্ত্মরে উন্নত দেশে এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে অন্ত্মত কোনও মেয়ে আত্মহত্যার করবে না। আবার বেকারত্বের কারনে কোনও উন্নয়নশীল দেশে কোনও ছেলে আত্মহত্যা করতে পারে। কিন্ত্ম উন্নত দেশে হয়ত এরকম কিছু নাও ঘটতে পারে। সুতরাং আত্মহত্যার ব্যাপারটিকে ত্বরান্বিত করে চারপাশের পরিবেশ।

তবে পুiæষরা কিছুটা প্রকৃতি গত ভাবে হলেও নারীদেরে থেকে শক্ত মনের হয়ে থাকে। সেই হিসাবে বিবেচনা করলে পুiæষ অপেÿা নারীদের মাঝে আত্মহত্যার প্রবণতা অন্ত্মত বেশী দেখা যায়, এটা বলা যায়।

প্রশ্নঃ একজন অত্যান্ত্ম আবেগ প্রবন মানুষ সমস্যায় আক্রান্ত্ম হয়ে যদি বলে যে সে আত্মহত্যা করতে চায়, তাহলে সেÿেত্রে কি করা উচিত?

উত্তর ঃযদি কেউ অত্যন্ত্ম আবেগ প্রবন হয়ে কিংবা সমস্যায় আক্রান্ত্ম হয়ে যদি বলে যে সে আত্মহত্যা করতে চায় তাহলে ব্যাপারটিকে অবশ্যই সিরিয়াসলি দেখা উচিত। প্রথমে তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করতে হবে। তার সমস্যাটি চিহ্নিত করতে হবে। সম্ভবপর হলে তাকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে হবে। তাকে বুঝাতে হবে আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়। এরপর তার সমস্যাটির সমাধান খুঁজতে হবে। কিন্তু এÿেত্রে যদি তার অবস্থা সুবিধা জনক না হয় তাহলে তার পরিবার পরিজন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কথা বলতে হবে। আরেকটি ব্যাপার গুiæত্বপূর্ণ হল, আর তা হচ্ছে এরকম কেউ যদি মুখে বলে যে সে আত্মহত্যা করবে তাহলে তাকে একা ছাড়া যাবে না। বরং তার চারপাশে যদি মা-বাবা, ভাই বোন, বন্ধ-বান্ধব, প্রিয়জনদের সমাবেশ ঘটানো যায় তাহলে সমস্যার সমাধান অর্ধেক এমনিতেই হয়ে যাবে। এরপর ধীরে ধীরে তার মূল সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এভাবে সঠিক ভাবে অগ্রসর হতে পারলে ক্রমশঃ আত্মহত্যার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এরকম একজন মানুষকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

মানসিক চাপের ইতিকথা

এই পৃথিবীতে আমরা কম বেশি সবাই-ই মানসিক চাপের শিকার হই কিংবা হতাশায় ভূগি। এটা হতেই পারে। কারণ পৃথিবীকে আমরা একটা যুদ্ধ ƒে¤ত্রের মত ভাবতে পারি যেখানে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে গেলে সাধারণতঃ প্রতিকূলতার সাথেই সংগ্রাম করতে হয়। তো সেƒে¤ত্র মানসিক চাপের শিকার হয়ে যাওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। পৃথিবীর ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখব যে বহু বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ মানসিক চাপের শিকার হয়েছিলেন কিংবা জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে হতাশাগ্রস্থ হয়ে ছিলেন। কিন্তু একজন মানুষ সফল তখনই যখন সে মানসিক চাপ কিংবা হতাশাগ্রস্থতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

যেমনঃ আব্রাহাম লিংকন আমেরিকার ১৬তম প্রেসিডেন্ট এবং গণতন্ত্রের প্রবক্তা। তার জীবনী পর্যালোচনা করলে আমরা জানতে পারি যে, তিনি মারাত্মক রকমের মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্থ ছিলেন। শুধু তাই নয় তার মাঝে আত্মহত্যা করার প্রবনতাও ছিল মারাত্মক রকমের।

বিটোভেন একজন ব্রিলিয়ান্ট মিউজিশিয়ান ছিলেন। তিনিও ডিপ্রেশনে ভুগেছেন। 'ওয়ার এন্ড পিসের' লেখক-বিখ্যাত লিও টলস্টয় তার নিজের মানসিক অসুস্থতার কতা বিভিন্ন সময়েই বলেছেন।

এডগার এলন পো একজন বিখ্যাত লেখক, তিনিও মানসিক চাপের শিকার হয়েছিলেন জীবনের কোন পর্যায়ে।

সিলভিয়া cøাথ একজন বিখ্যাত কবি এবং সেই সঙ্গে একজন লেখক ছিলেন। তিনিও মানসিক চাপের শিকার হয়ে ছিলেন বিভিন্ন ƒে¤ত্রে।

প্যাটি ডিউক একজন বিভ্যাত অভিনেতা, তিনি তার জীবনীতে উ‡jøখ করেছিলেন তার মানসিক অসুস্থতা এবং হতাশার কথা।

ইংরেজী সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক চার্লস-ডিকেন্সও তার জীবনীতে মানসিক অবসাদ, হতাশাগ্রস্থতার কথা উ‡jøখ করেছেন।

এছাড়া বহু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যাক্তিদের নাম আমি উ‡jøখ করতে পারি যারা হতাশাগ্রস্থ হতেন, মানসিক চাপে ভুগতেন। কিন্তু তার পরেও তারা সফল হয়েছিলেন জীবনে। আর এটা সম্ভব হয়েছিল এভাবেই যে তারা তাদের মানসিক চাপের কারণসমূহকে চিহ্নি করেছিলেন এবং সেই সমস্যাগুলোকে দূরীভূত করতে চেষ্টা করেছিলেন।

সুতরাং পাঠক আপনার পƒে¶ও সম্ভব মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়া, হতাশাগ্রস্থতা, অবসাদগ্রস্থতা থেকে বেরিয়ে আসা। কিন্তু আমি আমার ১৫-১৬ বৎসরের গবেষণা এবং চর্চার আলোকে এ বিষয়ে একটি দুঃখজনক সেই সঙ্গে মর্মস্পর্শী বিষয়ের কথা উ‡jøখ করতে চাই। আর তা হচ্ছে এ সমাজের বেশীর ভাগ মানুষই এমনকি শিƒ¶ত মানুষও মানসিক চাপ, হতাশাগ্রস্থতা এমনকি মনের বিষয়টিকে গুiæত্ব দিতে চান না। অথচ এই সমস্থ বিষয়গুলো থেকে উত্তোরণ ইচ্ছা করলেই সম্ভব। বরং অনেকেই আছেন যারা মানসিক অসুস্থতার বিষয়টিকে চারিত্রিক দুর্বলতা বলেই মনে করেন। আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে একথা খুব জোর দিয়ে বলতে পারি। আর্থাৎ মনের বিষয়টিকে গুiæত্ব দেয়ার পরিবর্তে শারীরিক কিংবা বাহ্যিক বিষয়টিকেই আমরা বেশী গুiæত্ব দিয়ে থাকি। এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, ছোটবেলায় আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন আমরা সবাই একজন শরীর চর্চার শিƒ¶কের কাছে শরীর চর্চা করেছি। অথচ শরীর চালাচ্ছে যে মন তার দিকে কি আমরা কখনও ফিরে তাকিয়েছি? মনের চর্চার বিষয়টি কি কখনই সুধী সমাজের কাছে গুiæত্ব পেয়েছে? মানসিক চাপে যারা জর্জরিত, হতাশাগ্রস্থ তারা কি কখনও পেয়েছেন সঠিক দিক নির্দেশনা? না কখনই না।

এক একটি মানুষ এক একটি মানব সম্পদ বলে বিবেচ্য। তার মনই যদি ঠিক না থাকে তাহলে সে করবে কেমন করে। একজন মানব সম্পদ তখনই, যখন একজন মানুষ পরিপূর্ণভাবে কর্মƒ¶ম এবং সেই সঙ্গে তার মেধা, মনন, জ্ঞান, দƒ¶তা, স্বাস্থ্য, সাফল্য ইত্যাদির একপি পরিপূর্ণ সমাহার ঘটে আর এই বিষয়টি পরিপ্রেƒ¶তে নিশ্চয়ই আমার সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, অর্থবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী এবং নির্বিশেষে সকল পাঠক একমত হবেন। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ট জীব। আর এ শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড হচ্ছে তার বিবেক কিংবা নৈতিকতা। যা পরিচালিত হয় সম্পূর্ণ মন দ্বারা। অথচ মানসিক চাপে পড়ে, হতাশায় ভুগে আমরা মনের অপার মক্তিকে হারিয়ে ফেলছি দিন দিন।

আরেকটি দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে মানসিক চাপের শিকার হয়ে হতাশাগ্রস্থ হয়ে মানুষ কখনই ডাক্তার, সাইকিয়াট্রিস্টের কারো কাছেই যান না।

আমেরিকাতে ***"ন্যাশনাল সেন্ট্রাল হেলথ অ্যাসোসিয়েশন"*** নামক একটি প্রতিষ্ঠান ১৩১৯ জন মানুষের উপর একটি গবেষণা চালিয়ে ছিল। তাদের গবেষণার আলোকে বেরিয়ে এসেছিল যে মাত্র ১৮% মানুষ মানসিক চাপের শিকার হয়ে, হতাশাগ্রস্থ হয়ে ডাক্তার কিংবা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়ে ছিল চিকিৎসার জন্য। বাকী ৮২% যায়নি বিভিন্ন কারণে। অথচ তারা সবাই মানসিক চাপে ভুগছিলেন। খোদ আমেরিকাতেই যদি এ অবস্থা হয়, তো আমাদের দেশের চিত্র আরও কাiæণ, অথচ মানসিক চাপে ভুগতে ভুগতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হওয়াটা কঠিন কিছু নয়।

তাই আমি পাঠককে পরিশেষে বলতে চাই জীবনে তো দুঃখ কষ্ট থাকবেই। আর সে কারণে জীবনে আমাদেরকে মানসিক চাপের শিকার হতেই হবে। মাঝে মধ্যে হতাশাগ্রস্থ হওয়াটাও তো বিচিত্র নয়। আমাদেরকে বুঝতে হবে দুঃখ-কষ্ট নিয়েই জীবন। দুঃখ দ্বারাই মানুষের প্রকৃত পরিচয় উদঘাটিত হয়। শুধু তাই নয়, দুঃখ মানুষকে ঈশ্বরাভিমুখী করে। তাই বুঝি সুন্দরের কবি জন কিট্স বলেছেন, "Sorrow is knowledge" অর্থাৎ দুঃখবোধই প্রজ্ঞার উৎস। দুঃখের আবেদন চিরন্তন। কেননা, মাতুস্নেহের মূল্য দুঃখে, পতিব্রতা হওয়ার মূল্যও দুঃখে, । দুঃখ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে করেছিল মানব বার্তা, যিশুকে করেছিল মানব মুক্তির সাধক। দুঃখকে অন্তর দিয়ে অনুভব করে ছিলেন বলেই গৌতম হয়েছিলেন "বুদ্ধ"। দুঃখকে ভোগ করেছিলেন বলেই কিশোর কবি সুকান্তের কবিতা এতটাই বাস্তব।

ব্যক্তির দুঃখ যখন সমষ্টির দুঃখে পরিণত হয়, মানুষ তখনই হয় মহাপুiæষ। কবির ভাষায় "Sweetest songs are those that tell in saddest thought."

তাই দুঃখ-কষ্টের কারণে মানসিক চাপের শিকার হয়ে, হতাশাগ্রস্থ হয়ে নিজের জীবনকে ধ্বংস করার কোনও মানেই হয় না। আশা করি পাঠক মানসিক চাপ, হতাশাগ্রস্থতাকে জয় করে মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে নিজের জীবনের প্রকৃত অর্থ, প্রকৃত সাফল্য খুঁজে নিতে সচেষ্ট হবেন।

জ্যোতিষশাস্ত্র এবং রত্নপাথর সম্পর্কিত ২০টি প্রশ্ন এবং উত্তর

প্রশ্ন ঃ   জ্যোর্তিবিদ্যা (Astrology) কি?

উত্তর ঃ আমাদের ছায়াপথে আছে ৮৮টি তারকামন্ডল। ক্রান্তিবৃত্ত ধরে ১২টি তারকামন্ডল লÿ্য করা যায়। ক্রান্তি বৃত্তকে মধ্যস্থলে রেখে ১৮ ডিগ্রীর মত প্রশস্ত একটি পথ আকাশকে বেস্টন করে আছে। এই পথই রাশিচক্র। এছাড়া আমাদের সৌরমন্ডলে আছে নয়টি গ্রহ যেমন রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু।

জ্যোর্তিবিদ্যা বলতে বুঝায়, যেখানে তারকামন্ডল, গ্রহ নÿত্রের গতি বিধি, প্রকৃতি অবস্থান ইত্যাদি আলোচিত হয়। এছাড়া পৃথিবীর উপর মানুষের উপর, গাছপালা প্রাণী, পরিবেশ, নদী, সমুদ্র ইত্যাদির উপর তারকামন্ডল, গ্রহ নÿত্রের প্রভাব যেখানে আলোচিত হয় তাকেও জ্যোর্তিবিদ্যা বলে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে পৃথিবীতে প্রত্যেকটি দেশ, প্রত্যেকটি জাতি, প্রত্যেকটি মানুষের জীবন এবং জীবন যাপন প্রণালী, পৃথিবীর প্রত্যেকটি গাছপালা, প্রাণী, পরিবেশ, প্রকৃতি, সাগরের জোয়ার ভাটা সবকিছুরই রয়েছে নিজস্ব নিয়তি যা তারকামন্ডল, গ্রহ নÿত্র দ্বারা প্রভাবিত।

জ্যোর্তিবিদ্যার বিভিন্ন ভাগ রয়েছে। এটি কুসংস্কার নয়। বরং জ্যোর্তিবিদ্যার রয়েছে নিজস্ব নিয়ম কানুন, রীতিনীতি ইত্যাদি। জ্যোর্তিবিদ্যা বর্তমানে আধুনিক বিশ্বে বহুল আলোচিত বিষয়।

প্রশ্ন ঃ   গ্রহ-নÿত্র গুলো কিভাবে শিশুর জন্মের সময় প্রভাব বিস্তার করে?

উত্তর ঃ প্রত্যেকটি গ্রহ-নÿত্র তাদের নিজস্ব কÿপথে নিজস্ব স্পিড বা গতিতে গূর্নায়মান। ফলkÖæতিতে যে কোন মুহুর্তে সকল গ্রহের নÿত্রের একটি নির্দিষ্ট অবস্থার বিদ্যমান থাকে পৃথিবীর সাথে। কারণ পৃথিবীও নিজ কÿপথে নিজস্ব গতিতে ঘুরছে। আর এই অবস্থান খুবই গুiæত্বপূর্ণ মানুষের জন্য কারণ এই গ্রহ-নÿত্রের পৃথিবীর সাথে অবস্থান মানুষের eøyপ্রিন্ট বা প্রতিলিপিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ শিশু যখন জন্ম গ্রহন করে তখন যে গ্রহ-নÿত্রের অবস্থার পৃথিবীর সন্নিকটে থাকে তখন সেই সব নÿত্রের প্রভাব শিশুর উপর সরাসরি থাকে বা প্রকট থাকে। আবার সেই সঙ্গে শিশু জন্ম গ্রহণের সময় যে গ্রহ-নÿত্রের অবস্থান পৃথিবী থেকে দূরে থাকে, সেই সব গ্রহ-নÿত্রের প্রভাব শিশুর উপর ততটা প্রকট থাকে না বা দুর্বল থাকে। জ্যোর্তিবিদ্যা সম্পর্কে যারা ভল জানেন তারা জন্ম তারিখ নিরীÿা করে বলে দিতে পারেন যে একজন মানুষের জন্মের সময় কোন কোন গ্রহ-নÿত্রের প্রভাব ছিল এবং কি ধরনের প্রভাব ছিল।

প্রশ্ন ঃ   একজন নিজের জন্মতারিখ, জন্মস্থান, জন্মের সময় এগুলো কিছুই জানে না। তারপরও জ্যোতিষ শাস্ত্র তাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারে?

উত্তর ঃ যদি কেউ নিজের জন্মতারিখ, জন্মস্থান, জন্মের সময় এগুলো যদি না জানে, তারপরও জ্যোতিষ শাস্ত্র তাকে সাহায্য করতে পারে। তবে এ ব্যাপারে জ্যোতিষশাস্ত্রে যিনি অভিজ্ঞ তার সাথে পরামর্শ করা জiæরী। তিনি হাতের রেখা, রঙ, মাউন্ট, মুখ ইত্যাদি বিkøষন করে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী তাকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারেন। শুধু তাই নয় জন্মের সময় কার উপর কোন গ্রহ-নÿত্রের প্রভাব ছিল সেটাও বলে দেয়া সম্ভব। সুতরাং জন্মতারিখ, জন্মস্থান, জন্মের সময় ইত্যাদি না জানলে যে জ্যোতিষশাস্ত্র আর তাকে সাহায্য করতে পারবে না বিষয়টি ঠিক নয়। তবে সে ÿেত্রে জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ কারো সাথে পরামর্শ করা জiæরী।

প্রশ্ন ঃ   কেউ একজন একটি সমস্যায় আক্রান্ত। সমস্যাটি একান্তই মানসিক। সে কি এখন একজন অভিজ্ঞ জ্যোতিষির কাছে যাবে নাকি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট এর কাছে যাবে?

উত্তর ঃ প্রথম সমস্যাটি খুব ভালভাবে বিচার বিkøষন করতে হবে। সেই সঙ্গে সমস্যাটির কারন, ইৎস ইত্যাদি যাচাই বাছাই করতে হবে। এরপর সমস্যাটির সমাধান নিয়ে ভাবতে হবে। অনেক সময় একই সমস্যার সমাধান বিভিন্ন ভাবে করা সম্ভব। ব্যাপারটি এরকম যে, জ্বর হলে এলাপ্যাথি মোতাবেক চিকিৎসা করা যায়। আবার হোমিওপ্যাথি মোতাবেক চিকিৎসা করা সম্ভব। সুতরাং সমস্যাটির সমাধান যদি জ্যোতিষশাস্ত্র মোতাবেক করা যায় আবার সাইকিয়াট্রিস্টও করতে পারেন, তাহলে যে কোনও একজনের কাছেই যাওয়া যায়। কিন্তু এরপরে লÿণীয় বিষয় হচ্ছে যে, কোনও একজনের কাছেই যাওয়া যায়। কিন্তু এরপরে লÿণীয় বিষয় হচ্ছে যে, কার কাছে গেলে ফলপ্রসূ সমাধান আসবে, গ্রহনযোগ্য সমাধান আসবে এবং তাড়াতাড়ি সমাধান আসবে। তাই বিষয় গুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে জ্যোতিষির কাছে যেতে হবে নাকি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে হবে।

প্রশ্ন ঃ একজন প্রচন্ডভাবে ধর্মে বিশ্বাসী কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করে না। কারন তার কাছে জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করাটাকে ধর্মীয় অনুভূতিত আঘাত বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই?

উত্তর ঃ জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-বিধি, প্রকৃতি এবং গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব ইত্যাদি আলোচিত হয়। আর পবিত্র কুরআন শরীফে গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা রয়েছে। যেমনঃ-

১) সূরা ইয়াসীনঃ ৩৮ আয়াতে আছে
"সূর্য ছুটে চলেছ তার জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে যা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ) কর্তৃক নির্ধারিত।"

২) সূরা ইয়াসীনঃ ৪০ আয়াতে আছে-
"(সূর্য, চন্দ্র) প্রত্যেকে ছুটে চলেছে নিজ নিজ কক্ষপথে।"

৩) সূরা রহমানঃ ১৭ আয়াতে আছে-
"তিনি দুই সূর্যাস্ত ও দুই সূর্যোদয়ের নিয়ন্তা।"

৪) সূরা ফুরকান ঃ ৬১ আয়াতে আছে-
"কত মহান তিনি যিনি মহাকাশে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র এবং এত স্থাপন করেছেন একটি প্রোজ্জল প্রদীপ ও একটি আলো বিকীরনকারী চন্দ্র।"

৫) সূরা নূহঃ ১৫-১৬ আয়াতে আছে-
"তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ কিরূপে সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে বিন্যস্ত আকাশমন্ডলী এবং সেথায় চন্দ্রকে করেছেন আলোকিত এবং সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে।"

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি পবিত্র কুরআন শরীফে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি, প্রকৃতি, আবর্তন, আবর্তন কাল ইত্যাদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে।

উপরোক্ত পাঁচটি আয়াত ছাড়াও কুরআন শরীফের বহু জায়গায় গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি, প্রকৃতি, আর্বতন, আর্বতনকাল ইত্যাদি সম্পর্কে আরও আয়াত আছে। সুতরাং যিনি ধর্মে বিশ্বাসী কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী না এখন তিনিই সিদ্ধান্ত নিবেন বিশ্বাসের স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত। কারন জ্যোতিষ শাস্ত্রে গ্রহ-নক্ষত্র, গ্রহ-সমূহের প্রভাব, গতি-বিধি, প্রকৃতি, আর্বতন, প্রভাব সমূহ ইত্যাদি আলোচিত হয়, গবেষনা হয়।

প্রশ্ন ঃ একজন শিক্ষিত মানুষ তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না। কারন তিনি মনে করেন জ্যোতিষশাস্ত্র ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা জানতে চাই?

উত্তর ঃ জ্যোতিষশাস্ত্র ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, দেখা যায় না তারপরও আমরা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করি। যেমনঃ- সমুদ্রের তলদেশে গভীর অন্ধকার বিদ্যমান, এটা আমরা গিয়ে প্রতিজন দেখে আসি না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি। সূর্য তার কক্ষপথে ছুটে চলেছে এটা আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু চোখের দেখার বা ছোঁয়ার উপর নির্ভর করে না। এরকম বহু বহু উদাহরন দেয়া যেতে পারে যা আমরা চোখে দেখিনা, ছুঁয়ে দেখি না কিন্তু বিশ্বাস করি। এছাড়া জ্যোতিষশাস্ত্র ধরা যায় না, ছুঁয়া যায় না, দেখা যায় না এটা একেবারে পুরোপুরি ঠিক তাও নয়। কারন চন্দ্রের প্রভাবে জোয়ার ভাটা হয়। অমাবস্যা, পূর্ণিমার সময় মানুষের শরীরে যদি বাঁত থাকে তাহলে তা বাড়ে। সুতরাং এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর এসমস্ত বিষয়বস্তু জ্যোতিষশাস্ত্রে আলোচিতও হচ্ছে। সুতরাং আমার মনে হয় উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক তার উত্তর পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন ঃ ট্র্যাডিশনাল অ্যাস্ট্রোলজি* (Traditional Astrology) *বা প্রচলিত জ্যোতিষশাস্ত্র বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ ট্র্যাডিশনাল অ্যাস্টোলজি বা প্রচলিত জ্যোতিষশাস্ত্র বলতে আমরা বুঝি ১২০০ থেকে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপে যে জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা করা হত তাকে। ব্যাবিলনে এর উৎপত্তি হয়। যা প্রচন্ডভাবে জনপ্রিয় হয়ে ছিল রোমান সাম্রাজ্যের কালে। পঞ্চম শতকে রোমান সাম্রাজ্যের পতনকালে জ্যোর্তিবিজ্ঞান সংক্রান্ত বহুবিধ তথ্যাবলী মধ্যপ্রাচ্যে উন্নত, অগ্রসর ইসলামিক সভ্যতার মাঝে সংরক্ষিত হতে থাকে। এরপরে তেরশতকে ইউরোপে যখন অন্ধকার যুগের পতন আস্তে আস্তে হতে থাকে তখন ইউরোপিয়ান জ্ঞানী, পন্ডিত ব্যক্তিগন বহু দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী আরবী ভাষা থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে জ্ঞান চর্চা করতে থাকেন। সেই থেকে ট্র্যাডিশনাল অ্যাস্ট্রোলজি বা প্রচলিত জ্যোতিষ শাস্ত্র পুরোপুরিভাবে অ্যারাবিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ ট্র্যাডিশনাল অ্যাস্ট্রোলজির কয়টি শাখা এবং কি কি? সেগুলোর কাজ কি কি?

উত্তর ঃ ট্র্যাডিশনাল অ্যাস্ট্রোলজির চারটি শাখা

১) নাটাল অ্যাস্ট্রোলজি (Natal Astrology):
অ্যাস্ট্রোলজির যে শাখাটি বার্থ চার্টের (Birth Chart) এর উপর ভিত্তি করে কোনও একজন মানুষ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবানী করে তাকে নাটাল অ্যাস্ট্রোলজি বলে।

২) হরারি অ্যাস্ট্রোলজি (Horary Astrology):
অ্যাস্ট্রোলজির যে শাখাটি চার্টের উপর ভিত্তি করে কোনও নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেয় তাকে হরারি অ্যাস্ট্রোলজি বলে।

৩) ইলেকশনাল অ্যাস্ট্রোলজি (Electional Astrology):
অ্যাস্ট্রোলজির যে শাখাটি অ্যাস্ট্রোলজির নিয়মকানুন অনুসারে একটি ভাল সময় বেছে দেয় কাজ করার জন্য তাকে ইলেকশনাল অ্যাস্ট্রোলজি বলে।

৪) মুনডেন অ্যাস্ট্রোলজি (Mundane Astrology):
অ্যাস্ট্রোঃলজির যে শাখাটি কোন দীর্ঘ সময়ের জন্য ভবিষ্যত বানী করে কিংবা কোন শহর, জাতি, এলাকা ইত্যাদির ýেত্রে ভবিষ্যতবানী করে তাকে মুনডেন অ্যাস্ট্রোলজি বলে।
মুনডেন অ্যাস্ট্রোলজি আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যতবানীর ýেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ঃ মর্ডান অ্যাস্ট্রোলজি বা আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্র বলতে কি বুঝায়?

উত্তর ঃ প্রায় দুই শতক অ্যাস্ট্রোলজি বা জ্যোতিষশাস্ত্র শাখাটি অবহেলিত থাকার পর প্রায় ১৯০০ সালের শুiæর দিক থেকে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে আবার সবার আগ্রহবৃদ্ধি পেতে থাকে। মর্ডান অ্যাস্ট্রোলজির সাথে ট্র্যাডিশনাল অ্যাস্ট্রোলজির প্রথম শাখা নাটাল অ্যাস্ট্রোলজির বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ মর্ডান অ্যাস্ট্রোলজিও নাটাল অ্যাস্ট্রোলজির মত বার্থ চার্ট (Birth Chart) কে বিশেষ গুiæত্ব দেয়। যে কোন ব্যক্তি বা যে কোনও প্রশ্নের উত্তর খোঁজার সময় বার্থ চার্টকেই বেশী গুiæত্ব দেয়া হয়। এছাড়া মর্ডান অ্যাস্ট্রোলজি কারও কোনও সমস্যা নির্ণয় বা সমাধানের জন্য মন বিK¬ষন করা, মন সমীÿন করা ইত্যাদি বিষয়কেও বেশ গুiæত্ব দিয়ে থাকে অর্থাৎ সাইকোলজিক্যাল ব্যাপারটিকে বেশ গুiæত্ব দেয়া হয়। এছাড়া মর্ডান অ্যাস্ট্রোলজিতে হরো স্কোপের গুiæত্বও বেশ দেয়া হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ঃ ট্রাডিশনাল অ্যাস্ট্রোলজি এবং মর্ডান অ্যাস্ট্রোলজিও মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ ট্র্যাডিশনাল অ্যাস্ট্রোলজি অত্যন্ত জটিল। এছাড়া ট্র্যাডিশনাল অ্যাস্ট্রোলজিতে বিভিন্ন ধরনের নিয়ম কানুন অনুসরন করে কোনও সুনির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়। যেমনঃ ট্র্যাডিশনাল অ্যাস্ট্রোলজির একটি শাখা নাটাল অ্যাস্ট্রোলজি কোনও একজন মানুষ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করে। যেমনঃ তার সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি। আরেকটি শাখা হরারি অ্যাস্ট্রোলজি বিভিন্ন নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করে। যেমন- কেউ কোনও কারনে অভিশপ্ত কিনা? কারও সাথে তার পছনেদর মানুষের বিয়ে হবে কিনা ইত্যাদি। আরেকটি শাখা ইলেকশনাল অ্যাস্ট্রোলজি। যারা চর্চা করেন তারা তাদের ক্লায়েনটদেরকে একটি মঙ্গলজনক শুভ সময় নির্বাচন করে দেন বিয়ের জন্য, ব্যবসায়ের জন্য, বাড়ী -ঘর করার জন্য ইত্যাদি। পÿান্তরে মর্ডান অ্যাস্ট্রোলজি মানুষের বার্থ চার্ট (Birth Chart) এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়। সেই সঙ্গে মন বিK¬ষন বা সাইকোলজিক্যাল বিষয় ভিত্তিক বিচার-বিK¬ষন করেও সমস্যার সমাধান দেয়। তবে বর্তমান যুগেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ট্র্যাডিশনাল অ্যাস্ট্রোলজির চর্চা বিদ্যামান।

প্রশ্ন ঃ একজন মনে করে, যে কোনও কাজে সফলতার জন্য প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ট সেÿেত্রে জ্যোতিষশাস্ত্রের খুব একটা ভূমিকা নেই, এÿেত্রে ব্যাখ্যা কি হওয়া উচিত?

উত্তর ঃ অবশ্যই যে কেনও কাজে সফলতার জন্য প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি প্রয়োজন। কারন ইচ্ছাশক্তি ছাড়া কোনও কাজই সফল ভাবে করা সম্ভব নয়। তবে সেÿেত্রে জ্যোতিষশাস্ত্রের খুব একটা ভূমিকা নেই কথাটি ঠিক নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কেউ একজন কোন একটা কাজ করতে চাইছে। ধরা যাক, সে কোনও একটি গবেষনামূলক কাজ করতে চাইছে। সেÿেত্রে তার প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তিও কাজ করছে। এখন জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী তাকে যদি কিছু দিক নির্দেশনা দেয়া হয়, তাহলে হয়ত তার কাজটি করতে আরও সুবিধা হতে পারে। আমরা ইতিবাচকভাবে বিষয়টিকে চিন্তা করতে পারি। ইচ্ছাশক্তি যদি কোনও কাজের প্রভাবক হয়ে থাকে তাহলে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী দিক নির্দেশনা সেই প্রভাবককে আরও ত্বরান্বিত করার

ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী দিক-নির্দেশনা কেউ অনুসরন করবেন কি করবেন না সেটা সম্পূর্ণই তর ব্যক্তিগত ইচ্ছ।

প্রশ্ন ঃ জ্যোতিষশাস্ত্র যদি প্রচন্ড ভালই হয়েং থাকে তাহলে একজনও শিŷিত সমাজের মানুষ কেন জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি উৎসাহিত হচ্ছে নাকি?

উত্তর ঃ এখনও আমাদের দেশে শিŷিত সমাজ জ্যোতিষশাস্ত্রেকে সঠিকভাবে গ্রহন করছে না কারন এই ব্যাপাটি দিয়ে অনেক অসৎ মনমানসিকতার মানুষ জন ব্যবসা করছেন। তারা হয়ত অজ্ঞও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে। এছাড়া জ্যোতিষশাস্ত্ম সম্পর্কে এখনও ততটা পরিচিত, প্রসার ব্যাপকভাবে হয়নি। এছাড়া আমাদের দেশে এখনও সব মানুষের মৌলিক চাহিদা এখনও পূরন হয়নি। সেকানে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিষয়টি এখনই ইতবাচকভাবে সবাই গ্রহন করবে এতটা আমরা আশা করতে পারি না। এসমস্ত্ম কারনেই শিŷিত সমাজের লোকজন জ্যোতিষশাস্ত্রকে এখনও সঠিকভাবে উৎসাহিত করছেন না।

প্রশ্ন ঃ জ্যোতিষশাস্ত্রের সাথে কাল যাদুবিদ্যার সম্পর্ক আছে কি?

উত্তর ঃ জ্যোতিষশাস্ত্মের সাথে কালযাদু বিদ্যার কোনও সম্পর্ক একবারেই নেই। জ্যোতিষশাস্ত্রে যারা অভিজ্ঞ তারা মানুষের বার্থ চার্ট নিয়ে নিরীŷা করেন। হরোস্কোপ করেন। মানুষের জন্মতারিখ, চেহারা, হাতের রেখা, মাউনট এগুলো পরীŷা নিরীŷা করে গ্রহ নড়্গত্রের প্রভাব সম্পর্কে উjøখ করেন। প্রয়োজন বোধে সঠিক দিক নির্দেশনা দেন। কিংবা প্রয়োজন বোধে সঠিক রত্ন-পাথর ব্যবহার করতে বলেন। কাজেই জ্যোতিষশাস্ত্রের সাথে কাল যাদু বিদ্যার কোনও সম্পর্কই নেই।

প্রশ্ন ঃ রত্ন-পাথর কি?

উত্তর ঃ রত্ন পাথর হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে খনিজ পদার্থ থেকে সৃষ্ট স্ফটিক বা স্ফটিকের মত পদার্থ। যা খুবই বাঞ্ছনীয়, মনোরম, প্রীতিকর সৌনদর্যময়, মূল্যবান এবং ŷেত্রবিশেষে বিরল এবং অসামান্য। যারা স্থায়ীত্ব উপভোগ করা যেতে পারে বহুদিন। অর্থাৎ রত্নপাথর সম্পূর্ণভাবে একটি প্রাকৃতিক সৃষ্ট জিনিষ বা পদার্থ। কিন্তু রত্ন পাথর এবং শুধু স্ফটিক দুটো ভিন্ন জিনিস, কিছু কিছু রত্ন পাথর পৃথিবী সৃষ্টির ইতহাসের সময় থেকে আবিস্কৃত হয়েছে। আর কিছু কিছু বর্তমানে আবিস্কৃত হচ্ছে। বলা যায়, রত্ন পাথর হচ্ছে প্রকৃতির দেয়া একটি সম্পদ এবং উপহার সমগ্র মানব জাতির জন্য। যার কথা কুরআন, বাইবেল সহ বিভিন্ন ধর্মগ্রহে উjøখিত রয়েছে। নীলা, iæবী, মুক্তা প্রবাল, পান্না, গোমেদ ইত্যাদি প্রচলিত জনপ্যিয রত্নপাথর।

প্রশ্ন ঃ রঙ কিভাবে মানবদেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় সিস্ট্রেমের উপর কাজ করে?

উত্তর ঃ রত্ন পাথরের সাহায্যে নিরাময় পদ্ধতি নিয়ে গবেষনা করার সময় বেরিয়ে এসেছে যে, রত্ন পাথরের সাহায্যে নিরাময় পদ্ধতি রঙের শক্তির সাথে জড়িত। প্রায় ২০০০ বছর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রঙের সুবৃহৎ কŷ নির্মিত হোত। সেখানে রোগীরা তাদের চিকিৎসার জন্য কালার বাথ বা স্নান করত। কিন্তু রঙ কিভাবে বিভিন্ন শারীর বৃত্তীয় সিস্টেমের উপর কাজ করে তা এখনু সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবে সাদা রঙ বা সূর্যের আলো সাতটি রঙের সমন্বয়ে গঠিত। যা প্রিজমের সাহায্যে অবলোকন করা যায়। এই সাতটি রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যও বিভিন্ন রকম এবং সাতটি রঙের প্রভাবও মানবদেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় সিস্টেমের উপর বিভিন্ন রকম। যেমন- বেগুনী রঙ থেকে ভিটামিন D পাওয়া যা। নীল রঙ মানুষের ব্রেইনের কার্যড়্গমতাকে নিয়ন্ত্রন করে। আসমানী রঙ তেকে ভিটামিন K পাওয়া যায় যা মানব দেহের পিটুইটারী Møান্ডকে নিয়ন্ত্রন করে। হলুদ রঙ থেকে ভিটামিন A পাওয়া যায়, ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ কৃত্রিম রত্নপাথর বা সিন্থেটিক জেমস্ কি?

উত্তর ঃ মানুষ ল্যাবরেটরীতে কিছু নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় শর্ত সাপেড়্গে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা কৃতিম রত্ন তৈরী করে যে গুলোকে বলে সিন্থেটিক সেমস্ বা সিন্থেটিক রত্ন। কিন্তু এগুলো নিরাময়ের জন্য অকার্যকর। আমি দীর্ঘ ১৫-১৬ বৎসরের পর্যবেŷন এবং গবেষনার আলোকে দেখেছি যে, বেশীর ভাগ জুয়েলার এবং রত্নপাথরের ডিলারগন কৃত্রিম রত্নপাথর এবং প্রাকৃতিক রত্নপাথরের মধ্যে সঠিক পার্থক্য করতে পারেন না। যেহেতু রত্ন পাথরের সাহায্যে নিরাময়ের একটি বিশাল দিক রয়েছে তাই কৃত্রিম রত্ন পাথর ও প্রাকৃতিক রত্ন পাথরের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করার জন্য রত্নপাথর সম্পর্কে জ্ঞান থাকাটা জাiæরী।

প্রশ্ন ঃ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে রত্নপাথরের ব্যবহার হচ্ছে কি?

উত্তর ঃ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে রত্ন পাথরের ব্যবহার হচ্ছে বেশ ব্যাপকভাবে এবং এ÷েত্রে গত ২০ বছরে ইউরোপ এবং ইউনাইটেড কিংডাম অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে।

যেমন- শল্যচিকিৎসকগন হীরা এবং iæরীকে লেজার ইন্সট্রুমেনেট ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া ডঃ জন হোয়েল রত্ন পাথরকে শক্তিশালী লেন্স এবং বাতির সাথে ব্যবহার করে কাডুসিয়াস ল্যাম্পস তৈরী করেছেন। এটাকে বিদুৎপ্রবাহ দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। এই কাডুসিয়াস ল্যাম্পস বর্তমানে ইউরোপ, ইউনাইটেড কিংডামে নিরাময়ের জন্য সাফল্যজনকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া অধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে রত্ন পাথরের ব্যবহার নিয়ে বর্তমানে প্রচুর গবেষনা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ রত্নপাথরের সাহায্যে কিভাবে ঔষধ তৈরী হয়?

উত্তর ঃ রত্ন পাথর থেকে ঔষধ তৈরী করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যেমন-

১) একটি হাই কোয়ালিটির রত্ন পাথরকে অপে÷াকৃত পাতলা তরল অ্যালকোহলে রেখে ৭ দিন অন্ধকার স্থানে রাখতে হবে। ফলে রত্ন পাথর থেকে কম্পনশীল শক্তি অ্যালকোহলের সলিউশনে অনুপ্রবেশ করতে। এই সলিউশন তখন ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু এ÷েত্রে রত্ন পাথরটির শক্তি কমে যাবে না। ঐ একই রত্নপাথর দিয়ে আবর ঔষধ তৈরী করা যাবে।

২) একটি রত্ন পাথরকে একটি পানি ভর্তি Møvস জারে রেখে সূর্যের আলোতে রাখতে হবে। এর ফলে সূর্যের সাহায্যে রত্ন পাথরের ভাইব্রেটরী ফোর্স পানিতে শোষিত হবে। এই পানিও নিরাময় কারক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

৩) এছাড়া একজন আয়ুর্বেদিক ডাক্তার রত্ন পাথরকে পানিতে রেখে সেই পানিতে আরও অন্য কোনও মিশ্রন যেমনঃ- টিংচার ইত্যাদি মিশাতে পারেন।

এভাবে রত্ন পাথর দিয়ে নিরাময় কারক ঔষধ তৈরী করা যায়। তবে এই ঔষধ অবশ্যই দÿ অভিজ্ঞকারোর পরামর্শ অনুযায়ী গ্রহন করতে হবে। তা না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ রত্নপাথর কিভাবে পরিধান করতে হয় এবং কিভাবে সেটা কাজ করে?

উত্তর ঃ জ্যোতিষশাস্ত্রে যিনি অভিজ্ঞতার পরামর্শ অনুযায়ী রত্ন পাথর পরিধানের জন্য নির্ধারন করতে হয়। সঠিক রত্ন পাথর নির্বাচন করার পর সঠিক ধাতু দ্বারা রত্নপাথর ব্যবহার করতে হবে। সঠিক ধাতুতে সঠিক রত্ন পাথর সন্নিবিষ্ট করার পর তা হাতের সঠিক আঙ্গুলে পরিধান করতে হয়। যেমন:- হলুদ স্যাফায়ার হাতের প্রথম আঙ্গুলেই পরিধান করতে হয় ।যখন কোন একটি রতন পাথর অংটি করে পরিধান করা হয় তখন সেটা একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড সৃষ্টি করে। সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকে নিদিষ্ট ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ নির্দিষ্ট কার্যপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মানবদেহের উপর।

প্রশ্ন ঃ রত্ন পাথরের সাহায্যে নিরাময়ের ব্যাপারটি কেন আমাদের দেশে এখনও ততটা প্রসার লাভ করেনি?

উত্তর ঃ রত্ন পাথরে নিরাময় সংক্রান্ত্ম ইতিহাস যদিও পুরানো কিন্তু আমাদের দেশে এর পরিচিতি, ব্যবহারের ব্যাপকতা, জনপ্রিয়তা এখনও ততটা প্রসার লাভ করেনি। এর পেছনে যথেষ্ট কারন রয়েছে বলে আমি মনে করি। যেমনঃ- আমাদের দেশে যেহেতু শি÷িতের হার আশানুরূপ নয় কাজেই কুসংস্কারে বিশ্বাসী লোকজনের সংখ্যাটাও নিতান্ত্ম কম নয়। অনেকে ভাবেন রত্ন পাথর একটি সম্পূর্ণ জড় পদার্থ। আর যেহেতু জড় পদার্থ সেহেতু একটি জড় পদার্থ কিভাবে নিরাময় কার্যে অংশগ্রহন করতে পারে সে সম্পর্কেও মানুষজন সনিদহান। রত্নপাথরে থাকা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সমূহ মানব দেহের ত্বকের সংস্পর্শে এসে ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটায়। কিন্তু এই সংক্রান্ত্ম ব্যাপার নিয়ে অনেক অসৎ মনমানসিকতার মানুষজন ব্যবসা করছে। তারা অজ্ঞ রত্ন পাথরের ব্যাপারে। অথচ তারা মানুষজনকে বিভ্রান্ত্ম করছেন। এছাড়া শি÷িত সমাজের অনেকেই আছেন যারা রত্ন পাথর এবং রত্ন পাথরের নিরাময় সংক্রান্ত্ম ব্যাপারটিকে গুiæত্ব দেয়ার পরিবর্তে ইতিবাচকভাবে দেখার পরিবর্তে বরং ব্যাপারটির অপব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন। মূলত এসমস্ত্ম কারনেই রত্ন পাথরের সাহায্যে নিরাময়ের ব্যাপারটি আমাদের দেশে এখনও ততটা প্রসার লাভ করেনি।

জ্যোতিষশাস্ত্রের কিছু কথা

জ্যোতিষশাস্িত্মর যদিও অনেক পুরনো ইতিহাস রয়েছে। বিশেষ করে ইন্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোলজির তো অনেক পুরনো ইতিহাস রয়েছে। সেই সাথে সমান্তিরালে চলে এসছে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে ভূল ধারনা। আর এর পেছনে যথেষ্ট কারণও রয়েছে। কারণ গবেষনার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এছাড়া বহু অসাধু ব্যবসায়ীরা জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে অসৎভাবে ব্যবসা করছে। কিন্তু অনেকে জানেই না যে জ্যোতিষশাস্ত্রের দেয়া সঠিক দিক নির্দেশনা একজন মানুষের জীবনে অনেকটা রোডম্যাপের মত কাজ করতে পারে। কারন আমরা পবিত্র কুরআর শরীফ থেকে মানুষের উপর, প্রাণী জগতের উপর চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নÿত্রের প্রভাব সম্বন্ধে জেনেছি। অর্থাৎ একথা অনস্বীকার্য যে, একজন মানুষের উপর গ্রহ-নÿত্রের প্রভাব রয়েছে। সে প্রভাব ভালও হতে পারে, খারাপও হতে পারে। আর জ্যোতিষশাস্ত্র গ্রহ-নÿত্রের প্রভাব গুলো সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেয়। কেন না জ্যোতিষশাস্ত্রে যিনি অভিজ্ঞ তিনি জন্ম তারিখ, বার, হাতের রঙ-রেখা, মাউন্ট ইত্যাদি বিবেচনা করে তারপরেই কোনও গ্রহ-নÿত্রের প্রভাব সম্পর্কে বলবেন এবং সেই অনুযায়ী দিক-নির্দেশনা দিবেন। এই বিষয়টির মাঝে ইতিবাচক দিক ছাড়া কোনও নেতিবাচক দিক নেই বলে আমি মনে করি। আশা করি আমার সাথে চিন্তিাশীল ব্যক্তিবর্গও একমত হবেন।

এই পৃথিবীতে আমরা আমাদের জন্মের পর থেকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছি। আর পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই চায় সফল হতে। সাফল্যের স্বাদ আস্বাদন করতে আমরা সবাই আগ্রহী। আমাদের প্রতিনিয়তই বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। সেÿেত্রে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী কিছু দিক নির্দেশনা নিয়ে যদি আমরা আমাদের জীবনকে সিস্টেমে নিয়ে আসতে চাই তাহলে তো দোষের কিছু নেই। জ্যোতিষশাস্িত্র আলোচনা করতে যেয়ে একটি বিষয় না উÏøখ করলেই নয় আর তা হচ্ছে রত্নপাথর একথা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, রত্নপাথরে রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। আর রত্নপাথর যখন আংটি করে পরিধান করা হয় তখন সেটা একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড সৃষ্টি করে। সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকে নির্দিষ্ট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ নির্দিষ্ট কার্যপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মানবদেহের উপর। মাঝখানে রত্ন পাথরের সাহায্যে নিরাময় পদ্ধতি ততটা প্রসার লাভ না করলেও বর্তমানে এ সংক্রান্তি প্রচুর গবেষনা হচ্ছে। বিশেষ একটি গুiæত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যে, রত্ন পাথরের ব্যবহার বিভিন্ন অসুস্থতা, অসমতা যা পরবর্তীতে ঘটতে পারে সেগুলো আগে থেকেই নিয়ন্ত্রন করতে পারে। রত্ন পাথরের ব্যবহার বিধি ব্যাপক। যে পরিধান করছে তার জ্ঞান বৃদ্ধি, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তিাশক্তি পরিবর্ধন, পরিমার্জন, শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা, নিরাময় ইত্যাদি ÿেত্রে রত্ন পাথর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তিার করে। বর্তমানে এই যান্ত্রিক যুগে আমাদের জীবন বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় জর্জরিত। সেই সাথে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মানসিক চাপ, টানা পোড়ন ইত্যাদি। কিন্তু পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই চায় শান্তি, সুন্দর স্বাস্থ্য, নীরোগ জীবন, সফলতা, উন্নতি, সৌভাগ্য ইত্যাদি। আর এই প্রতিটি চাওয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য আমরা জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্য নিতে যদি পারি তাহলে তো দোষের কিছু নেই। তবে জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে সঠিকভাবে উপকার পাওয়ার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ এরকম কারো সঠিক দিক নির্দেশনা প্রয়োজন।

তাই পাঠক আমি আহবান জানাতে চাই আসুন আমরা জ্যোতিষশাস্ত্রের উপকারীতা সঠিকভাবে পাওয়ার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিবেচনা করতে সচেষ্ট হই। নিজে উপকৃত হই এবং অন্যকে উপকৃত হতে উৎসাহিত করি।

মেডিটেশন সংক্রান্ত ৩০টি প্রশ্ন এবং উত্তর

প্রশ্ন ঃ মেডিটেশন কাকে বলে?

উত্তর ঃ মেডিটেশনকে আমরা বিভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। কিন্তু মেডিটেশনের সার্বজনীন সংজ্ঞাটি হচ্ছে। "সচেতনভাবে মনোযোগ পরিচালনার মাধ্যমে আমাদের সচেতনতার বিভিন্ন ধাপ পরিবর্তন করা।" আমাদের মনোযোগ আমরা কিভাবে কিসের মাধ্যমে পরিচালনা করব তার কোনও সীমাবদ্ধতা নেই। তিন ধাপে মেডিটেশনকে বর্ণনা করা যায়। প্রথম ধাপে আমাদের মস্তিষ্ক যে তথ্য পায় সেই অনুযায়ী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। মেডিটেশনের দ্বিতীয় ধাপে আমরা মনকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা শুiæ করি। মনকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা এখান থেকেই শুiæ হয়। মেডিটেশনের তৃতীয় ধাপটিতে আমরা পরিপূর্ণ ধ্যানশীল অবস্থা অর্জন করতে সÿম হই। মনোযোগ হয় অভঙ্গুর ও অনমনীয়। মেডিটেশনের চতুর্থ ধাপে মেডিটেশনের উদ্দেশ্যের সাথে আমাদের মনের একাত্মতা ঘটে অর্থাৎ মনোযোগ বা ধ্যানের পরিপূর্ণ প্রাপ্তি ঘটে। আর এই অবস্থাটুকু অর্জন হয়ে গেলে আমরা আমাদের আত্মার সাথে জগতের প্রতিটি জিনিষের একাত্মতা অনুভব করতে শুiæ করি।

প্রশ্ন ঃ মেডিটেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি গুলো কি কি?

উত্তর ঃ বর্তমানে মেডিটেশন নিয়ে গবেষণার সাথে সাথে মেডিটেশন চর্চার বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়েও গবেষণা হচ্ছে। তাই প্রতিনিয়ত মেডিটেশন চর্চার পদ্ধতির সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। পশ্চাত্যে মেডিটেশনের ১০৮ টি পদ্ধতির নাম জানা যায়। তাদের মধ্যে উ‡jøখ করা যায়ঃ- ভিজুয়ালাইজেশন অফ সেলুলার থিলিং, ইনার গার্ডেন অফ ইডেন, ভিজুয়ালাইজ পারফেক্ট সেল্ফ ইত্যাদি। ভারতবর্ষেও মেডিটেশনের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। আমাদের দেশে মিডিটেশনের প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে সিলভা মেথড, কোয়ানটাম মেথড। আর বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত মেডিটেশনের পদ্ধতি হচ্ছে "লাইফ শাইনিং মেথড"। যেটি সবার কাছে সহজেই বোধগম্য এবং গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন ঃ মেডিটেশনের সাথে শিথিলায়ন, চিন্তাশীলতার কি পার্থক্য?

উত্তর ঃ মেডিটেশন চর্চা করতে গেলে প্রথমেই শিথিল হতে হয়। মেডিটেশনের প্রাণই হচ্ছে শিথিলায়ন বা রিলাক্সেশন। শিথিলায়ণের জন্য সুবিধা জনক অবস্থানে যেয়ে ৪/৫ বার জোরে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে ছেড়ে তারপর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক গতিতে রেখে আলতো করে চোখ বন্ধ করে শিথিলায়ণের পর্যায়ে যাওয়া যায়।

পÿান্তরে শিথিলায়ন চর্চার মাধ্যমে মনের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এ অবস্থাটি হচ্ছে ধ্যানাবস্থা। আর পরিপূর্ণ ধ্যানশীল অবস্থায় সচেতনভাবে মনোযোগ পরিচালনার মাধ্যমে সচেতনতার বিভিন্ন ধাপ পরিবর্তন করার নামই হচ্ছে মেডিটেশন।

আর চিন্তাশীলতাকে ব্যাখ্যা করা যায় দু'ভাবে। কারণ আমাদের মন যখন চিন্তাশীল থাকে তখন আমাদের এনার্জি লস্ হয়। অবিরতভাবে কোনও বিষয় বস্তুকে ঘিরে চিন্তা-ভাবনা আমাদের মন-মস্তিষ্ককে ক্লান্ত করে তোলে, ÿেত্র বিশেষে নিষ্ক্রিয় করে তোলে। অনেক সময় এধরণের চিন্তাভাবনার দiæন মানুষ শারীরিক ভাবেও অসুস্থ হয়ে যায়। তবে আবার ইতিবাচক চিন্তাভাবনাকে উৎসাহ দেয়া যায়। তবে সেই চিন্তাভাবনা কিংবা চিন্তাশীলতার ÿেত্রে পরিমিতি বোধ থাকাটা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ নেতিবাচক চিন্তাশীলতা বর্জণীয় এবং ইতিবাচক চিন্তাশীলতা পরিমিতভাবে গ্রহণীয়।

তবে শিথিলায়ন, চিন্তাশীলতার সাথে মেডিটেশনের পার্থক্য সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব মেডিটেশন সঠিকভাবে চর্চা করার মাধ্যমে।

প্রশ্ন ঃ মেডিটেশনের সাথে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করন এবং আত্মসম্মোহণের কি পার্থক্য?

উত্তর ঃ প্রকৃতপÿে মেডিটেশনের প্রথম ধাপই হচ্ছে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করন। এই ধাপ থেকেই শুiæ হয় মনকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা। মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করণের বিষয়টি হচ্ছে কোনও উদ্দেশ্য বা বিষয়কে সমনে নিয়ে আসা হয় মনোযোগের প্রথম বা প্রধান বিষয় হিসেবে। এর পরে সেটাতে মনোযোগ ছড়িয়ে দেয়া হয় যাতে মনোযোগ কখনই ভিন্নমুখী

না হয়। ধরা যাক, আমরা ঠিক করলাম “গবেষণা” শব্দটি অনুরণিত হতে থাকবে। মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করণের বিষয়টি- অত্যন্ত সুবিন্যস্ত এবং আর্শীবাদপূর্ণ।

পÿান্তরে আত্মসম্মোহণের বিষয়টি শুiæ হয় মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করন দিয়ে কোনও বিষয় বস্তুকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু আত্মসম্মোহণের ÿেত্রে সচেতনতার বিভিন্ন ধাপ পরিক্রমন হয় না যেটি মেডিটেশনে অথ্যবশ্যকীয়। অনেকটা অর্ধ-জাগ্রত অবস্থা বিরাজ করে আত্ম সম্মোহণের ÿেত্রে।

প্রশ্ন ঃ   দিনের কোন সময়ে মেডিটেশন করা সর্বোত্তম?

উত্তর ঃ যে কোনও সময়েই মেডিটেশন চর্চা করাটা উপকারী। কিন্তু প্রতিদিন ভোরে মেডিটেশন চর্চা করাটা সর্বোত্তম। আর এর পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণও বিদ্যমান। আর তা হচ্ছে ভোরে পৃথিবী ব্যস্ত থাকে না। আর তখন মেডিটেশনের জন্য সুন্দর একটা পরিবেশ বিরাজমান থাকে। আর এমতাবস্থায় মেডিটেশন চর্চা করলে আমাদের এনার্জি বাড়বে, মনে শান্তি আসবে, মনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আর সেই সঙ্গে সকালে মেডিটেশন চর্চা করলে আমরা সারাদিনের কাজ করার স্বতঃস্ফূর্ততা, শক্তি আমাদের মাঝে আর্জন করতে পারব।

তবে সকালে যদি অনেকে মেডিটেশন করতে না পারেন তাহলে রাতে খাবারের পূর্বে করতে পারেন কিংবা বিকালে করতে পারেন। এভাবে সম্ভব না হলে দুপুরেও করতে পারেন। তবে সময় পেলে স্বল্প সময়ের জন্য মেডিটেশন আমাদের জন্য বিশেষ উপকারীও বটে। স্ট্রেস দূর করে আমরা আমাদের পরবর্তী কাজের জন্য উৎসাহ পাব। এÿেত্রে মেডিটেশন চর্চাকে একটি রম্নটিনের মধ্যে নিয়ে আসতে পারাটা হচ্ছে সর্বোত্তম।

প্রশ্ন ঃ   কত সময় ধরে মেডিটেশন চর্চা করা যুক্তিসঙ্গত?

উত্তর ঃ একজন মানুষ যখন প্রথম মেডিটেশন চর্চা করা শিখে তখন তারপÿে ১০-১৫ মিনিটের বেশী মেডিটেশন চর্চা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু বেশ কিছুদিন চর্চার পর একজন মানুষ অনেকÿণ ধরে মেডিটেশন চর্চা করতে পারে। অনেকে প্রতিদিন দুইবার করে মিডিটেশন চর্চা করে থাকেন এবং প্রতিবারই ২০-৩০ মিনিট কর। সুতরাং কত সময় কতবার করে মেডিটেশন করতে হবে এব্যাপারে ধরা-বাঁধা কোনও নিয়নম নেই। কারণ আমাদের প্রত্যেকেই জীবন-ধারা একেকরকম। প্রত্যেকের জীবনের পেশা বিভিন্ন রকম। তাই বিভিন্ন মানুষের লাইফ স্টাইল বিভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই প্রত্যেকটি মানুষের জীবন যাপন, জীবন-ধারা, পেশা সবকিছুর সাথে উপযোগী হয় এভাকেব সময় ঠিক করে সেভাবে মেডিটেশন চর্চা করা উচিত। এতে বরং মেডিটেশন চর্চাটা উপভোগ্য এবং সুখকর হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন ঃ   মেডিটেশন চর্চা করার সময় সঙ্গীত ব্যবহার করা যাবে কিনা? যদি করা যায় তাহলে কি ধরনের সঙ্গীত ব্যবহার করা যুক্তি সঙ্গত? এর উপযোগীতা কি?

উত্তর ঃ মেডিটেশন চর্চা করার সময় সঙ্গীত ব্যবহার করা অত্যাবশ্যকীয় কিছু নয়। তবে মেডিটেশনের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সঙ্গীত ব্যবহার করা যায় এবং অনেকে সেটা করেও থাকেন। তবে সেই সঙ্গীত অবশ্যই কোনও হার্ড রক ব্যান্ডের সঙ্গীত কিংবা কোনও হাই বিটের সঙ্গীত নয়। অবশ্যই সেটা হাল্কা, kÖæতিমধুর সঙ্গীত হতে হবে। কারণ অনেকের জন্য মেডিটেশনের উদ্দেশ্যে শান্ত হয়ে, চুপচাপ হয়ে বসাটা একটু কস্টকর হতে পারে। সেÿেত্রে সঙ্গীতের মূচ্ছর্ণা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। এড়োত্রে আরেকটি ব্যাপার উjøখ করা যায়, আর তা হচ্ছে কেউ তার অতি পছন্দের, প্রিয় কোন শিল্পীর গান এÿেত্রে ব্যবহার করতে পারে। আবার সঙ্গীত ব্যবহার না করে শুধু বাদ্যযন্ত্রের হাল্কা মূচ্ছর্ণাও এÿেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ   মেডিটেশনের সময় চোখ খোলা রেখে করতে হয় নাকি চোখ বন্দ রেখে করতে হয়?

উত্তর ঃ মেডিটেমনের সময় চোখ খোলা রাখা বা বন্ধ রাখা ব্যাপারটি সম্পূর্ণই নির্ভর করে যে করছে তার উপর। কারণ অনেকে অভিযোগ করতে পারেন যে, চোখ বন্ধ রেখে মেডিটেশন চর্চা করলে ঘুম ঘুম ভাব অনুভূত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী

থাকে। সেÿেত্রে তারা চোখ অর্ধ খোলা বা অর্ধ বন্ধ অবস্থায় রাখতে পারেন। আবার সম্পূণ চোখ খোলা রাখলে মনোযোগ বিÿিপ্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য চোখ বন্ধ রাখাটাই যুক্তি সঙ্গত। মেডিটেশন চর্চা করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কেউ যদি কোন বিন দু, মোমবাতির শিখা এগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে মেডিটেশন চর্চা করতে চান তাহলে মাথা ব্যথা, চোখ ব্যথা, ঘাড় ব্যথা হতে পারে। সেজন্য চোখ অর্ধ খোলা, অর্ধ বন্ধ অবস্থায় রাখা যেতে পারে। তবে বেশীর ভাগ ÿেত্রে এটাই প্রচলিত সবার মাঝে চোখ বন্ধ করে মেডিটেশন চর্চার ব্যাপারটি।

প্রশ্ন ঃ মেডিটেশনের শারীরবৃত্তীয় প্রভাবগুলো কি কি?

উত্তর ঃ মেডিটেশনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত শারীর বৃত্তীয় প্রভাবগুলো পরিলÿিত হয়। যেমন-মেডিটেমনের মাধ্যমে যেহেতু গভীর বিশ্রাম হয় তাই সেÿেত্রে বিপাকীয় প্রকিয়ার হার হ্রাস পায়। হার্টবিট হ্রাস পায়। রক্তে ল্যাকটেট এবং কর্টিসোল (মানসিক চাপের জন্য জড়িত দুটি রাসায়নিক পদার্থ)-এর পরিমাণ কমে যায়। উচ্চ রক্ত চাপ হ্রাস পায়। অস্বাভাবিক কোলেস্টোরেল মাত্রাকে নামিয়ে আনে। আমাদের দেহের চামড়ার প্রতিরোধ ÿমতা বাড়ায়। শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া বা ফেলার বিশেষ ব্যায়াম হয়। রক্তে এড্রিনালিন হরমোনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখে আর রক্তে এড্রিনালিন হরমোনের আধিক্যতা বেড়ে গেলে জীবকোষ ও টিস্যুর পুর্ণগঠন প্রকিয়া ধীর হয়ে যায়। এছাড়া রক্তে এবং জীবকোষে যে সমস্ত্ম পদার্থের উপস্থিতির কারণে জীবকোষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বা মানুষ তাড়াতাড়ি বার্ধক্যে উপনীত হয়, মেডিটেশন চর্চার কারণে সে সমস্ত্ম পদার্থের উপস্থিতির হার হ্রাস পায়। উc্jøখিত শারীর বৃত্তীয় প্রভাবগুলো ছাড়াও আরও বহুবিধ শারীরবৃত্তীয় প্রভাব মেডিটেশরে করণে পরিলÿিত হয়।

প্রশ্ন ঃ মেডিটেশন চর্চার সময় অনেকের শারীরে ব্যথা অনুভব হয় কেন?

উত্তর ঃ অনেক সময় মেডিটেশন চর্চার পরিপ্রেÿিতে শরীরে ব্যথা অনুভব হয়। দুটি কারণে এটা হতে পারে। প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে যদি কেউ অস্বস্তিকর, আরামদায়ক নয় এ ধরনের ভঙ্গিমায় কিংবা অস্বস্তি অনুভব হচ্ছে এ ধরনের শারীরিক ভঙ্গিমায় মেডিটেশন চর্চা করে। আরেকটি কারণ হচ্ছে, মেডিটেশন করার ফলে আমাদের মন শান্ত হয়ে আসে, ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং সেটা ধীর গতিতে হয়। কিন্তু মেডিটেশনের ফলাফল যদি আমরা শারীরিকভাবে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়ে যাই কিংবা মেডিটেশনের ফলাফলকে যদি আমরা শারীরিক ভাবে অনুভব করতে চাই খুব তাড়াতাড়ি তাহলে সেÿেত্রেও ব্যথা ব্যথা ভাব অনুভব হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ মেডিটেশন চর্চার সময় শরীরে ব্যথা অনুভব হলে এর পরিপ্রেÿিতে কি করা উচিত?

উত্তর ঃ প্রধানতঃ শারীরিক ভঙ্গিমা কিংবা অবস্থানের জন্যই শরীরে ব্যথা অনুভব হয়। কাজেই শারীরিক অবস্থান পরিবর্তন করে স্বস্তি কর অবস্থান গ্রহণ করে মেডিটেশন চর্চা করলে শরীরে ব্যথা অনুভব আর হবে না। কাজেই এÿেত্রে কোনও ধরনের পেইন কিলার খাওয়ার প্রয়োজন নেই। আবার অনেক সময় মেডিটেশন চর্চা স্বস্তিকর অবস্থানে থেকে করলেও এমনিও ব্যথা ব্যথা অনুভব হতে পারে শরীরে। সেÿেত্রেও কোনও পেইন কিলার কিংবা কোনও ওষুধের প্রয়োজন নেই। কিছুদিন চর্চার পর এমনিই সেটা নিরাময় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ মেডিটেশন চর্চার জন্য একজন দÿ প্রশিÿকের নিকট থেকে প্রশিÿণ নেয়ার প্রয়োজন আছে কি?

উত্তর ঃ মেডিটেশন সংক্রান্ত কোনও বই পড়ে মেডিটেশন থিউরীটিক্যালি জানা যাবে। এত হয়ত কেউ একজন মেডিটেশন চর্চা শুiæও করতে পারবে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই যখন কেউ প্রথম প্রথম মেডিটেশন চর্চা শুiæ করে তখন তার মনে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নে সৃষ্টি হয়। সেজন্য একজন দÿ প্রশিÿকের নিকট প্রশিÿন নেয়া হলে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে পাওয়া যাবে এবং মেডিটেশন শিÿা স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লাভ করাবে। এছাড়া কোনও প্রশিÿকের নিকট প্রশিÿণের সময় MÖæপ করে চর্চা করানো হয়। এতে অন্যদের বিভিন্ন প্রশ্ন, সেগুলোর উত্তরসমূহও জানা যায়। এতে মেডিটেশন

সম্পর্কে ধারণা পরিস্কার হয়, গভীর থেকে গভীরতর হয়। আর তাই সবদিক থেকে বিবেচনা করলে মেডিটেশন চর্চার জন্য একজন দÿ প্রশিÿকের নিকট থেকে প্রশিÿণ নেয়ার প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন ঃ একা একা মেডিটেশন চর্চা করলে বেশী উপকার পাওয়া যায় নাকি MÖæপ করে কোনও মেডিটেশন চর্চা কেনেদ্র মেডিটেশন চর্চা করলে বেশী উপকার পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ সাধারণত যা হয়ে থাকে আর তা হচ্ছে বেশীরভাগ মানুষই কোনও মেডিটেশন চর্চা কেনেদ্র ভর্তি হয়ে মেডিটেশন চর্চা প্রথমে আয়ত্ত্ব করে। এরপর একা একাই বাসায় চর্চা করে থাকে। কিন্তু উপকারের প্রশ্ন যদি উঠে তাহলে বলা যায় ব্যাপারটা আপেÿিক। কারণ একজন মানুষে মেডিটেশন থেকে কতটা উপকৃত হবে সেটা সম্পূর্ণই তার নিজস্ব মেডিটেশন চর্চার নিপুনতার উপর নির্ভরশীল তবে MÖæপ করে মেডিটেশন চর্চা করলে অবশ্যই তার একটি ভিন্নতর প্রভাব রয়েছে। কারণ একটি MÖæপে যদি ১০ থেকে ২০ জন থাকে তাহলে মেডিটেশন চর্চার সময় একজনের অভিজ্ঞতা, মতামত, প্রশ্ন, দৃষ্টিভঙ্গী আরেকজনের মাঝে বিনিময় হতে পারে। আর এত অবশ্যই উপকারের সম্ভবনা বেশী। সুতরাং ভিন্নতা আনয়ণের জন্য। অভিজ্ঞাতার প্রসার বাড়ানোর জন্য মাঝে মধ্যে MÖæপে মেডিটেশন চর্চা করা যেতে পারে। এর জন্য নিকটবর্তী মেডিটেশন চর্চা কেনেদ্র মাঝে মধ্যে অংশগ্রহণ করা যেতে পারে। এতে উপকারের সম্ভবনাই বেশী।

প্রশ্ন ঃ মেডিটেশনের সময় একজন কিভাবে নিজেই নিজের প্রশিÿকের ভূমিকা পালন করতে পারে?

উত্তর ঃ সাধারণতঃ বেশীর ভাগ মানুষই মেডিটেশন চর্চা করা কোন একজন প্রশিÿকের কাছ থেকেই শিখে। মেডিটেশন চর্চা আয়ত্ত্ব করার উদ্দেশ্য একেক মানুষের একেক রকম। অর্থাৎ মানুষ ভেদে সমস্যাও ভিন্নরকম। একজন প্রশিÿকের কাছ থেকে মেডিটেশন চর্চার সার্বজনীন বা সাধারণ দিকনির্দেশনা লাভ করা সম্ভব। কিন্তু নিজস্ব সমস্যা মোতাবেক সেইভাবে মেডিটেশন চর্চা সম্পূর্ণই একজনের একানত্ম নিজস্ব ব্যক্তিগত চর্চা। তাই এÿেত্রে অবশ্যই একজন নিজেই নিজের প্রশিÿকের ভূমিকা পালন করতে পারে সফলভাবে।

প্রশ্ন ঃ আমি আমার ঘুম কমাতে চাই, মেডিটেশন কি ঘুমের প্রয়োজনীয়তা কমাতে পারে? মেডিটেশন কি ঘুমের বিকল্প হতে পারে?

উত্তর ঃ একজন মানুষ যখন গভীর ঘুমে নিমজ্জিত হয় তখন মানুষের দেহাভ্যনত্মরীণ বিপাকীয় প্রক্রিয়ার হার হ্রাস পায়। আর এই অবস্থার চেয়েও বিপাকীয় প্রকিয়ার হার হ্রাস পায় অনেক অনেক বেশী যখন একজন মানুষ মেডিটেশন চর্চা করা অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে মানুষ এতটাই গভীর বিশ্রাম লাভ করে এবং সেই সঙ্গে শিথিলায়নের চরম পর্যায়ে যেতে সÿম হয়। আর এই ব্যাপারটিকে তুলনা করা যায় যেন কোন নষ্ট জিনিষ পুনiæদ্ধারের সাথে কিংবা পূর্ণযৌবন প্রাপ্তির সাথে। কিন্তু গভীর ঘুমে যে বিশ্রাম হয় তার সাথে ব্যাপারটিকে তুলনা করা যায় না। কারণ মেডিটেশনের চরম পর্যায়ে অবস্থান করেও একজন পরিপূর্ণভাবে সচেতন থাকতে পারে। মেডিটেশন, ঘুম দু'টো সম্পূর্ণই ভিন্ন অবস্থা সচেতনতার। দু'টোর কার্যবলীও ভিন্ন। সেÿেত্রে, ঘুম যেমন মেডিটেশনের উপকারীতা এনে দিতে পারে না, তেমনি মেডিটেশনও পুরোপুরি ভাবে ঘুমের বিকল্প হতে পারে না। তৎসত্ত্বেও, বহুদিন ধরে মেডিটেশন চর্চা করে যেতে থাকলে মেডিটেশন মানসিক কার্যাবলীগুলোকে অনেক খানি বিশুদ্ধ করে, সরল করে। অর্থাৎ মেডিটেশন চর্চায় সফল হলে শরীর ও মনের একটা অনুকূল অবস্থা বিরাজ করে। আর এ অবস্থায় একজনের কম ঘুমের দরকার হয়। এছাড়া বহুদিন ধরে মেডিটেশন চর্চা করছেন এমন অনেকেই বলে থাকেন যে মেডিটেশন চর্চার কারণে তারা প্রাণশক্তি বেশী লাভ করেছেন আর সেÿেত্রে তাদের কম ঘুমের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ঃ মেডিটেশনের সময় প্রধানতঃ কি ঘটে থাকে?

উত্তর ঃ মেডিটেশনের সময় প্রধানতঃ নিম্লোক্ত ব্যাপার গুলো ঘটে থাকে যেমন-

১. হৃৎস্পনদনের হার হ্রাস পায়, শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া এবং ফেলার হার হ্রাস পায়।

২. স্ট্রেস বা মানসিক চাপের জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী হরমোন “cøাজমা কর্টিসোল” কমতে থাকে।

৩. নাড়ী স্পন্দন করমে থাকে।

৪. বিপাকীয় প্রক্রিয়ার হারহ্রাস পায়।

৫. রক্তচাপহ্রাস পায়।

৬. মাস্‌ল রিলাক্সেশন হয়।

৭. রক্তে ল্যাকটেটের পরিমাণ কমতে থাকে। আর ল্যাকটেটই মানুষের উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, টেনশন ইত্যাদির জন্য দায়ী। প্রধানতঃ মেডিটেশন চর্চাকালে শিথিলায়ণের চরম পর্যায়ে উপরোক্ত শারীর বৃত্তীয় এবং প্রাণরাসায়নিক ব্যাপারগুলোর প্রশমন ঘটতে থাকে।

প্রশ্নঃ মেডিটেশনের সময় আমাদের শরীর কি ধরনের বিশ্রাম লাভ করে?

উত্তরঃ মেডিটেশনের সময় গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে বেরিয়ে এসেছে যে, মেডিটেশনের সময়ে আমাদের দেহ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, প্রসারিত অধিক সময়ের বিশ্রাম লাভ করে যো খুবই গুiæত্বপূর্ণ। সেই একই সময়ে আমাদের মস্তিষ্ক (Brain) এবং মন অধিকতর সচেতন হয়ে যায়। সুতরাং একদিকে যেমন শরীর প্রচন্ড বিশ্রাম পাচ্ছে আবার অন্যদিকে ব্রেইন এবং মন অধিকতর সচেতন হচ্ছে। এই দুটি ব্যাপারের সমন্বয় ঘটার দাiæণ যেটা হয় আর তা হচ্ছে মানুষের ক্রিয়েটিভিটি বা সৃষ্টিশীলতা প্রশস্ত হয়, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনুভূতি বাড়তে থাকে, উপলব্ধি করার অনুভূতিও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রশ্ন ঃ কারো মন প্রচন্ড ব্যস্ত এবং অস্থির এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কি তার আদৌ মেডিটেশন চর্চা করা সম্ভব?

উত্তর ঃ সাধারণতঃ পৃথিবীতে বেশীর ভাগ মানুষেরই মন প্রচন্ড অস্থির। সেই সঙ্গে কারণে অকারণে মন প্রচন্ড ব্যস্ত। আর ব্যস্ত অস্থির মন কখনই একটি স্বাভাবিক অবস্থা না। কারণ এ ধরনের মানসিক পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেয়া, কাজ করা ইত্যাদি সহ কোনও কিছুই সঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। অর এ পরিস্থিতিতে মেডিটেশন করাটাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। কারণ অস্থির, ব্যস্ত থাকতে থাকতে হাইপ্রেশার, হার্টের অসুখ এগুলোও হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। সুতরাং অস্থির ব্যস্ত মনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, মনের শক্তি বাড়ানোর জন্য মেডিটেশনের বিকল্প নেই। তবে এক্ষেত্রে যাদের মন অস্থির, ব্যস্ত তাদের মনে হতে পারে মেডিটেশন চর্চা আয়ত্ত্ব করা তাদের জন্য ভীষণ কঠিন। কিন্তু ব্যাপারটি আসলেও তা নয়। মেডিটেশন চর্চার বহু পদ্ধতি রয়েছে। সহজতর পদ্ধতিতে মেডিটেশন চর্চা করে অনায়াসেই ব্যস্ত, অস্থির মনের অধিকারীরা সুন্দর, শান্ত, নির্মল, অনাবিল মনের অধিকারী হতে পারেন। সেই সঙ্গে মনের শক্তিও বাড়াতে পারেন বহুগুণ।

প্রশ্নঃ মেডিটেশন রেগুলার চর্চা করে যাওয়ার যৌক্তিকতা কি?

উত্তর ঃ মেডিটেশনের উপকারীতা ক্রমপুঞ্জীভবনশীল। অর্থাৎ দুদিন চর্চা করে পাঁচদিন করা হল না। তারপর আবার করা হল। এতে মেডিটেশনের উপকারীতা বিচ্ছিন্ন ভাবেই হতে থাকে। কিন্তু কম সময়ের জন্য হলেও যদি প্রতিদিন অর্থাৎ রেগুলার মেডিটেশন চর্চা করা যায় তাহলে মেডিটেশনের উপকারীতা নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই, ক্রমবর্ধনশীল ভাবেই হতে থাকে। সেই সঙ্গে মেডিটেশনের উপকারীতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে ক্রমশ। তাই প্রতিদিন দুই বার ১৫-২০ মিনিট করে হলেও রেগুলার মেডিটেশন চর্চা করে যাওয়া উচিত।

প্রশ্ন ঃ আমি একজন অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, মেডিটেশনের জন্য আলাদা করে সময় বের করা কঠিন। তারপরও আমি মেডিটেশন চর্চা করতে চাই এ ব্যাপারে সঠিক দিক নির্দেশনা চাচ্ছি।

উত্তর ঃ প্রায় অনেকেই এরকম বলে থাকেন যে, তারা অনেক ব্যস্ত। মেডিটেশনের জন্য আলাদা করে সময় বের করা তাদের জন্য খুব কঠিন কিংবা অসম্ভব। কিন্তু যদি তাদের একান্ত ইচ্ছা থাকে মেডিটেশন করার জন্য, তাহলে ব্যস্ততা সেক্ষেত্রে কোনও প্রতিবন্ধকতা হওয়ার কথা নয়।

উদাহরণ স্বরূপ, কেউ একজন প্রফেশনাল কাজে ব্যস্থ কিংবা ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্থ। তাহলে প্রফেশনাল কাজের ফাঁকে, ব্যবসায়িক কাজের ফাঁকে ১৫-২০ মিনিট সময় বের করে সে অনায়াসে মেডিটেশন চর্চা করতে পারে। এর জন্য তার দৈনিক কাজ-কর্মের সময় সূচী যদি কিছুটা পরিবর্তন করার বা অ্যাডজাস্ট করার প্রয়োজন হয় তাও সে করতে পারে। এরকম কিছু দিন করার ফলে মেডিটেশন চর্চা করাটা একটা iæটিন ওয়ার্কে পরিণত হবে এবং সেই সঙ্গে একটা অভ্যাসেও পরিণত হবে। তখন শত ব্যস্থতা থাকলেও মেডিটেশনের জন্য আলাদা করে সময় বের করাটা আর কঠিন কিংবা অসম্ভব বলে মনে হবে না।

প্রশ্ন ঃ মেডিটেশনের উপকারীতা কি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্নতর হয়? যদি তাই হয় তবে এর কারণ কি?

উত্তর ঃ মেডিটেশনের উপকারীতা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে অবশ্যই ভিন্নতর হতে পারে। এর কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিত্বও আলাদা। কাজেই মেডিটেশন চর্চা আয়ত্ত্ব করার বিষয়টিও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিশেষে। এছাড়া একেকজন মানুষের দÿতা, নিপুনতার বিসয়টিও ভিন্ন ভিন্ন। কাজেই এসব কিছু বিচেনার আলোকে বলা যায় মেডিটেশনের উজারীতা অবশ্যই ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে মন-মানসিকতার কি ধরনের পরিবর্তন সাধারণতঃ ঘটে থাকে?

উত্তর ঃ মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে মন-মানসিকতার নিম্নোক্ত পরিবর্তন গুলো সাধিত হয়ঃ

১. আবেগের সমতা বজায় থাকে, সেই সঙ্গে অতিরিক্ত আবেগ প্রশমিত হয়।
২. ডিপ্রেশন এবং হতাশায় ভোগা থেকে মানুষ রÿা পায়।
৩. মানসিক উদ্বেগ এবং টেনশনও বহুলাংশে হ্রাস পায়।
৪. মানুষের মানুসক প্রশান্তি বাড়ে।
৫. মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণ তথা আত্মপ্রকৃতি উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।
৬. স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।
৭. ক্রোধ, ঘৃণা, ÿোভ, উত্তেজনা, বিরক্তি, সন্দেহ এগুলোর প্রত্যেকটিই প্রশমিত হয়। সর্বোপরি মানুষের মন-মানসিকতা একটি স্থিতিশীল অবস্থা লাভ করে।

প্রশ্ন ঃ মেডিটেশন চর্চার সাথে বিশ্বাসের ভূমিকা কতটা গুiæত্বপূর্ণ?

উত্তর ঃ বিশ্বাস হচ্ছে একটি বুদ্ধি ভাবাসম্পন্ন মানসিকতা যা মনকে সুনিপুন করে। বিশ্বাস মনকে ধ্বংসের হাত থেকে রÿা করে। আর মেডিটেশন চর্চার সাথে বিশ্বাসে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কারণ মেডিটেশন করে আমি উপকৃত হবো। ইতিবাচকভাবে আমার জীবনে পরিবর্তন আসবে। মেডিটেশন আমার জীবনের জন্য সঠিক দিক-নির্দেশনা। এসব কথা মনে-প্রাণে অন্তর থেকে বিশ্বাস করতে হবে। তা না হলে মেডিটেশন চর্চা করে বিন্দুমাত্র উপকারীতাও পাওয়া সম্ভব নয়। প্রচলিত কথা আছে যে, "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।" আর তাই বলা যায়, মেডিটেশন চর্চার সাথে বিশ্বাসের ভূমিকা বিশেষ গুiæত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ঃ মেডিটেশন কি শুধু বই পড়ে কিংবা ক্যাসেট শুনে আয়ত্ত্ব করা সম্ভব?

উত্তর ঃ বর্তমান মেডিটেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বলিত ক্যাসেট, বই এগুলো পাওয়া যায়। এগুলো শুনে বা পড়ে মেডিটেশন সম্পর্কে কিছুটা ধারনা তো অবশ্যই হয়। কিন্তু সুনিপুনভাবে মেডিটেশন চর্চা করতে গেলে একজন দÿ প্রশিÿক বিভিন্ন উদাহরণ, ইতিহাস, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সহকারে মেডিটেশন চর্চা করা শেখাবেন। যেটা বইয়ে সবিস্থারে বর্ণনা হয়ত সম্ভব নয়, কিংবা ক্যাসেটে স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই শুধু বই পড়ে, ক্যাসেট শুনে মেডিটেশন চর্চা পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত্ব করা সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, মেডিটেশন চর্চা কোনও দÿ প্রশিÿকের কাছ থেকে শিখে বাসায় ক্যাসেট শুনে, বই পড়ে সেই চর্চাকে আরও পরিশীলিত করা সম্ভবপর।

প্রশ্ন ঃ মেডিটেশন চর্চার সময় কোনও অভ্যাস ত্যাগ করা জাiæরী কিনা?

উত্তর ঃ মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মনের শক্তি বাড়ানো যায়। কিন্তু এই ব্যাপারটির সাথে নিজস্ব অভ্যাসের যোগসূত্র খুঁজে বের করাটা ঠিক নয়। বরং এভাবে ভাবা উচিত যদি কোনও বদভ্যাস কারও থেকেও থাকে তাহলে সেটা মেডিটেমন চর্চার মাধ্যমে দূর হয়ে সুন্দর, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠতে পারবেন।

উদাহরনস্বরূপ বলা যায়, কারো সিগারেটের নেশা, মদের নেশা, মেয়ে মানুষের নেশা, মাদকসক্তি ইত্যাদি থাকতে পারে। এগুলোর প্রত্যেকটিই ভীষণ রকমের খারাপ। এগুলোর প্রত্যেকটিই একজনের জীবন ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে এই বদভ্যাস গুলো থেকে মুক্তির জন্য চেষ্টা করা যেতে পারে। এক সময় চেষ্টার ফলে অবশ্যই এই বদভ্যাসগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ মেডিটেশন চর্চার সময় খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা জাiæরী কি না?

উত্তর ঃ আমাদের প্রত্যেকেরই এমন সব খাবার গ্রহণ করার অভ্যাস থাকা উচিত যা সহজপাচ্য এবং শরীরে কাজে লাগে। অযথা বাড়তি মেদ জমা কিংবা হার্টের অসুখ, ডায়েবেটিস, উচ্চ রক্ত চাপ এই সমস্ত্ম রোগ হতে পারে এধরনের খাদ্যদ্রব্য যতটা সম্ভব পরিহার করা উচিত। আমরা চাই দেহের সুস্থতা। আমরা চাই মনের সুস্থতা। মেডিটেশন চর্চার সময় খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা জাiæরী নয়। বরং শরীর ও মনের উপর অযথা চাপ সৃষ্টি না হয় এধরনের খাদ্যদ্রব্য বরাবরই গ্রহণ করা উচিত। কারও যদি সে ধরনের খাদ্যগ্রহণের অভ্যাস না থাকে তাহলে মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে সে ধরনের খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সাধনা করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ মেডিটেশন চর্চা কি একজনকে আত্ম-কেনদ্রীক করে তোলে?

উত্তর ঃ মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে একজন আত্মশুদ্ধির সুযোগ পায়। নিজস্ব চিন্ত্মাভাবনার প্রসার ঘটানোর জন্য বাস্ত্মবে রূপ দেয়ার জন্য আত্ম চর্চা করে। সর্বোপরি নিজেকে সফল, সুখী, সুন্দর মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একটা সাধনা শুiæ হয়ে যায় মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, মেডিটেশন একজনকে আত্মকেনিদ্রক করে তোলে। আত্ম সচেতনতা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু অত্যান্ত্ম আত্মকেনিদ্রক প্রবণতা অবশ্যই বর্জনীয়। তাই বলা যায় মেডিটেশন চর্চা অবশ্যই কাউকে আত্মকেনিদ্রক করে না। বরং কেউ যদি আত্মকেনিদ্রক থাকেও মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে তার অন্ত্মদৃষ্টি খুলে যাবে এবং তখন সে তার চার পাশ, পরিবার, স্বজন, সমাজ সর্বোপরি নিজেকে গড়ে তোলার পাশাপাশি সে তার চারপাশ, চারপাশের মানুষ জনকেও গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে।

প্রশ্ন ঃ আমি ভীষণ রকম কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করি যেখানে সব সময় হৈ চৈ থাকে, রাস্ত্মার গাড়ীর হর্ন শুনতে পাওয়া যায়। এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা আমার পœ সম্ভব নয়। কিন্তু আমি এর মাঝেও মেডিটেশন করতে চাই। এ ব্যাপারে আমার করণীয় কি?

উত্তর ঃ বেশীর ভাগ েক্ষত্রেই আমাদের চারপাশের পরিবেশ আমাদের অনুকূলে থাকে না মেডিটেশন করার জন্য। তারপরেও সেই পরিবেশের মাঝেও আমাদের মেডিটেশন করতে হয়। কারো চারপাশের পরিবেশ যদি কোলাহল পূর্ণ হয়, রাস্ত্মার গাড়ীর হর্ন যদি শোনা যায় এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কেননা বাসস্থান পরিবর্তন, মেডিটেশনের স্থান পরিবর্তন এগুলো সহজতর নয়। তাই যা করতে হয় আর তা হচ্ছে এর মাঝেও মনোযোগকে কেনদ্রীভূত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। উপরন্তু কোলাহল, গাড়ীর হর্ন এগুলোকে ইতিবাচক ধরে নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। দেখা যাবে এক সময় মেডিটেশন চর্চাতে সাফল্য আসবেই।

প্রশ্ন ঃ মেডিটেশনের সাহায্যে আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কি?

উত্তর ঃ মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে আয়ু বৃদ্ধি পায় কিনা এ সংক্রান্ত অনেক গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তবে গবেষণালব্ধ ফলাফলের কথা না বলে আমরা যদি আমাদের সাধারণ দৃষ্টি কোন থেকে আলোচনা করি তাহলে বিষয়টি আমাদের কাছে পরিস্কার হবে। যেমনঃ- মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে মনের শক্তির সঠিক ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ এবং সেই সঙ্গে মনের শক্তি বাড়ানোর কৌশল মানুষ শিখে। আর তাই তখন মানুষের মনে দুঃখ, দুশ্চিন্তা, ক্ষোভ, কষ্ট, ক্রোধ এগুলো আসন গেড়ে বসতে পারে না। সেজন্য মানুষ সব সময় উচ্ছ্বল, প্রাণবন্ত থাকে, যা মানুষের জীবনীশক্তি বাড়ার বিশেষ সহায়ক। এছাড়া মানুষ নেতিবাচক চিন্তাকে পরিহার করতে শিখে। কোন রকম মানসিক চাপ ছাড়া সুন্দর জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। ফলে সাধারণত মানুষ মৃত্যুবরণ করে যে সমস্ত রোগে যেমনঃ- হার্ট অ্যাটাক, হাইপ্রেশার, কোলেস্টেরল বৃদ্ধি এগুলোর ঝুকিও কিছুটা কমে যায়। এভাবে মানুসের মৃত্যুঝুকি কমে যেয়ে জীবনের পরিধি বেড়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ মেডিটেশনের সাহায্যে ব্রেইন ওয়েবের কার্যকারিতা কিভাবে বৃদ্ধি পায়?

উত্তর ঃ মেডিটেশন করার সময় যখন আমরা ব্যস্ততম বিটা লেবেল থেকে চরম আর্শীবাদপূর্ণ আলফা লেবেলে পৌঁছে যাই তখন প্রকৃত পক্ষে আমরা শিথিলায়নের চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাই। তখন আমাদের ব্রেইনের ডানে, বামে, সামনে, পিছনে এই চার অংশ উদ্দীপিত হয়। এ পর্যায়ে ব্রেইন ওয়েভের কার্যকারিত আমরা যে ভাবেই চাইব সেভাবেই সম্ভব হবে। এভাবেই আমাদের ব্রেইন ওয়েভের কার্যকারিত বেড়ে যায়। বিভিন্ন গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণে সেরকমই পরিলক্ষিত হয়েছে।

মেডিটেশনে নতুন জীবন

নেপেলিয়ন হিল লিখেছিলেন, "মানুষের মন যা কল্পনা করে এবং বিশ্বাস করে, মানুষ তা অর্জন করতেও পারে"।

আর মানুষের মনের কল্পনা, বিশ্বাস এবং অর্জন এই বিষয়গুলোর মাঝে যোগসূত্র স্থাপনই করে মেডিটেশন। পূর্বে যদিও মনে করা হত মেডিটেশন সর্ম্পূনই ধর্মীয় চর্চার অর্ন্তভূক্ত কিন্তু আস্তে আস্তে গবেষনার আলোকে বেরিয়ে এসেছে যে মেডিটেশন শরীর ও মন দুইেেত্রেই অসম্ভব অসম্ভব উপকারী ভূমিকা পালন করছে। শরীর ও মন উভয়ই ভীষন ভাবে উপকৃত হচ্ছে। সেই সঙ্গে মানুষের মনের কল্পনা শক্তি, বিশ্বাস এগুলোকে কোনও কিছুর অর্জনের দিকে নিয়ে যায় মেডিটেশন।

এই পৃথিবীতে আমরা বহু মেধাবী লোকদের খুঁজে পাব কিন্তু তার সবাই হয়ত নিজেদের মেধাশক্তিকে কাজে লাগাতে পারেন না। মেডিটেশন মানুষের মাঝে লুক্কায়িত মেধাশক্তিকে বিকশিত করে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে করে উন্নত এবং উজ্জ্বল। একথা ঠিক যে এক এক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী একেক রকম কিন্তু যার যার দৃষ্টিভঙ্গীর নিজস্ব অবস্থান থেকেই মেডিটেশনের সাহায্যে একটি সুন্দর জীবন লাভ করা সম্ভব। জীবনকে একটি সিস্টেমে নিয়ে আসা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে একটি গল্প উjøখ করতে চাই। একটি ফুলের দোকানে তিনজন ফূল বিক্রেতা আছেন যারা নিজে হাতে ফুলের তোড়া তৈরী করে বিক্রি করেন। এখন তাদের তিনজনকেই জিজ্ঞেস করা হল "আপনারা কি করছেন?" প্রথম জন উত্তর দেবে "দেখছ না আমি জীবিকার জন্য ফুলের তোড়া তৈরী করছি।" দ্বিতীয় জন বলবে "আমি ফুলের তোড়া বানাচ্ছি।" তৃতীয় জন বলবে, "আমি খুব সুন্দর একটা কাজ করছি।" অর্থাৎ তিনজন একই কাজ করছে। কিন্তু উত্তর দিচ্ছে তিনজন তিনরকম দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী, মন মানসিকতা যাই হোক না কেন মেডিটেশনের সাহায্যে দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিক উৎকর্ষতার চরম শীর্ষে আরোহন করা সম্ভব।

বর্তমানে পাশ্চাত্যে মেডিটেশনের কদর খুবই বেশী। অথচ মেডিটেশনের শুiæর ইতিহাস রয়েছে এশিয়া মহাদেশের বেশ কয়েকটি দেশে। যেমনঃ- ভারত, চীন, জাপানে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ডাক্তাররা তাদের রোগীদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন মেডিটেশন করার জন্য। শিÿকরা তাদের ছাত্রদেরকে মেডিটেশন চর্চা করতে বলছেন। এমনকি কর্মচারী, শ্রমিক সবাই কাজে যোগদানের পূর্বে মেডিটেশন চর্চা করছেন। অথচ আমাদের দেশে মেডিটেশন চরমভাবে অবহেলিত। উন্নত বিশ্বে মেডিটেশনের শারীরিক উপকারীতা নিয়ে প্রচুর গবেষনাও হচ্ছে। ১৯৭০ সালে জার্নাল অফ ট্রান্সপার্সোনাল সাইকোলজীতে মেডিটেশনের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব সংক্রান্ত প্রথম নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এরপর পথচলা থেমে থাকেনি। এ পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় ১০৮ টি সাইনিটফিক জার্নালে পাঁচশতর উপরে মেডিটেশনের উপর গবেষনাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। তবে হ্যাঁ, মেডিটেশনের উপকারীতা সঠিকভাবে পেতে গেলে প্রয়োজন সঠিক চর্চা এবং অনুশীলন। সঠিক চর্চা এবং অনুশীলন না করলে মেডিটেশন যত ভালই হোক না কেন উপকারীতা পাওয়া সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আমি বিখ্যাত বেহালা বাদক ক্রিসলারের কথা উjøখ্য করতে চাই। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, সে কি ভাগ্যের জোরে এত ভাল বাজায়? ক্রিসলার বলেছিল যে সে অনুশীলন করে চর্চা করে আর তাই সে ভাল বাজায়। এর সাথে ভাগ্যের কোনও সম্পর্ক নেই। সুতরাং অবশ্যই মেডিটেশন চর্চা করতে হবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে।

মেডিটেশনের বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। যেমনঃ শিথিলায়ন, অটো সাজেশন, মনছবি ইত্যাদি। প্রত্যেকটি ধাপেই আমরা অনুভব করতে পারি চরম শান্তি এবং উৎকর্ষতা।

আমাদের জীবন একটি বুমেরাং এর মত। অর্থাৎ আমাদের চিন্তা ভাবনা, কাজকর্ম, রীতিনীতি, ব্যবহার সবকিছু যেমনই হোক, সে সব আজ হোক, কাল হোক আমাদের কাছে ফিরে আসবেই আসবে। বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। একটি পাহাড়ে গিয়ে যদি চিৎকার করা যায় তাহলে সেই চিৎকার অনবরত প্রতিধ্বনি হতে থাকে। মেডিটেশনের সাহায্যে আমাদের ব্রেইন ভাল কিছু কথা, কাজ উপদেশ, অটোসাজেশন ইত্যাদি আমরা কম্পোজ করে দিতে পারি। এতে যা

হবে এগুলোই অনবরত প্রতিধ্বনি হতে হতে জীবন একটি সুন্দর সিস্টেমে চলে আসবে এবং আমাদের ভাল থাকার পরিমানও যাবে বেড়ে।

সুতরাং, পাঠক আমাদের অতীতে জীবন যাই হোক না কেন এখন থেকে মেডিটেশন হোক আমাদের নিত্যসঙ্গী। শরীর ও মনের উন্নতি সাধনের জন্য বর্তমানে মেডিটেশনের বিকল্প নেই। এ কথাটি পাশ্চত্যের মানুষেরা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আমরাও আর পিছিয়ে থাকতে চাই না। মেডিটেশনের আলোয় আমরা আলোকিত হতে চাই। সুন্দর জীবন গড়তে চাই- এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

পাঠকের উদ্দেশ্যে কিছু কথা

এই পৃথিবীতে মানুষ চির সংগ্রামী। সৃষ্টির প্রথম থেকেই প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে চিরদিন সংগ্রাম করে মানুষকে সামনে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। আর এই চলার পথে মানুষের সামনে থাকে অনেক বাঁধা বিপত্তি। চারদিকে হিংসার উন্মত্ততা, ষড়যন্ত্র, আক্রোশ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। আর এসবের পরিপ্রেÿিতে মানসিক চাপের শিকার হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। হতাশাগ্রস্থ হওয়াটাও বিচিত্র কিছু নয়। আমরা অনেকেই হয়ত জানি না যে, শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ রোগ হয় মানসিক কারনে আর বাকী শতকরা ৫-১০ ভাগ রোগ হয় জীবাণুঘটিত যেকোন কারনে। অথচ এই মানসিক চাপ, হতাশা গ্রস্থতা, মানসিক অবসাদ এই বিষয়গুলোকে আমরা গুiæত্বই দিতে চাই না। উপরন্থ এই বিষয়গুলোকে আমরা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার বিবেচনা করতে বসি। তাই পাঠকের উদ্দেশ্য আমি এই বিষয়ে দুটি কথা বলতে চাই।

১। আমরা মানসিক চাপের শিকার হব বিভিন্ন কারনে এটা ১০০ ভাগ সত্যি কথা। আমাদের উচিত এই বিষয়টিকে গুiæত্ব দেয়া। যতটা সম্ভব মানসিক চাপের কারন গুলোকে দূরীভূত করতে সচেষ্ট হওয়া। ইতবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে চেষ্টা করা।

২। প্রয়োজন মনে করলে কোন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে মত বিনিময় করাটা একান্থ জাiæরী। তাদের নিকট সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে মত বিনিময় করাটা একান্থ জাiæরী। তাদের নিকট থেকে সঠিক দিক-নির্দেশনা নিয়ে সেই মাফিক চলাটাও বিশেষ প্রয়োজন।

সর্বোপরি এ বিষয়ে বলতে চাই সংসার একটি সমরাঙ্গন সেই সঙ্গে এটি বিপদ সংকুল, সমস্যায় ভরাক্রান্থ। কাজেই এখানে মানসিক চাপ, হতাশাগ্রস্থতা আসবেই। এর মাঝেই এগুলোকে জয় করে এগিয়ে যাওয়ার মাঝেই নিহিত রয়েছে জীবনের সফলতার মর্মকথা।

প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয় চলে আসে তা হচ্ছে জ্যোতিষশাস্ত্র। এটি সম্পর্কে ভুল ধারনাটাই ভীষণ ভাবে প্রচলিত। কারন জ্যোতিষশাস্ত্রের ভাল দিক আছে, মানুষের অনেক উপকারে আসে এসব কথা বললেই মানুষ ভাবে যে, ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে এমনটা ভাবাই মানে হচ্ছে জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস। কিংবা মানুষজন ভাবে যে মানুষের মাঝে যে শক্তি আছে, প্রতিভা আছে এসব বিষয়বস্তুকে উপেÿা করে সম্পূর্ণভাবে ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল হওয়াটাই হচ্ছে জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস। কিন্তু এগুলো সম্পূর্ণ ভূল ধারনা।

প্রকৃতপÿে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী আমরা যা জানতে পারি আর তা হচ্ছে মানুষের উপর কোন কোন গ্রহ-নÿত্রের ভাল প্রভাব রয়েছে কিংবা খারাপ প্রভার রয়েছে। যদি ভাল প্রভাব থেকে থাকে তাহলে সেই অনুযায়ী রত্নপাথরের ব্যবহার কিংবা অন্য কোনও দিক-নির্দেশনা মানুষের জীবনকে করতে পারে আরও সফল এবং উন্নত। আবার যদি গ্রহ-নÿত্রের খারাপ প্রভাব থাকে তাহলে সঠিক রত্নপাথর নির্ধারন করে সেটা পরিধান করলে সেই খারাপ প্রভাব থেকে রÿা পাওয়া যেতে পারে। তবে এ ব্যাপারে অবশ্যই যিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ তার পরামর্শ নিতে হবে। আমি পাঠককে বলতে চাই আপনাদের জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু বলার থাকলে, কিছু জানার ইচ্ছে হলে অবশ্যই আমার কাছে আসবেন। আমার সাথে কথা বলবেন। আশা করি আমি আপনাদের জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে অমূলক বিভ্রান্থি দূর করতে সাহায্য করতে পারব।

আর যে বিষয়টির কথা না উjøখ করলেই নয়, আর তা হচ্ছে মেডিটেশন। একমাত্র মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমেই আমরা আমাদের আত্মাকে দেহ থেকে পৃথক ভাবতে শিখি। আমরা আমাদের মন, আত্মা এগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি একমাত্র মেডিটেশনের মাধ্যমেই। মেডিটেশন চর্চার ক্রমশ আমাদের সচেতনতার বিস্থৃতি প্রসারিত হতে থাকে। আমাদের অন্থরে শান্থি, ভালবাসা এসব অনুভব করতে থাকি। আমরা অন্থরে আjøাহ্, ভগবা, ঈশ্বর কে অনুভব করার তাগিদ অনুভব করি। আর যদি অন্থরে এরূপ অনুভূতি বিরাজমান থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমরা একে অন্যের প্রতি ভালবাস অনুভব করতে পারব। আমরা আমাদের পরিবার, সমাজ, জাতি, দেশ সকল কিছুর প্রতি সচেতন হয়ে উঠতে পারব। আর এ ধরনের অনুভূতি তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন একজন মানুষ মেডিটেশন চর্চা করে।

মানুষ মাত্রেই তার বিভিন্ন মানসিক সমস্যা থাকবে এবং সেই সঙ্গে থাকবে শারীরিক সমস্যা। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, ভয়, একাকীত্ব, হতাশা ইত্যাদি থাকবেই। মেডিটেশনের সাহায্যে ওষুধ, অ্যালকোহল কিংবা তাবিজ, কবজ এসব বাদ দিয়ে সব সমস্যার সমাধান চিরস্থায়ী ভাবেই করা সম্ভব।

আর এই বিসয়টিকে মাথায় রেখে আমি দীর্ঘ ১৫-১৬ বৎসর গবেষনা করে উদ্ভবন করেছি মেডিটেশনের জন্য লাইফ শাইনিং মেথড।

লাইফ শাইনিং মেথডের সাহায্যে মেডিটেশন চর্চা করলে হয়ত আমাদের জীবন থেকে যাদুর মত, ভোজবাজীর মত সব ধরনের দুঃখ-দুর্দশা, রোগ-শোক, অসুস্থতা, সব ধরনের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না। কিন্তু আমাদের জীবন একটি সঠিক দিক-নির্দেশনা মোতাবেক অগ্রসর হতে থাকবে। সব ধরনের দুঃখ দুর্দশা, রোগ-শোক, অসুস্থতা, সমস্যা বেশীর ভাগ ÿেত্রে নিরাময় হয়ে জীবন একটা সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করা সম্ভব হবে এবং এর মাধ্যমে আমরাও জীবনের অর্থ খুজে পেতে সÿম হব। নিরাময়ের জন্য লাইফ শাইনিং মেথডের সাহায্যে মেডিটেশন চর্চার সাথে সাথে নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী নিয়মিত প্রার্থনা আমাদের জীবনকে করতে পারে সুন্দর এবং নিয়মতান্ত্রিক।

কিভাবে সফল হবেন বই এর লেখা নিচ থেকে

লেখকের কথা

এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষের অবস্থান যেমনই হোক অর্থাৎ ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ইত্যাদি যে কোন অবস্থানেই মানুষ থাকুক না কেন সবার মনের সুপ্ত ইচ্ছাই হলো জীবনে সফল হওয়া। তবে সফল হওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া যত না সহজ তার চেয়েও কঠিন এই ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ রূপ দেয়ার। কারণ, জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। জীবনে চলার পথে আমাদের শত বাধা-বিপত্তি সামনে এসে দাঁড়ায়। অবাঞ্ছিত দুঃখ, কষ্ট, বেদনা আমাদেরকে তাড়া করে থাকে। অথচ এরই মাঝে আমাদের সংগ্রাম করতে হয়, সফল হতে হয়। আমি দীর্ঘ ১৫-১৬ বৎসর অসংখ্য মানুষকে কাছে থেকে দেখেছি। তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করেছি। সমস্যার কারণ নির্ণয় এবং সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের চেষ্টা করেছি। এই দীর্ঘ ১৫-১৬ বছর সময়ে আমি যেমন বহু সফল মানুষ দেখেছি, তেমনি বহু বিফল মানুষও দেখেছি। আর এই বহু দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি গবেষণা করেছি মানুষকে সফল হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ সঠিক দিক নির্দেশনা কিভাবে দেয়া যায় সেই বিষয়ে। আমি চেষ্টা করেছি, কেন একজন মানুষের জীবনে সফলতা পশ্চাদপদ হয় সেই কারণগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে। এছাড়া কিভাবে একজন মানুষ নিজেকে ভেঙ্গে গড়ে তুলতে পারে, কিভাবে একজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলানো যায়, সর্বোপরি কিভাবে একজন মানুষের জীবনে সাফল্যের গতিকে ত্বরান্বিত করা যায় এই বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করার জন্য আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

আমি আশা করব, পাঠক সঠিক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমার বইটি পড়বেন এবং প্রয়োজনে ইতিবাচক সমালোচনা করবেন। আপনি লাভবানই হবেন, সফলই হবেন। পরিশেষে আমি আপনাদের জীবনে সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

গুiæজী
জীবন চৌধুরী গোল্ড মেডেলিষ্ট)
সাধক-জ্যোতিষী, উদ্ভাবক ও প্রশিÿক
LIFE SHINING METHOD
Method of Enhancement of mind power
সাইকি ভবন
১৬৯/১, কণকর্ড গ্রান্ড (৩য় তলা)
কÿ নং-২১০, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩১৬৪৩৯, ৮৩১৭৫৮৭
ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩১৬৪৩৯

॥ ভূমিকা ॥

পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই জীবনে সফল হতে চায়। তার অবস্থান যেমনই হোক, শিÿাগত যোগ্যতা, অর্থিক সঙ্গতি,পারিপার্শ্বিকতা যেমনই হোক মানুষ চায় সফলতার স্বাদকে আস্বাদন করতে। কিন্তু বেশীর ভাগ ÿেত্রেই দেখা যায় চাওয়ার সাথে পাওয়ার সামঞ্জস্য না থাকায় সফলতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। না পাওয়ার বেদনা কিংবা পেয়েও হারানোর কষ্ট মানুষকে ঘিরে রেখেছে সারাÿণ। আমাদের চারপাশে আমরা বহু মেধাবী মানুষদের দেখতে পাব যারা শুধুমাত্র সঠিক পরিকল্পনার অভাবে মেধাকে কাজে লাগাতে পারেননি, জীবনে সফল হতে পারেননি। আবার শুধুমাত্র নেতবিাচক চিন্তার কারণেরও অনেকে জীবনে সাফল্য লাভ করাতো দূরের কথা, ধ্বংসের চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা পৌঁছে গেছেন। মানবজীবন গতিময়। জীবনে চলার পথে মানুষকে অনেক অনাকাশিÿত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতেই হয়। জীবনের একদিকে যেমন সফরতা রয়েছে অন্যদিকে তেমনি বিফলতাও রয়েছে। অনেক সময় প্রয়োজনের তাদিতে পারিপার্শ্বিকতার পরিপ্রেÿিতে বিফলতাকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে হয়। এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষের আয়ুস্কাল খুবই সামান্য। মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর মাঝেও সফলতার চাবিকাঠি নিহিত। কারণ জন্ম ও মৃত্যুর শাসনে মানব জীবন সদা সর্বদাই সঙ্কুচিত। আর এটাই জীবনের চরম ট্র্যাজেডি।

কবি সুইনবার্গ বলেছেন-

"Life is a vision or a watch between a sleep and a sleep."

অর্থাৎ জীবনের এপাড়ে ওপাড়ে দুই প্রান্তেই ঘুম এবং অন্ধকার। মাঝখানে একটু সময়ের জন্য চেয়ে থাকা আর এই চেয়ে থাকার সময় টুকুই জীবন।

আর এই অল্প সময়ের জীবনে সফলতাকে অহবান করতে যেয়ে কখনই আমরা জীবনকে বিষময় করে তুলতে চাই না। বরং আমাদের যার যতটুকুই আছে ততটুকু নিয়ে জীবনের প্রতিমুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে নেতিবাচক চিন্তাকে পরিহার করে, অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আমরা জীবনে সফল হতে চেষ্টা করব।

আমার দীর্ঘ ১৫ বৎসরের গবেষণার আলোকে বলতে পারি সফলতা কখনও একদিনের চেষ্টায় আসে না। বরং তার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী ধৈর্য, সাহস, পরিশ্রম এবং বিশ্বাস। এই বইটিতে আমি তারই ছাপ রাখতে চেষ্টা করেছি। আশা করি পাঠক উপকৃত হবেন, লাভবান হবেন, সফল হবেন।

সফলতা কি?

সফলতা বলতে আমরা কি বুঝি? সফলতা কি শুধু একজনের জীবনে ধনী, প্রচুর টাকা পয়সা, অর্থ বিত্ত সম্পদ অর্জনকেই বুঝায়? নাকি একজন মানুষ জ্ঞানে, প্রজ্ঞায় অনেক উন্নত হয়ে গেলে তখন তাকে আমরা সফল বলবো। আমেরিকান কালচারে সফলতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় টাকা-পয়সা, স্ট্যাটাস, ÿমতা ইত্যাদির বিবেচনায়। আর এই সংজ্ঞার সাথে খুব একটা ভিন্নমত পোষণ করার কিছু নেই। কিন্তু আমি বলতে চাই সফলতার সংজ্ঞা মানুষে মানুষে ভিন্ন হয়ে যায়, অবস্থান ভেদে ভিন্ন হয়ে যায়। প্রকৃতপÿে সফলতা কোনও শর্ত নয়। জীবনে কোনও একটি বিষয়ে কোনও অর্জন সম্পন্ন হলেই সেটা সফলতা নয়। সফলতা বলতে আমরা সেটাই বুঝি মানুষ যখন কোনও সুস্থ, সুন্দর উদ্দেশ্যের দিকে সৎ পরিশ্রমের দ্বারা একটু একটু করে ধাবিত হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে যখন সম্পন্ন হয় সেই অবস্থাকে। সেই সাথে আরও বলা যায়, সেই উদ্দেশ্য যখন সঠিক সময়ে, সঠিক উপায়ে এবং সঠিক চর্চার মাধ্যমে একজনের জীবনে আসে এই বিষয়টিও সফলতার সাথে সম্পৃক্ত। সফলতার জন্য যে চেষ্টা, পরিশ্রম এগুলোও সফলতার সাথে জড়িত।

তবে যে বিষয়টি গুiæত্বপূর্ণ আর তা হচ্ছে, সফলতার বিষয়টিতে মানুষে মানুষে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলÿিত হয়। যেমন- একজন দরিদ্র মানুষ যার নুন আনতে পান্ত্মা ফুরোয় অবস্থা তার জীবনের সফলতর সংজ্ঞার সাথে নিশ্চই একজন মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্ত মানুষের সফলতার সংজ্ঞা কখনই মিলবে না। একজন দরিদ্র মানুষ চাইবে যদি তার বেঁচে থাকার সংস্থানটা আরও সুদৃঢ় হোত তাহলে কতই না ভাল হোত। একজন মধ্যবিত্ত মানুষ চাইবে তার অর্থের যোগান যদি আরও বৃদ্ধি করা যেত তাহলে হয়ত তার জীবনটা সফল হোত। একজন উচ্চবিত্ত মানুষ চাইবে তার সম্পদ যদি আরও বৃদ্ধি হতো তাহলে তার জীবনটা আরও সফল হয়ে উঠতো। একজন শিÿার্থীর জীবনে সফলতা তখনই পরিপূর্ণতা পায় যখন সে লেখাপড়ায় খুব ভাল রেজাল্ট করে। কর্মজীবনে একজন তখনই সফল যখন সে নিজস্ব কর্মÿেত্রে উত্তরোত্তর উন্নতি করতে থাকে, যোগ্যতা গুণে নিজের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায় তখন। দাম্পত্য জীবনে একজন স্বামী এবং একজন স্ত্রী তখনই সফল যখন দু'জন দু'জনের কাছে খুব ভালভাবে গ্রহণযোগ্য হয় এবং দু'জনের মধ্যে চমৎকার বোঝাপড়া থাকে। সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি সফলতার ধরণ মানুষে মানুষে ভিন্ন রকম।

তবে একজন মানুষকে আমরা পরিপূর্ণভাবে সফল বলতে পারব যখন তার শৈশব থেকে শুiæ করে জীবনের শেষসীমা পর্যন্ত্ম আত্মসংযম বিদ্যমান থাকে। অত্যন্ত্ম সৎ, নিষ্ঠার সঙ্গে পরিশ্রম করে জীবনের প্রতিটি ধাপে, প্রতিটি ÿেত্রে জীবনের উদ্দেশ্যগুলোর পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে তখন তাকে আমরা সফল বলতে পারি। সেই সঙ্গে সফল তিনিই যিনি পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঠিক ভাবে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন। দেশের জন্য, সমাজের জন্য, মানুষের জন্য কিছু করার মাঝেও রয়েছে সফল হওয়ার বিষয়টি।

এছাড়া একজন মানুষকে সফল তখনই বলা যায় যখন সে জীবনের সব সমস্যা, সংকট, জটিলতাকে দৃঢ়তার সঙ্গে, সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন। কারণ মানুষ মাত্রেই জীবনে তাকে বহুধরণের জটিলতা, সংকট, ভীষণভাবে গুiæত্বপূর্ণ। কারণ একজন মানুষকে সফল হতে গেলে তার অভীষ্ট লÿ্যে পৌঁছানো যেমন- জাiæরী তেমনি জীবনে চলার পথে সামনে আসা সমস্যা, জটিলতা, সংকট সমূহকে অতিক্রম করা আরও জাiæরী।

সুতরাং পাঠক সফলতার কোনও একক সংজ্ঞা নেই। আসুন সফলতাকে নিজের জীবনে অনুধাবন করি, উপভোগ করি।

তবে মানবজীবনে সফলতা বিভিন্ন কারণে বাধাগ্রস্ত্ম হয়। পশ্চাদপদ হয় আসুন সে বিষয়ে আলোকপাত করা যাক।

সাফল্য লাভের ў্যেত্রে পশ্চাদ পদতার কারণ সমূহ-

পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষেরই মেধা রয়েছে। কিন্তু মেধার বিকাশ ঘটিয়ে সাফল্য লাভ করাই হচ্ছে জীবনের আরাধনা। সাধারণতঃ সাফল্য লাভের ў্যেত্রে পশ্চাদপদতার জন্য বিভিন্ন কারণকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। যেমন-

১। সময়নুবর্তীতার অভাব।
২। অধ্যবসায়ের অভাব।
৩। পরিকল্পনা ছাড়া কাজ করা।
৪। অহেতুক ভয় ভীতি।
৫। কর্তব্য নিষ্ঠার অভাব।
৬। মানসিক চাপের প্রভাব।
৭। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অভাব।
৮। নিয়মানুবর্তীতার অভাব।
৯। নেতিবাচক চিন্ত্মার প্রভাব।
১০। লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা।

উপরোক্ত কারণ গুলোর দিকে আমরা এভাবে আলোকপাত করতে পারি। যেমন-

১। সময়ানুবর্তীতার অভাব ঃ

একজন মানুষের হয়তো মেধা আছে অনেক। মেধাকে বিকাশ ঘটানোর জন্য সঠিক গাইডেন্স, অর্থ-বিত্ত সবই আছে তার; কিন্তু তার মাঝে সময়ানুবর্তীতা একেবারেই নেই। তাহলে তার জীবনে সাফল্য লাভ করাতো দূরের কথা। তার অস্থিত্ব রў্যাই কঠিন হয়ে যাবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই মূলবান। প্রতিটি সেকেন্ডে, প্রতিটি মিনিট সব কিছুই মূল্যবান। আর এই বিষয়টিকে গুiæত্ব দিয়ে মহামনীষী Tolstoy বলেছেন-
"Now is the most important." প্রকৃতপў্যে সময়ের মূল্য অনুধাবনেই জীবনের প্রকৃত অন্ত্মর্নিহিত তাৎপর্য বিদ্যমান। সময়ের মূল্য বিষয়টিকে আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। বছরে শেষে একজন ছাত্র বা ছাত্রী যখন পরীў্যায় ফেল করে তখন তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় সময়ের মূল্য কত? তখন সে নিশ্চই বুঝবে যে তার পুরো বছরটিই বিফলে গেছে। তেমনিভাবে একজন দিনমজুর যদি একটি দিন একভোরে কাজ ছাড়া পাড় করে তারপর যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় একটি দিনের মূল্য কত। তাহলে সে বলবে একটি দিনের মূল্য অনেক। কারণ দিনমজুরী করেই তার পেট চলে। আবার এক মিনিটের কারণে যদি কেউ ট্রেন মিস্ করে তাহলে তার কাছে সেই এক মিনিটের মূল্যই অনেক। আবার এক সেকেন্ডের কারণে কোনও একটি দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যাওয়া কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় এক সেকেন্ডের মূল্য কত? তাহলে সে বলবে এক সেকেন্ডের মূল্য তার জীবন। কাজেই জীবনের প্রতিটি মুহূতই অসম্ভব মূল্যবান। তবে হ্যাঁ জীবনে সময়কে কে কি ভাবে কাজে লাগাবেন সেটা সর্ম্পূই তার ব্যাপার। একজন রাজনীতিবীদ যেভাবে সময়কে কাজে লাগাবেন একজন লেখক নিশ্চয়ই সেভাবে সময়কে কাজে লাগাবেন না। আবার একজন ছাত্র যেভাবে সময়কে কাজে লাগাবেন একজন সঙ্গীত শিল্পী নিশ্চয়ই সেভাবে সময়কে কাজে লাগাবেন না। সঠিকভাবে সময়কে কাজে না লাগিয়ে যদি আমরা পরবর্তীতে সারাজীবন অনুতাপ করি তাহলে কোনও লাভ হবে না। কবির ভাষায় বলতে পারি-

" রাত্রে যদি সূর্য শোকে ঝরে অkÖæধারা
সূর্য কভু নাহি ফেরে ব্যর্থ হয় তারা।"

ছাত্র জীবনে অর্থাৎ অল্প বয়সে সময়ের মূল্য বোঝা একান্ত্ম জাiæরী। কারণ তারাই দেশের ভবিষ্যৎ। ইতিহাসের একটি বিখ্যাত ঘটনার কথা আমরা পর্যালোচনা করতে পারি। বিশ্বখ্যাত ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন ওয়াটারলুর যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণ করেছিলেন। এটিই তার জীবনের একমাত্র পরাজয়। এর কারণ নেপোলিয়নের একজন সেনাপতি সঠিক সময়ে সৈন্যসহ যুদ্ধ ÿেত্রে উপস্থিত হতে পারেননি। অথচ উক্ত সেনাপতি মাত্র কয়েক মিনিট দেরী করেছিলেন। আর এই কয়েক মিনিটের জন্যই নেপোলিয়নকে পরাজয়ের Mølনি ভোগ করতে হয়। অথচ সেই সেনাপতি বিলম্ব না করতো তাহলে হয়তো ইউরোপ তথা বিশ্বের ইতিহাস বদলে যেত। সুতরাং সময়ানুবর্তীতা একান্ত্ম জাiæরী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সর্বস্বান্ত্ম হয়ে জাপান সময়কে কাজে লাগিয়ে এখন এশিয়ার অহংকার।

দÿিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া আজ উন্নত। কারণ তারা সময়কে কাজে লাগিয়েছে। পৃথিবীতে প্রাতঃ স্মরণীয় ব্যক্তিগণও সময়কে কাজে লগিয়েছেন যেমন- গণতন্ত্রের প্রবক্তা আব্রাহাম লিংকন। তিনি সামান্য শ্রমিক থেকে হয়েছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। এছাড়া বৈজ্ঞানিক নিউটন, আইনস্টাইন, এডিসন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজiæল ইসলাম এরকম আরো অনেকে।

অথচ এখনও আমরা কত পিছিয়ে। সময়কে শুধু শুধু অপচয় করছি। সফল না হয়ে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করছি। তাই পাঠক আর নয়, আমরা সময়ানুবর্তী হবো এই প্রতিজ্ঞা করি এখন থেকে এই মুহূর্ত থেকে। সময়কে সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে চেষ্টা করি, সাফল্য অবশ্যই আমাদের হাতে ধরা দেবে।

২। অধ্যবসায়ের অভাব ঃ

একটি বিদেশী প্রবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে, সমস্ত্ম সাফল্যের মূলে মেধা থাকে ঠিক যতখানি ঠিক ততখানি থাকে অধ্যবসায়। মানবজীবনে যেসব গুন সফলতার চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে তাদের মধ্যে অধ্যবসায়ের গুiæত্ব সর্বাধিক। একজন মানুষের শুধু প্রতিভা থাকলেই হয় না, সেই প্রতিভা বিকাশের জন্য জীবনকে বিকাশের পথে পরিচালিত করতে হয়। আর সেখানে অধ্যবসায়ের মতো মহৎ এবং বৃহৎ বৈশিষ্ট্য যদি আরোপিত হয় তাহলে জীবন হয়ে ওঠে সুন্দর এবং সফল। তদের জীবনে প্রথমতঃ ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়ী হতে হয়। কারণ ছাত্র জীবনেই মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়। কবি বলেছেন-

"If you find your task is hard,
try, try again."

ছাত্রজীবনের পরে মানুষের কর্ম জীবনের সুত্রপাত হয়। তখন জীবনে সফল হওয়ার জন্য অধ্যবসায়ের আরও বেশী প্রয়োজন হয়। কারণ তখন জীবনে নানাবিধ সমস্যা এবং ঘটনাবলীর অবির্ভাব ঘটে। সবকিছুকে জয় করে জীবনে সফল হওয়ার জন্য অধ্যবসায়ের আরও বেশী প্রয়োজন হয়।

এছাড়া পরনির্ভরশীল হওয়ারা মন মানসিকতাও বির্সজন দিতে হবে। জীবনে সংগ্রাম করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, অধ্যবসায়ী হতে হবে।

কবির ভাষায় বলা যায়-

“পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভাল ছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভাল মন্দ সাথে।”

জীবনের এমন কোনও ÿেতে নেই যেখানে অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করা যায় না। প্রথম একবারের চেষ্টাতেই যে কাজ শেষ করে ফেলা যায় নিঃসন্দেহে সে কাজ সহজ কাজ। কিন্তু মানুষের জীবনের সফলতা নির্ভর করে কঠিন কাজের সফলতার মধ্যে। আর নিঃসন্দেহে জটিল কাজে সফলতার জন্য প্রয়োজন অধ্যবসায়।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনের একটি ঘটনার কথা আমরা উ¡jøখ করতে পারি। তিনি দীর্ঘ বারো বছর কঠিন অধ্যবসায়ের ফলে যে গবেষণা কাজ করেছিলেন, তা তার একটি পোষা কুকুরের কারণে মোমবাতির আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে নিউটন মোটেও দমে যান নি হতাশ হন নি। তিনি তারপর পুনরায় অধ্যবসায় শুiæ করলেন। বছরের পর বছর পরিশ্রম করে তিনি তা আবার ফিরে পেয়েছিলেন। আর তার সেই অধ্যবসায়ের কারণে আমরা তার গবেষণালব্ধ ফলাফল নিয়ে আমরা তথা বিজ্ঞান অনেক খানি এগিয়ে গেছে। সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলতেন,

"Impossible is a word,
which is only found in the dictionary of fools."

সামান্য সৈন্য থেকে নেপোলিয়ন বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে ছিলেন অধ্যবসায়ের গুণেই। বিশ্বের কত জ্ঞানী, মনীষী, আবিষ্কারক, বীর, সমাজ সংস্কারক, রাষ্ট্র নায়ক, শিল্পী, সাহিত্যিক, ধর্ম প্রবর্তক সবাই অধ্যবসায় গুণে নিজ নিজ ÿেত্রে সফল হয়েছেন। আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন যারা একবার একটি কাজে ব্যর্থ হওয়ার পর পুনরায় সেই কাজটি আর করতে সচেষ্ট হন না। কিন্তু সফলতা না আসা পর্যন্ত অধ্যবসায় চালিয়ে যেতেই হবে। আর সেজন্যেই হয়তো ডঃ মুহম্মদ শহীদু¦jøাহ্ লিখেছিলেন-

“কোন কাজ ধরে যে উত্তম সেই জন,
হউক সহস্র বিঘ্ন ছাড়ে না কখন।”

পাঠক, বর্তমান যুগ মুক্ত অর্থনীতির যুগ, বিজ্ঞানের যগ, তথ্য প্রযুক্তির যুগ, প্রগতির যুগ, বাস্তবতার যুগ সর্বোপরি প্রতিযোগিতার যুগ।

এই যুগে সবাই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, স্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। সুতরাং পাঠক আমরাও পিছিয়ে থাকব না। আমরা অধ্যবসায়ী হব এবং জীবনে সফল হব। কারণ অধ্যবসায়ের মাধ্যমে যে সফলতা পাওয়া যায় তা যেমন আনন্দের তেমন পরম উপভোগের।

৩। পরিকল্পনা ছাড়া কাজ করা ঃ

একজন মানুষের জীবনে সফলতা তখনই পরিপূর্ণতা পায়, জীবন সৌন্দর্য মন্ডিত হয় তখনই যখন তার প্রত্যেকটি কাজের পেছনে থাকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। সেই সঙ্গে থাকে চিন্তাশীলতা। এই পৃথিবী সৃষ্টির শুiæতেই ছিল পরিকল্পনা স্বয়ং বিধাতার কাছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নÿত্র থেকে শুiæ করে প্রাণী জগতের ÿুদ্র কীট পর্যন্ত তার সেই পরিকল্পনার অধীন। সৃষ্টির শুiæ থেকে এখন পর্যন্ত সকল কিছুই চলছে পরিকল্পনামাফিক। তাই কোনও কিছুর পেছনে পরিকল্পনা না থাকলে ব্যক্তি জীবন ÿতিগ্রস্ত হয়, সামাজিক জীবনে নেমে আসে বিশৃঙ্খলা, রাষ্ট্রীয় জীবন হয় অনগ্রসর। তাই বলা যায়, মানব জীবনে সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি তথা সফলতার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনামাফিক কাজ করা। উদাহরণস্বরূপ, বলা যায় একজন শিÿার্থীর অবশ্যই একটি পরিকল্পনা থাকতে হবে যে সে পরীÿায় ভাল রেজাল্ট করবে, জীবনে সে কিছু হতে চায় ইত্যাদি। তেমনিভাবে একজন ব্যবসায়ীর পূর্ব পরিকল্পনা থাকতে হবে যে সে ব্যবসায়ে লাভবান হবে, সফল হবে। তার ব্যাবাসায়িক কাজকর্মও সেইভাবেই পরিচালিত হতে হবে। একজন সফল গৃহিনী হতে গেলেও সঠিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। ঘর-সংসারের সব কাজ কর্ম সুনিপুন ভাবে সুসম্পন্ন করা, রান্না-বান্না করা, পরিবার-পরিজনদের সবার সেবা করা সবকিছুতেই প্রয়োজন পরিকল্পনা যদি কেউ একজন হতে চায় সফল গৃহিনী। প্রত্যেকের কাজের ÿেত্রে হতে পারে আলাদা। কিন্তু সব কাজের শুiæটা একই রকম অর্থাৎ পূর্বপরিকল্পনা প্রণয়ন।

সমকালীন বিশ্বের অস্থির পরিস্থিতির জন্য আজকে আমরা যথেষ্ট বিচ্যুত সুস্থ, সুন্দর, সফল জীবন থেকে। আমাদের জীবন আজ জটিল থেকে জঠিলতার। কিন্তু আমরা যদি পরিকল্পনামাফিক প্রত্যেকটি কাজ করতে শুiæ করি তাহলে অবশ্যই আমরা জীবনে সফলকাম হতে পারব। জীবনকে সফল করার জন্য, সুন্দর করার জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করাটা হচ্ছে একটি সাধনা। পাঠক আসুন এই মুহূর্ত থেকে আমাদের সেই সাধনা শুiæ হোক।

৪। অহেতুক ভয় ভীতি ঃ

অহেতুক ভয়-ভীতি মানুষের সফলতাকে অনেক খানি বিপযস্ত্ম করে। একজন মানুষের সামনে থাকে অফুরন্ত্ম সম্ভবনা এবং সেই সঙ্গে একজন মানুষের মাঝে নিহিত থাকে সীমাহীন শক্তি। কিন্তু একটি বিশেষ কারণে মানুষের সাফল্যের সকল সম্ভবনা ধূলায় লণ্ঠিত হয়। মানুষের জীবন বিফলতার পর্যবসিত হয়। আর সেই বিশেষ কারণটি হচ্ছে ভয়। এই পৃথিবীতে যত সাফল্য গাঁথা চরিত হয়েছে তার মূলে কিন্তু ভয়কে জয় করার কাহিনীই রয়েছে। মানুষ চাঁদকে জয় করেছ। কিন্তু যদি মানুষ ভয় পেত তাহলে কিন্তু আজও চাঁদ রয়ে যেত মানুষের ধরা ছোয়র বাইরে। এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করার ÿেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। জীবনের ঝুঁকি, মৃত্যুভয়, অজানা বিপদের ভয় সব কিছুকে উপেÿা করে মানুষ এভারেস্ট শৃঙ্গকে জয় করেছে। পৃথিবী বিখ্যাত ব্যক্তিগণ যেমন- মহাত্মা গান্ধী, মার্টিন লুথার কিং, আব্রাহাম লিংকন এরা সবাই ভয়কে জয় করেছেন। তারা যদি ভয়কে গুiæত্ব দিতেন তাহলে নিশ্চয়ই ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম এভাবে লিখিত হোত না। কলম্বাস আমেরিকা আবিস্কার করেছিলেন সব ধরণের ভয়কে উপেÿা করেই। যাদের মনে ভয় বাসা বাঁধে তারা কখনই সাফল্যের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না। জীবনে কখনই তাদের পÿে বিজয় পতাকা উত্তোলন করা সম্ভব হয় না। যাদের হৃদয় দুর্বল যারা পরমুখাপেÿী, যাদের কোনও আত্মশক্তি নেই ভয় তাদেরকে অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। এক সময় পৃথিবী তাদের প্রতি বিমুখ হয়। তারা নির্জীব এবং মানুষ নামের অযোগ্য। অপরদিকে দুর্বার সাহসী মানুষ সকল ভয়-ভীতিকে উপেÿা করে সামনে অগ্রসর হয় এবং পরিনামে সফলতা তাদের হাতের নাগালে চলে আসে। একথা সত্যি যে, জীবনে চলার পথে আমরা ভয় পাব। খুব স্বাভাবিক যে আমরা বিভিন্ন কারণে ভীত হবো। কিন্তু আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সেই ভয়কে জয় করার মাঝেই রয়েছে জীবনের সার্থকতা। আর সাফল্যের উৎস সেখানেই। সাহসী মানুষ জানে যে, জীবনে ভয়কে যদি প্রাধান্য দান করা হয় তাহলে মানুষের সকল গুনের, সকল মর্যাদার অবসান ঘটে এবং জীবন অর্থহীন প্রামাণিত হয়। তাতে নেই কোনও পৌiæষত্ব, নেই কোনও মনুষ্যত্ব। তাই ভীiæতা, কাপুiæষতা, জড়তা পরিহার করে আত্মশক্তিতে বলীয়ন হয়ে সংসার জীবনের সকল বাঁধা-বিপত্তি মোকাবিলা করে জীবনে সাফল্য আনতে হবে। আমাদের উপলব্ধিতে আনতে হবে যে, সংসার একটি সমরাঙ্গন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই কবিগুiæর ভাষায় আমরা বলতে চাই-

“বিপদে মোরে রÿা করো এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।”

পরিশেষে আমি পাঠককে বলতে চাই, আসুন, জীবনের সকল ভয়কে তুচ্ছ করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেষ্টা করি এবং সেই সঙ্গে জীবনে সাফল্যের পথকে করি নির্বিঘ্ন।

তবে একটি গুiæত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে কিছু কিছু ইতবাচক ভয় যেমন-আগুন, পানির ভয়। রাস্ত্মায় বেপরোয়া গাড়ী চালালে অ্যাকসিডেনেটর ভয় এসব একজন মানুষের প্রয়োজন।

৫। কর্তব্য নিষ্ঠার অভাব ঃ

জীবনে সাফল্য লাভের ÿেত্রে একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে কর্তব্য নিষ্ঠার অভাব। মানবজীবনে সাফল্য অর্জনের ÿেত্রে কর্তব্য নিষ্ঠার ভূমিকা বিশেষ গুiæত্বপূর্ণ। একান্ত্ম আন্ত্মরিকতা সহকারে যখন কোনও কাজ সম্পাদন করা হয় তখন তাকে বলে কর্তব্য নিষ্ঠা। কর্তব্য নিষ্ঠার অভাব হলে কিংবা কর্তব্য নিষ্ঠায় অবহেলা দেখা দিলে জীবনে নেমে আসে চরম ÿwতকর পরিণতি। প্রকৃত পÿে কর্তব্য নিষ্ঠা মানব চরিত্রের একটি গুণ।

পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে কোন না কোন কাজের দায়িত্ব থাকে বিধাতা মানুষকে নির্থক সৃষ্টি করেননি। বিশেষ বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়ে বিধাতা মানুষকে এই সংসারে পাঠিয়েছেন। বিধাতা নির্দেশিত কাজে সফল হওয়ার জন্য মানুষকে কর্তব্যনিষ্ঠ হতে হয়। প্রকৃতপÿে জীবনের ভাল-মনদ বৈশিষ্ট্য প্রকাশের স্বরূপই হলো নিজের জীবনের কর্মÿেত্রে। তাই আমরা বলতে পারি মানুষ কাজের দায়িত্ব নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছে। আর যদি কাজেই করতে হবে তাহলে তার প্রতি নিষ্ঠার অভাব থাকা চলবে কেন? মানুষ জীবিকার জন্য পেশা হিসেবে কোন না কোন কাজ অবলম্বন করে। কাজ মানুষকে জীবিকা দেয়, কাজ মানুষের জীবনের বিকাশের সুযোগ এনে দেয়। পৃথিবীতে যে জীবন মানুষ অতিবাহিত করে

সেখানে থাকে বয়স, যোগ্যতার পরিপ্রেÿিতে কাজ করতে হয়। কর্তব্য পালন করেত হয়। একজন মানুষের জীবনের প্রথম দিকের কিছটা সময় এবং শেষ দিকের কিছুটা সময় বাদ দিয়ে মাঝখানের সময়টা কাজের সময়। কাজের এই সময়টুকু যদি একজন মানুষ যথাযর্থ কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে অতিক্রম করতে পারে তাহলেই জীবনে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। ছোট বেলা থেকেই মানুষকে কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়। লেখাপড়ার মাধ্যমে কাজ মনোনিবেশ করতে হয়। এরপর আসে কর্মজীবন। এমন কি অবসর জীবনেও মানুষ কর্মে নিয়োজিত থাকতে পারে। অর্থাৎ একজন মানুষকে প্রায় সারা জীবনই কাজের মধ্যে থাকতে হয়। তো যদি তার সাথে নিষ্ঠা জড়িত হয় তাহলে সফলতা অবশ্যম্ভাবী। এ প্রসঙ্গে আমরা সেন্ট ফ্রান্সিস অফ্ আসিসি-র একটি বক্তব্যের দিকে আলোকপাত করতে পারি। তিনি বলেছেন, "যা প্রয়োজনীয় তা করা শুiæ কর, তারপর যা সম্ভবপর তা করা শুiæ কর। অবশেষে দেখা যাবে যে অসম্ভব কাজও সম্ভব হচ্ছে।"

অর্থাৎ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যেতে পারলে সাফল্য সুনিশ্চিত। তবে একটি বিষয় উöjøখ না করলেই নয় আর তা হচ্ছে-কর্তব্য নিষ্ঠা হতে হলে অনেক সময় মানুষকে শখ, ইচ্ছা, পরিবার এসবকে উপেÿা করতে হয়। অনেক সময় তিক্ততারও মুখোমুখি হতে হয়। এ প্রসঙ্গে আমি একটি গল্প বলতে চাই। একজন বিখ্যাত ডাক্তার যিনি সার্জারিতে অভিজ্ঞ। তিনি অত্যন্ত্ম ব্যস্ত্ম মানুষ। তিনি তার পরিবারকে সময় দিতে পারেন না। এক সময় তার একমাত্র কন্যা সন্ত্মানের বিয়ের দিন উপনীত হলো। বিয়ের অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত। বর আসলো। কন্যাকে বিদায় জানানোর সময়ও এগিয়ে আসতে লাগল। এমন সময় হাসপাতাল থেকে খবর আসলো যে, একজন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত রোগীকে তৎÿণাৎ অপারেশন করতে হবে। যা ঐ ডাক্তার ছাড়া সম্ভব নয়। এখানে জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন। ডাক্তার চলে গেলেন একমাত্র কন্যার বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে অপারেশন থিয়েটারে।

এখন কি আমরা বলব যে, ডাক্তার তার একমাত্র কন্যাকে ভালবাসেন না? কিংবা আমরা কি বলব যে কন্যার প্রতি দায়িত্ব পালনে অভাব? এখানে যে ব্যাপারটি কাজ করেছে আর তা হচ্ছে কর্তব্যনিষ্ঠা। জীবনটা কুমোরের হাতের মাটির মতো। কর্তব্য নিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা এই মাটি দিয়ে সফলতার তাজমহল যেমন গড়তে পরি তেমনি আবার কর্তব্য নিষ্ঠার অভাবে এই মাটি ধুলোয় পরিণত হতে পারে।

এ প্রসেঙ্গে আমি আরও বলতে চাই। কেউ যদি ভাবে যে, কোনও রকম পড়ালেখা শেষ করতে পারলেই একটা চাকুরী। তারপর মাস শেষে বেতন। চাকুরির বয়স শেষ হলেই অবসর ভাতা। এ ধরণের মানসিকতা কখনই অভিপ্রেত নয়। কেননা এ ধরণের মানুষ কখনই কাউকে কিছু দিতে পারে না। তাই পরিশেষে আমি পাঠককে বলতে চাই, অন্যে কি করেছে, অন্যে কি করেনি এসব আমরা এখন থেকে ভূলে যেতে চাই। আমি নিজে কি করেছি এবং কি করব। আমি কতটুকু সফল এসব আত্মসমালোচনা আমাদের বড়ই প্রয়োজন। আর সেজন্য কর্তব্যনিষ্ঠা হোক আমাদের প্রতিমুহূর্তের অঙ্গীকার।

৬। মানসিক চাপের প্রভাব ঃ

জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য আমরা যদি শুধু বিশেষ বিশেষ লÿ্যে পৌঁছানোটাকেই সাফল্য বলে মনে করি তাহলে আমাদের ভুল হবে। কারণ সাফল্য লাভের জন্য সার্বিক মানসিক এবং শারীরিক সর্বধরণের প্রচেষ্টাই সাফল্যের অন্ত্মর্ভূক্ত। আর সেখানে মানসিক চাপের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কারণ সাধারণ মানুষ মনে করে যে হয়তবা অদৃষ্টই মানব জীবনের নিয়তি। তাই যখন কোন কারণে সে মানসিক চাপের শিকার হয় তখন সেটাকেই সে অমোঘ নিয়তি বলে মেনে নেয়। আর এভাবেই সাফল্যের সূর্য অস্ত্মমিত যেতে থাকে একজন মানুষের জীবনে। প্রকৃতপÿে মানসিক চাপকে একটি শারীরিক টার্ম বলে বিবেচনা করা হয়। প্রতিটি মানুষই জীবনের বিভিন্ন সময়ে কষ্ট, দুর্দশা, অবসাদ, না পাওয়ার বেদনা, অসুস্থতা, ÿোভ ইত্যাদি কারণে মানসিক চাপের শিকার হয়। আর এই বিষয়টি অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে সফল তিনিই যিনি মানসিক চাপের বিষয়টি সামাল দিতে পারেন। আমরা সবাই যেহেতু কোন না কোন পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ তো স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার বিভিন্ন সমস্যা আমাদেরকে বিভিন্ন সময়ে মানসিক চাপে ফেলে দিবে। এছাড়া চাওয়ার সাথে পাওয়ার সামঞ্জস্য না থাকার কারণেও আমরা মানসিক চাপের শিকার হতে পারি। এছাড়া শিÿা, ক্যারিয়ার, দরিদ্রতা, সামাজিক টানাপোড়ন, একাকীত্ব, বিভিন্ন ধরণের নেশা গ্রস্থতা, শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদি কারণেরও আমরা মানসিক চাপের শিকার হতে পারি।

কিন্তু এই মানসিক চাপের কারণে থেমে থাকলে চলবে না। বরং মানসিক চাপের কারণকে চিহ্নিত করে সেই কারণগুলোকে প্রথমে দূরীভূত করতে হবে। এরপর যতটা সম্ভব নিজের যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ঠ থাকার চেষ্টা করতে হবে। এতে যেমন, মানসিক শান্তিও আসে তেমনি সফলতার রাস্তাও প্রসারিত হয়। এ প্রসেঙ্গে আমি একটি গল্পের উল্লেখ করতে চাই। একজন লোক যারা সামান্য আয়ের উৎস একটি চাকুরী। তার ছিল একজোড়া জুতা তাও ছেঁড়া এবং তালি দেয়া। কিন্তু তার ছিল খুবই বই পড়ার নেশা এবং লেখালেখির অভ্যাস। সেই সুবাদে তিনি একবার একজন বিখ্যাত লেখকের সেমিনার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলেন। নাম-দামী লোকজনও সেই অনুষ্ঠানে আসবে। কিন্তু সেই ভদ্রলোক তার ছেঁড়া, তালি দেয়া জুতার কথা ভেবে উক্ত অনুষ্ঠানে যাওয়ার চিন্তা বাদ দিলেন। আর এই বিষয়টি তাকে বেশ মানসিক চাপের মধ্যেও ফেলে দিল। কারণ তার মনে প্রাণে ইচ্ছা যে সে লেখকের সেমিনারে যাবে। এই মাঝে পথে তিনি দেখতে পেলেন রাস্তার একজন পঙ্গু লোককে যার একটি পা নেই। ঐ অবস্থাতেই লোকটি রাস্তার ফেরী করছে। মুহূর্তেই লোকটির মানসিক চাপ দূর হয়ে গেল। তিনি বিধাতার কাঝে শুকরিয়া করলেন এবং সেমিনারে গেলেন।

সুতরাং, মানসিক চাপের বিষয়টি থাকবেই। বরং নিজের যা আছে তা নিয়ে চেষ্টা করে গেলে বরং মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকা যায়। সেই সঙ্গে জীবনে সফল হওয়াও সম্ভব হয়। মানসিক চাপকে অনেকে অমোঘ নিয়তি বলে মনে করে। কিন্তু এতে শুধু বিফলতার রাস্তাই প্রসারিত হয়। এ প্রসঙ্গে কবির ভাষায় বলতে চাই-

“অদৃষ্টেরে শধালাম চিরদিন পিছে
অশোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে?
সে কহিল, ফিরে দেখ। দেখিলাম আমি,
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।”

সুতরাং আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে মানসিক চাপকে জয় করার মাঝেই আছে সাফল্যের মর্মকথা। আসুন, পাঠক মানসিক চাপের হাতে নিজেদেরকে সমর্পিত না করে বরং এই মুহূর্ত থেকে আমরা সংসার সমরাঙ্গনে সাহসী সৈনিকের ভূমিকা পালন করতে সচেষ্ট হবো এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

৭। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অভাব ঃ

ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা মানবজীবনের অন্যতম Principle বা নীতি। প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীতে অবিমিশ্র সুখ-দুঃখ বলে কিছু নেই। সুখ-দুঃখ আসলে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। বিপদ-আপদের মধ্য দিয়েই মানুষের যাত্রা শুরু হয়। তাকে সংগ্রাম করতে হয় নানারকম প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে। রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য, অন্যায়-অত্যাচার, টেনশন এসবের চাপে মানবজীবন পর্যুদস্ত হয়। কিন্তু এসব প্রতিরোধ করার জন্য চাই ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই। কিন্তু যে মানুষ পরাজয়কে মাথা পেতে নিয়ে পরবর্তী বিজয়ের জন্য ধৈর্য সহকারে বৃতী হয় সফল মানুষতো আমরা তাকেই বলব। প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত গুণাবলী মানুষের জীবনকে সফল ও সার্থক করে তোলার সুযোগ এনে দেয় তাদের মধ্যে সহিষ্ণুতা বা ধৈর্যশীলতা বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। শত প্রতিকূল পরিবেশে বিপদ-আপদ অতিক্রমের সুযোগ দান করে সহিষ্ণুতা। এই বিশেষ গুণটির জন্য অন্যায় অত্যাচার মাথা নীচু করে। আর অপর দিকে ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু ব্যক্তি স্বীয় গৌরবে সফলতায় মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। সহিষ্ণুতা জীবন বিকাশের প্রবল বাঁধাকে জয় করতে সাহায্য করে। জীবনকে সুন্দর, সার্থক ও মহৎ করার জন্য সহিষ্ণুতার ব্যাপক অনুশীলন করা দরকার। মহান আল্লাহতায়ালা ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন। সহিষ্ণুতার শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই শুরু করতে হবে। পিতামাতার কাছ থেকে সর্বপ্রথম এই শিক্ষা শুরু হওয়া প্রয়োজন। এরপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিষ্ণুতার প্রতি আলোকপাত করা প্রয়োজন। এছাড়া মনের মাঝে ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে সহিষ্ণুতার অনুশীলন করা প্রয়োজন। সংসার জীবনে সংকটের মুখোমুখি হয়ে মানুষ যদি ধৈর্য হারা না হয়ে সকল কাজে-কর্মে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে পারে তবে জীবনে সাফল্যের শীর্ষে আরোহন করা কঠিন কিছু নয়। সহিষ্ণু হলে জীবনে সাফল্যের শীর্ষে আরোহন করা কঠিন কিছু নয়। সহিষ্ণু হলে জীবনে যে সাফল্য আসে তার প্রভাব চার পাশের জীবনে সহজেই প্রত্যক্ষ

করা যায়। জীবনের কল্যাণের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য সহিষ্ণুতার পথ অনুসরণ করতে হবে। ইতিহাসের পাতায় বহু দৃষ্টান্ত আছে, যে সহিষ্ণুতার পথ অনুসরণ করে সফল হয়েছেন।

সহিষ্ণুতার মাধ্যমে বিশ্বের অনেক বড় কাজ সাধিত হয়েছে। বিশ্বের মহা মানবগণ নিজেদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন সহিষ্ণুতার মাধ্যমে। বিশ্বের যা কিছু আবিস্কার, দুঃসাহসিক অভিযান সবই সহিষ্ণুতার ফল। সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি ÿেত্রে যে সব মূল্যবান অবদান সৃষ্টি হয়েছে তা সহিষ্ণুতার সুফল। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অপরিসীম সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের মাধ্যমে সত্য ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। শÎæর আঘাতে তাঁর দেহ থেকে রক্তপাত হয়েছে। জীবন হয়েছে সংকটাপন্ন। তবু তিনি শÎæকে অভিশাপ দেননি, বরং তাদের ÿমা করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তার সীমাহীন ধৈর্যের ফলে তিনি সত্য প্রচারে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করে গেছেন। যেমন- দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেও একমাত্র ধৈর্য, সহিষ্ণুতার কারণে "John Briton", "Landen", "Samuel" হয়েছিলেন জগৎবিখ্যাত। iæটিওয়ালার ছেলে "Briton" প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকরূপে জীবনে মোট ৮৭ খানা গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। Landen ছিলেন কৃষকের ছেলে আর Samuel ছিলেন মুচির ছেলে। এছাড়া দুখু মিয়া নজiæল আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। সহ্য করেছেন দারিদ্র্যের কষাঘাত তাঁর সহনশীলতা তার প্রতিভাকে করেছে বিকশিত সুতরাং আমরাও আর পিছিয়ে থাকতে চাই না। ধৈয্য এবং সহিষ্ণুতার গুণে আমরাও হবো সফল এবং প্রাতঃস্মরণীয়। মানবজীবনে ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার প্রয়োজনের শেষ নেই। সকল কাজের শুভ পরিণতি আনয়নে ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার বিকল্প নেই।

সুতরাং পাঠক আসুন জীবনকে সুন্দর ও সফল করার জন্য আমরা যে সাধনায় নিজেদেরকে সমর্পিত করেছি তাকে সফলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতাকে উৎস হিসেবে বিবেচনা করি। তাহলেই আমাদের জীবন হয়ে উঠে সার্থক, সুন্দর এবং সফল।

৮। নিয়মানুবর্তিতার অভাব ঃ

একটি প্রবাদ আছে ***"মানুষের জীবন ফুলের মতো, প্রভাতের ফুল সন্ধ্যায় ঝরে যায়।"*** হ্যাঁ, মানুষের জীবনের সময় সীমা খুবই স্বল্প এবং সীমাবদ্ধ। যথাসময়ে তা শুiæ হয়, একসময়ে তা শেষ হয়। আর এই স্বল্প সময়ে প্রত্যেকটি মানুষই চায় সাফল্যের বিজয় নিশান উড়াতে। আর সেজন্য একটি বিশেষ বিষয়ের চর্চা মানুষকে করতে হয় আর তা হচ্ছে নিয়মানুবর্তিতা। জন্মের পর থেকে মানুষকে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন পালনের মাধ্যমে মানুষ নিজের জীবন ও সমাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। আর এটাই নিয়মানুবর্তিতা। এই গুণটি মানুষকে সফল হতে সাহায্য করে।

একটু লÿ্য করলেই আমরা দেখতে পাব যে বিধাতার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে নিয়মের রাজত্ব বিরাজমান। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নÿত্র থেকে শুiæ করে প্রাণীজগতের ÿুদ্র কীট সব কিছুই নিয়মের বশবর্তী। চন্দ্র-সূর্য একটি নির্দিষ্ট কÿপথে ঘূর্ণায়মান। আবার নির্দিষ্ট সময়ে উদিত হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট সময়ে অস্ত যাচ্ছে। প্রকৃতির মতো আমাদের মানবজীবনও নিয়মকানুনের মধ্যেই থাকা উচিত। কারণ সফলতার পূর্বশর্ত সেটাই। আমরা একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারব যে, নিয়ম পালন করেই মানুষ তার বিচিত্র সভ্যতার বিস্ময়কর বিকাশ সাধন করতে পেরেছে। আর মানব সভ্যতার এই সাফল্যের তো কোনও তুলনাই নেই। পÿান্তরে, নিয়মানবর্তীতার অভাবে জীবন ও সমাজ হয়ে পড়ে বিশৃঙ্খল। আর সাফল্যের কথাতো সুদূর পরাহত। মানব জীবনে নিয়ম এসেছে জীবনের স্বার্থে, সাফল্যের স্বার্থে। নিয়ম এসেছে বিশ্বাস হয়ে, নিয়ম এসেছে রীতি হিসেবে, নিয়ম এসেছে আইন হিসেবে, নিয়ম এসেছে সফলতার গতিকে ত্বরান্বিত করতে। আমি এই প্রসঙ্গে সেনাবাহিনীর কথা উÏøখ করতে চাই।

সেনাবাহিনীতে রয়েছে নিয়মানুবর্তী হওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এছাড়া পৃথিবীতে বহু প্রাতঃ স্মরণীয় ব্যক্তিরা আছেন যারা নিয়মানুবর্তী ছিলেন। নিয়মের প্রতি আনুগত্য প্রর্দশন করেছেন। আসলে নিয়ম পদ্ধতির মাধ্যমে অগ্রসর না হলে কোনও কাজই লÿ্য অর্জনে সাফল্যের মুখ দেখে না। সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তী জাতি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। যেমন- জাপান। আবার পÿান্তরে নিয়ম-কানুনের প্রতি আনুগত্যবিহীন জাতি সর্বনাশের দিকে ধাবিত হয়। দৈনন্দিন জীবনে সকল

কাজে নিয়ম পালনের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে। জীবনের সব কাজের ÿেত্রেই নিয়ম আছে। স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন না করলে শারীরিক অসুস্থতা সৃষ্টি হয়ে দৈনন্দিন জীবনযাপন ব্যাহত হয়। কর্মÿেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়। আর এভাবেই সফলতার বীজ মহীরূহে পরিণত হতে বাঁধা প্রাপ্ত হয়। অনেকেই হয়তো বলবেন যে, সফলতার সাথে নিয়মানুবর্তীতার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? কিন্তু পাঠক আপনারা হয়তো একটু গভীরভাবে বিবেচনা করলে নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে, এ সমাজে আমরা বহু বেকার তiæণ যুবকদেরকে দেখতে পাব যাদের জীবনযাপন প্রণালী কিঞ্চিৎ প্রশ্নের অপেÿা রাখে। তারা হয়তো অনেকেই ঘুম থেকে উঠে বেলা বারটায়। এরপর সকালের খাবার দুপুরে। দুপুরে-বিকেলে অনিয়ন্ত্রিত ঘোরাফেরা। সন্ধ্যায় বন্ধুদের আড্ডা। রাতে কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই এখানে সেখানে যাওয়া। গভীর রাতে বাসায় ফেরা। এরকম নিয়ম হীন জীবনযাপন করলে সে মানুষ কখনই সাফল্যের মুখ দেখবে না। ব্যক্তি জীবনের মতো সামাজক জীবনে নিয়মহীনতার কারণে অরাজকতার সৃষ্টি হয়, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। শুiæ হয় সামাজিক অবÿয়। আর এই অবস্থার মাঝে সাফল্য নামক শব্দটি প্রবেশ করার সুযোগই পায় না। রাষ্ট্রীয়ভাবেও সফলতা অর্জন করতে গেলে অবশ্যই নিয়মানুবর্তীতা প্রয়োজন। তাই বলা যায় মানবজীবনের সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি, সফলতা সব কিছুর জন্য প্রয়োজন নিয়মানুবর্তীতা। শিশুকাল থেকেই নিয়মানুবর্তীতার চর্চা করা প্রয়োজন। পিতা-মাতারা এ পর্যায়ে গুiæত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এরপর ছাত্রজীবন থেকেই নিয়মানুবর্তীতার ব্যাপাক চর্চার প্রয়োজন। শিÿা প্রতিষ্ঠানের মতো অফিস-আদালতে, কর্মÿেত্রে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়মানুবর্তীতার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। ব্যক্তি জীবনে সফল হওয়ার জন্য যেমন ব্যক্তি বিশেষের সচেতন হয়ে নিয়মানুবর্তীতা চর্চার প্রয়োজন। তেমনি একটি জাতির সফলতা আনয়নে সেই জাতির রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের, রাজনৈতিক নেতাদের সর্বোপরি আপামর জনসাধারণকে নিয়মানুবর্তী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সমকালীন বিশ্বের অস্থির পরিস্থিতির জন্য আজকে মানুষ সফলতা লাভে বার বার জটিলতা, সংকট ইত্যাদির সম্মুখীন হচ্ছে। তাই পাঠক আর নয় আসুন আমরা এখন থেকেই আমাদের জীবনে নিয়মানুবর্তীতার চর্চাকে প্রাধান্য দিতে সচেষ্ট হই এবং সাফল্যকে উপভোগ করি পরমভাবে।

৯। নেতিবাচক চিন্তার প্রভাবঃ

যে সব গুণাবলী মানুষকে মহৎ, পুন্যবান, আর্দশ এবং সফল করে তোলে তাদের মধ্যে চিন্তাশীলতার গুiæত্ব সর্বাধিক। আর সেই চিন্তাশীলতা সঙ্গত কারণেই ইতিবাচক হওয়া বাঞ্চনীয়। কারণ জন্ম-মৃত্যু মানুষের জীবনের এক চিরন্তন লীলা খেলা। শ্রদ্ধাভাজন, বীর্যবান মানুষেরা এ সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে মানবজীবনকে মহত্ত্বের আর্দশে সমৃদ্ধ করার জন্য শ্রান্তিহীন যুদ্ধ চালিয়ে যান। এক সময় তারা সফলকামও হন। মানবজীবন ফুলশয্যা নয়। অনেক সংগ্রাম, কষ্ট, ত্যাগ, তিতিÿা, পরিশ্রমের বিনিময়ে মানুষ সফলতা অর্জন করে। আর এর মাঝে কখনও ব্যর্থতার পরশে কিংবা কখনও স্বভাবগত কারণে মানুষের মাঝে নেতিবাচক চিন্তার প্রভাব চলে আসে। কখনও কখনও মানুষ নেতিবাচক কথা-বার্তাও মুখে বলে থাকে। আর এর পরিণাম যে কত ভয়াবহ সে ভাষায় লিখে প্রকাশ করা যাবে না। নেতিবাচক কথা এবং চিন্তার কারণে একজন শিÿার্থীর জীবন সম্পূর্ণই বাঁধাগ্রস্থ হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, বলা যায় কাউকে তর বাবা-মা পরীÿায় খারাপ করার জন্য নেতিবাচক কোনও কথাবার্তা বলে যদি বকাঝকা করে যেমন- ***"তোর দ্বারা আর পড়াশোনা সম্ভব না", তোর দ্বারা ভাল কিছু সম্ভব না"*** ইত্যাদি। এর ফলে দেখা যাবে সন্তান উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। সত্যিই তার জীবন ব্যর্থতার পর্যবসিত হচ্ছে। সফলতার সূর্য অস্তমিত হচ্ছে। নেতিবাচক কথাবর্তা এবং চিন্তার দৈহিক প্রভাবও বলে শেষ করা যাবে না, কেউ যদি কোনও কাজ শুiæ করার পূর্বে ভাবে কিংবা বলে "আমি এ কাজ পারব না।" "আমার দ্বারা এ কাজ করা সম্ভব না।" "আমাকে এতবড় কাজের দায়িত্ব দিও না।" আমাদের ব্রেইনে এসব কথা কম্পোজ হয়ে যায়। ফিতার মত সেটা ঘুরতেই থাকে সারাজীবন। জীবনে চলার পথে সংকটের মুখোমুখি হয়ে মানুষ যদি ধৈর্যহারা হয়ে নেতিবাচক কথা এবং চিন্তা দ্বারা সেই সংকটকেই ত্বরান্বিত করে তাহলে এই মানবজীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কেননা, জীবনের কল্যাণের জন্য নেতিবাচক চিন্তা পরিহার করে ইতিবাচক চিন্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমি আব্রাহাম লিংকনের কতা উÏjøখ করতে চাই। তিনি আইন সভার নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। কংগ্রেস নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। সাধারণ নির্বাচনে হেরেছিলেন। সিনেটের নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। সবশেষে ৫২ বৎসর বয়সে তিনি প্রেসিডেন্ট

নির্বাচিত হলেন। অথচ এর আগে প্রত্যেকটি পরাজয়ের পর যদি আব্রাহাম লিংকন ভাবতেন "না আমার দ্বারা আর রাজনীতি সম্ভব নয়।" তাহলে নিশ্চয়ই ইতিহাসে এভাবে আব্রাহাম লিংকন প্রাতঃস্মরণীয় হতেন না। পৃথিবীতে প্রতিটি সফলতার পেছনেই রয়েছে বড় ব্যর্থতা। আর ব্যর্থতার কারণে আমরা কখনই নেতিবাচক চিন্তাকে প্রশয় দিতে চাই না।

মানবজীবন বৈচিত্র্যময়। বিচিত্র বাঁধার প্রাচীর অতিক্রম করে মানুষকে সফল হতে হয়। বাঁধাহীন জীবন কোন জীবন নয়। হাসি-কান্না, বিরহ-আনন্দ উত্থান-পতন ইত্যাদির মধ্য দিয়েই প্রকৃত মানুষের উন্মেষ ঘটে। তাই সকল বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে যাতে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়, সেজন্য জীবনের যে কোনও পর্যায়ে নেতিবাচক চিন্তাকে পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ট জীব। নেতিবাচক চিন্তা এবং কথাবার্তাকে পরিহার করে জীবনে চলার পথে সব বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করা, ধৈর্য অবলম্বন করে সবকিছুর মুখোমুখি হওয়া এবং সবশেষে সফলতা অর্জন এই পুরো বিষয়টিকে আমি একটি মিশন বলতে চাই।

পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই চান সফল হতে। সুন্দরভাবে জীবনযাপন, সুস্থ থাকা সবারই কামনা। আর এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন-

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।"

আর সেই নিমিত্তে পাঠক আর নেতিবাচক চিন্তাকে কথাবার্তাকে কখনই আমরা প্রশয় দিবোনা এই হোক আমাদের এই মুহূর্তের অঙ্গীকার।

১০। লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ঃ

মানুষ সভ্যতার জনক। এক সময় মানুষ ছিল প্রকৃতির দাস। আজ সেই মানুষই নিয়ন্ত্রণ করছে প্রকৃতিকে। মেধা ও প্রজ্ঞার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে মানুষ আজ জয় করেছে পৃথিবীকে। মানুষ সফল হয়েছে। মানুষের আছে অপরিসীম ইচ্ছাশক্তি। আর সেই ইচ্ছা শক্তিকে পাথেয় করে মানুষ আজ জল, স্থল, অন্তরীক্ষে উড়িয়েছে সফলতার বিজয় নিশান। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, মানুষ লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদির কারণে নিজেরাই নিজেরদেরকে কলুষিত করছে, সফলতাকে করছে বিলম্বিত এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সফলতার পরিবর্তে বিফলতাকে করছে আহবান।

হয়তো মৌলিক বিচারে মানুষ বলবে যে মানুষ মাত্রেই তার মধ্যে থাকবে লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ এবং পরশ্রীকাতরতা। কিন্তু অবশ্যই তার একটি সীমানা এবং নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। এ সমাজের চারপাশে আমরা বহু উদাহরণ দেখতে পাব যে, অতিরিক্ত লোভের কারণে মানুষের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। অন্যের সম্পদ, গাড়ী বাড়ী ইত্যাদিতে যদি আমরা লোভ করি তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের সম্পদ বেড়ে যাবে না। বরং উক্ত লোভের কারণে আমরা হয়ে উঠবো অন্যের কাছে অপ্রিয়, অপাংক্তেয় এবং বিরক্তিকর। আমাদের পাশে কেউ থাকবে না। নিজেদেরে কাজে-কর্মেও আমরা পিছিয়ে পড়ব সাংঘাতিকভাবে। আর এমতাবস্থায় নিশ্চয়ই সফলতার স্বর্ণমুকুট আমাদের মাথায় শোভা পাবে না। পৃথিবীর ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখতে পাব হিংসা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে মানুষ যেমন- নিজের জীবনকে করেছে বিষময় তেমনি করেছে, অন্যের জীবন সংকটময়। হিংসা বিদ্বেষ মানুষের এমনি একটি কোয়ালিটি যা কি না মানুষকে শুধু জ্বালায় পোড়ায়। মানুষ ভুলে যায়, বৃহত্তর জনগোষ্ঠির কল্যাণের কথা। ভুলে যায় তার কিছু দেয়ার আছে এই পৃথিবীতে। এ সমাজে এরকম মানুষের অভাব নেই যারা কি না নিজের ভাই-বোন, বন্ধু বান্ধব, প্রতিবেশী, সহকর্মীর কোনও উন্নতি, সুসংবাদ কিংবা অন্যোর সামান্য ভাল কিছু সে সহ্য করতে পারে না। হিংসা বিদ্বেষের কারণে তারা জ্বলতে থাকে। কিন্তু জীবনে সফল হতে গেলে অন্যের সাফল্যকে অনুকরণীয় ভাবেত হবে। এর বিকল্প নেই। অন্যের সাফল্যকে অনুসরণ করে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করলে সাফল্য অসম্ভব কিছু নয়। হিংসা-বিদ্বেষ মানুষকে এমনই অন্ধ করে তুলে যে, মানুষ ভুলে যায় সেই মহৎ কথা-

"স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ বৃহৎ জগত হতে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।" অথচ যেসব মানুষ তাদে হৃদয়ের মহত্ত্বে, উদারতায় ও চরিত্র সুষমায় বিশ্বকে মুগ্ধ করতে চান তাদের অন্তর অবশ্যই হিংসা বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকা বাঞ্ছণীয়।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষ সামাজিক জীব। সবার দুঃখ সুখ আমাদের উচিত সমভাবে শেয়ার করা। অন্যের সুখ, সাফল্য যদি আমাদেরকে হিংসান্বিত করে তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের সুখ-সাফল্যও অন্যদেরকে করবে হিংসায় জর্জরিত।

এসমাজে আমরা আরও দেখব পরশ্রিকাতরতা। প্রিয় বন্ধুর যদি একটি সুনদর দামী গাড়ী থাকে তাহলে নিজের গাড়ীটিকে পানসে মনে হচ্ছে- এরকম মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ আমাদের চারপাশে অহরহ। আর পরশ্রীকাতরতা মানুষকে সফলতার কাছ থেকে ফিরিয়ে দেয় বহু বহু গুণ দূরে। পরশ্রীকাতরতা, পরনিনদা, পরচর্চার কারণে মানুষ যদি সারাÿণ ব্যস্তই থাকে তাহলে সফলতার জন্য মানুষ চেষ্টা করবে কখন।

পাঠক, বিধাতা প্রত্যেক মানুষের উপরই ন্যায়দন্ড অর্পণ করেছেন। প্রতিটি মানুষের অন্তরেই ন্যায়বোধের প্রকাশ বিদ্যামান। বিবেকের শুভ্র বেদীতে আছে ন্যায়ের আসন পাতা। তাই তো বিবেক থেকে আসে পবিত্র নির্দেশ। মানুষকে সেই পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে হয়। কিন্তু লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, পরনিনদা, পরচর্চা, পরশ্রীকাতরতার কারণে মানুষ বেশীর ভাগ সময় সেই পবিত্র দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় সেই সঙ্গে জীবনে সফলতার পরিবর্তে ব্যর্থ হয়। এক সময় হিংসা বিদ্বেষ, লোভ, পরশ্রীকাতরতা মানুষকে আত্মসংযম থেকে বিরত করে ফেলে এবং অন্তর হয়ে যায় অপবিত্র আর এমতাবস্থায় মানুষ কখনই মানবতা, মনুষ্যত্বকে সবার উর্ধ্বে ঠাঁই দিতে পারে না। তাই পাটক আমরা এই মুহূর্ত থেকে আবার স্মরণ করি যে, বিধাতা অন্তর্যামী। মানুষের হৃদয়ের খবর তিনি রাখেন। তাকে পেতে হলে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে হলে অবশ্যই হিংসা বিদ্বেষ, লোভ, পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত হয়ে অন্তরকে শুদ্ধ করতে হবে। যারা এসব থেকে মুক্ত হতে পারেন না তারা যতই সেজদা অথবা পূজা-অর্চনা কiæক না কেন, কোনও লাভই হবে না। অন্তরকে মুক্ত না করে রাত দিন বিধাতর আরাধনা করলে কখনই বিধাতার সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে,

"Kaba is not a Kaba, heart is a heart.
There is thousand Kaba equal to one heart."

অর্থাৎ কাবা শরীফই কাবা শরীফ নয়, অন্তরই হচ্ছে আসল। এক হাজারটি কাবা শরীফ সমান একটি অন্তর।

অর্থাৎ লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত না হয়ে কাবা শরীফে গিয়ে তো লাভ নেই। শুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী যারা তাদেরকে কাবা শরীফে যেতে হয় না- তারা সহকেই আjøাহর নৈকট্য লাভে সমর্থ হতে পারেন এবং জীবনে সফলতার স্বাদ আস্বাদন করতে সÿম হতে পারেন।

আসুন পাঠক এখন থেকেই আমরা আমাদের অন্তরকে শুদ্ধ করি। হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ, পরশ্রীকাতরতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে আত্মসংযম লাভ করি এবং সাফল্যের সমুদ্রে অবগাহন করি।

একজন মানুষের জীবনে সাফল্যের পশ্চাদপদতার জন্য শুধু মাত্র উপরোক্ত কারণগুলোই যে দায়ী তা নয়। আরও বহু কারণ সাফল্য লাভের ÿেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারে। ইচ্ছাশক্তি প্রবল হলে অবশ্যই সবধরণের প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভবপর। আমাদের মনে রাখা উচিত কখনই খুব দেরী হয়ে যায় না। এই মুহূর্ত থেকে আমরা শপথ করতে পারি যে আমরা আমাদেরকে ভেঙ্গে গড়ে তুলব। নিজেদেরকে ভেঙ্গে গড়ে তোলার ÿেত্রে আমরা ভাবতে পারি যে, একটি পানি ভর্তি Møাসে এক ফোঁটা কালি ফেলে দিলে সেই Møাসের পানি পান করা যায় না। কিন্তু এক ড্রাম পানিতে এক ফোঁটা পরিমাণ কালি কিছুই নয়। তেমনি আমাদের জীবনে যা কিছু খারাপ হয়েছে, ব্যর্থতা এসেছে সবকিছুকে আমরা সেই এক ড্রাম পানির এক ফোঁটা কালির সাথে তুলনা করতে চাই। অর্থাৎ খারাপ যা হয়েছে আমরা ভালর পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে চাই। আমরা এখন থেকেই নিজেদেরকে ভেঙ্গে চুড়ে গড়তে চাই। সফল হতে চাই।

নিজেকে ভেঙ্গে গড়ে তুলুন

নিজেকে ভেঙ্গে গড়ে তোলার সাধনা এক অর্থে খুব একটা কঠিন মনে না হলেও আবার খুব একটা সোজাও নয়। কারণ প্রথমেই প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কেমন করে নিজেকে ভেঙ্গে গড়ে তুলব। পাঠক, আমি মনে করি আমরা যদি আমাদের মাঝে বেশ কতগুলো গুণ বা কোয়ালিটির সমাহার ঘটাতে পারি তাহলেই হয়ত নিজেকে ভেঙ্গে গড়ে তোলা সম্ভবপর। সেই সাথে সফলতার দিকে ধাবমান হওয়াও সম্ভবপর। আর সেই গুণাবলী গুলো হচ্ছে-

১. সততা বজায় রাখুন।
২. চরিত্রকে কলুষমুক্ত রাখুন।
৩. মিতব্যয়ী হতে চেষ্টা কiæন।
৪. শিষ্টাচার পালন কiæন ।
৫. জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত কiæন।
৬. সৎ সাহচর্য লাভ করতে চেষ্টা কiæন।
৭. নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হোন।
৮. জ্ঞানর্জনে উৎসাহিত হোন।
৯. জীবনের লÿ্য স্থির কiæন।
১০. জীবনে শৃঙ্খলা বোধ বজায় রাখুন।
১১. নিজের সুপ্ত প্রতিভাবে বিকশিত কiæন।
১২. আত্মবিশ্বাসী হউন।
১৩. স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা কiæন।
১৪. অলসতা পরিহার কiæন।
১৫. শ্রমের গুiæত্ব উপলব্ধি কiæন।

আমরা উপরোক্ত বিসয়গুলোর প্রতি নিম্নেক্ত ভাবে আলোকপাত করতে পারি।

১। সততা বজায় রাখুনঃ

যেসব গুণ মানুষকে সফলা করে, মহৎ করে, পুন্যবান করে এবং সেই সঙ্গে আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে তাদের মধ্যে সততা অন্যতম এবং গুiæত্বপূর্ণ। সততা একজন মানুষকে করে সফল, নিয়ে যায় গৌরবের চূড়ান্তে, সবার সামনে করে অনুকরণীয় আদর্শ চরিত্রের অধিকারী। এক কথায় আমরা বলতে পারি সততা মানব চরিত্রের অলঙ্কার। সততা বলতে আমরা কি বুঝি? সৎ থাকর গুণটিই হচ্ছে সততা। সত্যের অনুসারী হয়ে জীবন-যাপন করা, অবৈধ কাজ কর্ম থেকে নিজেকে দূরে রাখা, মিথ্যা কথা না বলা অপরাধ প্রবণতা থেকে দূরে থাকা মোটামুটি এগুলোকেই আমরা সততা বলতে পারি। এই পৃথিবীতে মানুষকে নিরন্তর সংগ্রাম করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়। পৃথিবীতে মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রম করতে হয়। একমসময় মানুষ চিরবিদায় নেয়। কিন্তু এই মাঝখানের এই সময়টুকুতে মানুসের সামনে আসে অসংখ্য জটিল সমস্যা, সংকটময় মুহূর্ত। আর সেই সঙ্গে থাকে অনেক ধরণের প্রলোভন, লোভ-লালসা। আর সফল তিনিই যিনি লোভা-লালসার কাছে পরাজয় স্বীকার না করেন। অনেক সময় অনেকে কাজ উদ্ধারের জন্য অন্যায় পত অবলম্বন করেন। সামনে আসা সংকট, জটিলতাকে অতিক্রম করার জন্য আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন যারা অন্যায় করেন, দুর্নীতি করেন। অনেকেই আছেন যারা লোভ-লালসাকে সামলে রাখতে পারেন না। আর এভাবেই সততার বির্সজন ঘটতে থাকে। আবার অনেকেই আছেন যারা লাভবান হওয়ার জন্য সততাকে বিসর্জন দেন। যেমন- অনেক অসাধু ব্যবসায়ী আছেন যারা ব্যবসায়ে লাভবান হওয়ার জন্য অসৎভাবে, অবৈধভাবে ব্যবসা করে থাকেন। অনেক চাকুরীজীবী আছেন, যারা দুর্নীতি করে থাকেন, ঘুষ নিয়ে থাকেন শুধু মাত্র লাভের আশায়। অনেক ছাত্র পরীÿায় নকল করে থাকে শুধু ভাল রেজাল্টের

আশায়। এরকম অজস্র উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদেরই চারপাশে। এভাবে হয়তো সাময়িক ভাবে লাভবান হওয়া যায়। আপাত দৃষ্টিতে হয়তো মনে হতে পারে যে সফরতা প্রাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু প্রকৃতপÿে তা নয়। কারণ একজন মানুষ সফল কিন্তু সে অসৎ এরকম অসঙ্গতি কারো কাছেই কাম্য নয়। সফলতর সংজ্ঞাও তা নয়। তবে একথা ঠিক আমাদের সমাজ ব্যবস্থা যেমন সেখানে সততা বজায় রাখা খুবই কঠিন। বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার প্রেÿাপটে অসৎ হওয়ার জন্য সমাজ ব্যবস্থা অনেকাংশে দায়ী। একটু লÿ্য করলেই আমরা দেখতে পাব যে, এ সমাজে সততার প্রশংসা নেই, সৎ লোকের গ্রহণযোগ্যতা নেই, অন্যায়ের প্রতি গৃণা নেই কিংবা অন্যায়ের বিচারও নেই। আর এ ধরণের পরিস্থিতিতে মূল্যবোধের অবÿয় ঘটছে অনবরত। সেই সঙ্গে সততা নিচ্ছে বিদায়। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে, অন্যায়ের বিচার না করলে, নীতি-আদর্শ অবিচল না থাকলে, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে মানুষের পÿে সততা বজায় রাখা কঠিন। এছাড়া শিÿার অভাব, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এগুলোও সততা বিসর্জনের জন্য দায়ী । কিন্তু আমাদের ভূলে গেলে চলবে না পৃথিবীতে কোনও ধর্মেই সততাকে মর্যাদাহীন বিবেচনা করা হয়নি। বরং সততার মূল্য মর্যাদা সকল ধর্মেই প্রাধান্য পেয়েছে। সততার অভাবে জীবন ও সমাজ ধ্বংস হয়ে যাক এটা আমরা কখনই চাইব না।

সুন্দর ও পূর্ণবান জীবনের জন্য সততার অনুশীলন অত্যাবশ্যক। সারাজীবন সততাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে হয়। শিশুকাল থেকেই সততার চর্চা শুiæ হওয়া আবশ্যক। এব্যাপারে পিতা-মাতা, গুiæজনরা গুiæত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এছাড়া শিÿা প্রতিষ্ঠানে, কর্মÿেত্রে সততার আদর্শ সমুজ্জ্বল রাখা বাঞ্চনীয়। কারণ ইহকাল ও পরকালের সুখ-শান্তি নিহিত আছে সৎভাবে জীবন-যাপনের মাধ্যমে। সততার চর্চা করে জীবনকে সুন্দর করা সম্ভবপর, উপভোগ্য করা সম্বপর। সেই সঙ্গে সাফল্য লাভ করাও সম্ভবপর। তাই পাঠক আসুন, আমরা সৎভাবে জীবন-যাপন করি, সততার চর্চা করি এবং সেই সঙ্গে অন্যকেও সৎভাবে জীবন-যাপন করার জন্য অনুপ্রাণিত করি।

২। চরিত্রকে কলুষমুক্ত রাখুন ঃ

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে,

"When money is lost, nothinhg is lost, when health is lost something is lost but when character is lost all is lost."

অর্থাৎ চরিত্র হীন ব্যক্তি বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ যতই থাকুক না কেন, এসবের কোন মূলই নেই। চরিত্র হারালে এক জনকে সবই হারাতে হয়। আর সেখানে সাফল্যের কথা তো সুদূর পরাহত। চরিত্র বলতে কি বুঝি? চরিত্র বলতে বুঝি বাক্যে, কর্মে এবং চিন্তায় একটি পবিত্র ভাব। যা মানুষকে ন্যায়পথে, সত্যপথে অবিচলিত রাখে। যিনি চরিত্রবান তিনি কখনই সত্য থেকে বিচ্যুত হন না, কারও সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেন না। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। এই শ্রেষ্ঠত্ব মানুষকে চরিত্র দিয়েই অর্জন করতে হয়। আর এই অর্জন একদিনে কখনই সম্ভব নয়। মানুষকে তার জীবন প্রণালীর ধারাবহিকতার মধ্য দিয়ে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এটি অর্জন করতে হয়। যিনি চরিত্রবান তিনি কখনই ক্রোধে আত্মহারা হন না, কখনই কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন না। তিনি সব সময়ই মানুষকে ভালবাসার চোখে দেখেন। এই পৃথিবী, এই সংসার প্রলোভনময়। পাপের শত সহস্র প্রলোভন মানুষকে বিপথে পরিচালিত করতে সর্বদাই সচেষ্ট। নিজের আত্মিক শক্তির বলে সেই সকল প্রলোভনকে দমন করে নিজেকে সত্যের পথে অবিচল রাখতে হয়। যে দুর্বল, যার আত্মিক নিরাময় নেই, আত্ম শক্তি নেই সে কখনও চরিত্রবান হওয়ার যোগ্য নয়। চরিত্র গঠনের প্রথম স্থান গ্রহ। সামাজিক, পারিবারিক সর্বোপরি শিশুর চারপাশের পরিবেশ শিশুর চরিত্র গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্রই রয়েছে চরিত্র গঠনের সুযোগ। আর অভিভাবকবৃন্দ, শিÿকবৃন্দের এই চরিত্র গঠনের বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে লÿ্য রাখা উচিত। বর্তমান সামাজিক অবস্থার প্রেÿাপটে আমরা একটু লÿ্য করলেই দেখতে পাব যে, বর্তমানে বহু অল্প বয়সের ছেলে মেয়েদের চরিত্র অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। চারদিকে অস্থির অবস্থার প্রেÿাপটে আমরা আরও দেখতে পাই যে, বিভিন্ন পেশায় জড়িত লোকজন নারী-পুiæষ নির্বিশেষে অনেকের মাঝেই চরিত্র বলতে কিছু নেই। যে কারণে তারা নিজেরাও থাকছেন অস্থির। সমাজকে করছেন সেই সঙ্গে কলুষিত। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে চরিত্র হচ্ছে সাধনার ধন। চরিত্র লাভের আরেকটি প্রধান

পদ্ধতিও আছে সেটি হচ্ছে স্বীয় সাধনা। পৃথিবীতে বহু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরা আছেন তারা প্রত্যেকেই ছিলেন আপন চরিত্রের মহিমায় উজ্জ্বল। যেমন, মহাত্মা গান্ধী, হোসেন সোহ্‌রাওয়ার্দী, এ.কে. ফজলুল হক, শেরে বাংলা, জগদীশ চন্দ্র বসু, হাজী মুহাম্মদ মুহসীন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এনারা সবাই আপন চরিত্রের দৃঢ়তায় সবল ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শ, উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে গেছেন এবং স্ব-স্ব ÿেত্রে তারা সফল হয়েছেন। আমাদের কাছে তারা প্রাতঃস্মরণীয়। সুতরাং আমরাও আর পিছিয়ে থাকতে চাই না। আমাদের বুঝতে হবে যে, চরিত্রই বল। ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক জীবনে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার জন্য চরিত্র অপরিহার্য। কেননা মানুষকে মূল্যায়ন করা হয় তার চরিত্র দিয়েই। চরিত্রের স্থান অর্থ, বিত্ত, বিভব এমনকি বিদ্যার চেয়েও উর্ধ্বে। সাময়িক শান্তির জন্য, সাময়িক লাভের জন্য আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন যারা চরিত্রকে কলুষিত করতে দ্বিধা করেন না। কিন্তু চরিত্র কলুষিত হলে একজন মানুষের আর কিছুই থাকে না। সুতরাং পাঠক আমরা তাদেরকে অনুসরণ করব। তাদের চরিত্রের ভাল দিকগুলো নিজেরদের মাঝে নিতে চেষ্টা করব। নিজেদের মাঝে দৃঢ়তা থাকলে চরিত্র কলুষিত হওয়ার কোনও সুযোগই নেই। আসুন এখন থেকেই আমরা চরিত্রকে কলুষমুক্ত করার চেষ্টায় নিমগ্ন হই। আর তর সাথে যদি নিষ্ঠা থাকে, সাধনা থাকে, সততা থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা সার্থক হবো। সফল হবো, লাভবান হবো।

৩। মিতব্যায়ী হতে চেষ্টা কiæনঃ

কবি বলেছিলেন,

> "যে জন দিবসে মনের হরষে
> জ্বালায় মোমের বাতি,
> আশু গৃহে তার দেখিবে না আর
> নিশীথে প্রদীপ ভাতি।"

হ্যাঁ, আমাদের মাঝে মিতব্যায়িতা না থাকলে একসময় অহেতুক অপচয়ের মাধ্যমে সব সম্পদ শেষ হয়ে যাবে এবং যখন প্রয়োজন হবে তখন আর হাতের কাছে ব্যয় করার মত সম্পদ থাকবে না। আর জীবনে সফল হওয়ার ÿেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য মিতব্যয়ী না হওয়াও বহুলাংশে দায়ী। মিতব্যায়িতা মানব চরিত্রের একটি বড় ধরণের গুণও বটে। আমাদের চারপাশে বহু অমিতব্যায়িতার দৃষ্টান্ত রয়েছে। পরিমিতভাবে সম্পদ ব্যয় না করার কারণে বহুজনের অবস্থা হয়ে গেছে পথের ভিখারীর মত। দুঃখ তাদের জীবনকে করেছে গ্রাস। শুধু তাই নয় সামাজিক মর্যাদায় ব্যাঘাত ঘটেছে। অমিতব্যয়ী হলে মানুষের জীবনে কষ্টের শেষ থাকে না। পÿান্তরে, মিতব্যয়ী হলে সামন্য টাকা-পয়সা দিয়েই মানুষ ভাল থাকতে পারে। প্রকৃতপÿে মিতব্যায়িতা বলতে আমরা বুঝি সম্পদের পরিমিত ব্যয়ের অভ্যাসের নাম। অনর্থক অপচয় না করে যথার্থ প্রয়োজনীয়তা অনুসারে অর্থ, সম্পদ ব্যয় করাকে বলে মিতব্যায়িতা। জীবনকে সফল করে তোলার জন্য এই বৈশিষ্ট্যের বিশেষ গুiæত্ব রয়েছে। ব্যক্তিজীবনে মিতব্যায়িতার যেমন প্রয়োজন রয়েছে। তেমনি পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনেও মিতব্যায়িতার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। অর্থ, বিত্ত, বিভব, সম্পদ ইত্যাদির সঞ্চয় ও ইত্যাদির ব্যয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন সম্ভব হলে সেখানে মিতব্যায়িতার নির্দর্শন প্রকাশ পায়। আর মিতব্যায়িতা মানুষের চরিত্রকে উজ্জ্বল করে এবং সেই সাথে জাতিকেও করে সমৃদ্ধ।

জীবনে সফলতাকে ত্বরান্বিত করতে গেলেও চাই মিতব্যায়িতা। আমাদের চারপাশে তাকালে আমরা দেখতে পাব যে, মানুষের প্রবণতাই হচ্ছে সঞ্চয়। মানুষ সম্পদ সঞ্চয় করে। অর্থ, বিত্ত, বিভব, সম্পদের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ থাকে কারণ এটা একটা সাধারণ চিন্তা যে, সম্পদ থাকলেই মানুষ সুখী হয়। আর জীবনে সম্পদের গুiæত্ব বিবেচনা করে মানুষ প্রাণপনে সম্পদ সঞ্চয়ে তৎপর হয়। এই কারণে মানুষকে প্রতিনিয়ত পরিশ্রমও করতে হয়। মানুষ ব্যবসা করে, চাকুরী করে, শিÿকতা করে, পেশায় কেউ হয় ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার। আর এর সবই করে জীবনে কোনও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। অর্থ উপার্জনের প্রবণতা ধনী-গরীব সবার মাঝেই সমান। দীন-হীন দরিদ্র মানুষও তার যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ উপার্জন করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু শুধু উপার্জনেই মানুষের যথার্থতার পরিচয় নেই। পরিচয় মেলে ব্যয়ের মধ্যে।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে, "Cut your coat according to your cloths." অর্থাৎ আয় বুঝে ব্যয় করার বিষয়টি। আমাদের জীবনে ভবিষ্যৎ কি হবে আমরা জানি না। যে কোনও সময় যে কোন ও বিপদাপদ ঘটতে পারে। যে কোনও সংকট এসে উপস্থিত হতে পারে। কাজেই ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে সেভাবে যতটা সম্ভব প্রস্তুত রাখা উচিত। মিতব্যয়ী হওয়ার সুফল শুধু সফলতার মধ্যে যে নিহিত তা নয়। মিতব্যয়ী হওয়ার আরেকটি বিশেষ দিক আছে। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের মানুষজন দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে। কিন্তু যে বিত্তহীন, দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে তারও তো অধিকার আছে সুনদর ভাবে বাঁচার। অন্তত্মতঃ খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অধিকার আছে তার। তাই বিত্তবানরা যদি মিতব্যয়ী হন তাহলে বিত্তহীনরা কিছুটা লাভবান হতে পারে। কারণ মিতব্যয়িতার মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠ বনটন সম্ভব হলে একটি জাতি এগিয়ে যেতে পারে অনেকখানি। তবে অনেকেই মিতব্যয়িতার সাথে কৃপণতার ধারণাকে এক করে ফেলেন। কিন্তু দু'টি বিষয় সম্পূর্ণই আলাদা। কৃপণ ব্যক্তিরা প্রয়োজনেও ব্যয় করাটা অপছনদ করেন। এ ধরণের মানসিকতা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। মিতব্যয়ী হতে হতে গেলে পরিকল্পনার প্রয়োজন। যে কারণে প্রতিবছর একটি দেশের সরকার বাজেট প্রনয়ণ করে। তাই মিতব্যয়িতার সুফল বলে শেষ করা যাবে না। জীবনে সফল হওয়ার জন্য একজন মানুষকে অবশ্যই মিতব্যায়ী হওয়া উচিত। তাই পাঠক, আসুন আমরা এই মুহূর্ত থেকে মিতব্যয়ী হওয়ার চেষ্টা করে নিজের সুখ-স্বচ্ছনদ্যকে নিশ্চিত করি। সেই সঙ্গে অন্যের কল্যাণে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখি।

৪। শিষ্টাচার পালন কাiæন ঃ

যে গুনটি মানব চরিত্রকে করে সুনদর, মার্জিত, আকর্ষনীয়, গৌরবান্বিত এবং অন্যদের কাছে করে অনুকরণীয় সেই গুণটি হচ্ছে শিষ্টাচার বা আদব-কায়দা। "আদব" একটি আরবী শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে মার্জিত আচরণ ও সৌজন। যথার্থ শিÿিত, মার্জিত, বিনীত ব্যবহারের মানুষ সমাজে অন্যদের সঙ্গে আচার ব্যবহারে, কথাবর্তায়, চলাফেরায় যে আচরণের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে তাকে সমষ্টিগত ভাবে শিষ্টাচার বা আদব-কায়দা বলে। জ্ঞান অর্জনের মত এই শিষ্টাচার বা আদব-কায়দাকেও অর্জন করতে হয় অনেক চেষ্টা, সাধনার দ্বারা। আর মাতৃগর্ভ থেকেই কেউ শিষ্টাচার শিখে আসেনা। আদব-কায়দার অভাব ঘটলে মানুষ অন্যের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন আচরণ করতে পারে না। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, একজন মানুষের সফল হওয়ার সঙ্গে শিষ্টাচার বা আদব-কায়দার কি সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষ কখনই এককভাবে, বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতে পারে না। এই সমাজে সফলতার সঙ্গে বাস করতে গেলে অবশ্যই অন্যের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ বজায় রাখা উচিত। নিজের সুখ-সুবিধা যেমন নিজের কাছে গুiæত্বপূর্ণ তেমনি অন্যের সুখ, দুঃখ, আননদ, বেদনাও তেমনি গুiæত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। আর এটা হচ্ছে পারস্পরিক কর্তব্য। নিজের যে কোনও কাজ করতে গেলেও প্রয়োজন অন্যের সাহচর্য। আর সেখানে শিষ্টাচারের ভূমিকা আসাধারণ। কারণ দুর্নীতি, iæÿ স্বভাবের অর্থাৎ এক কথায় বেয়াদব মানুষকে কেউ পছনদ করে না। তাই অনেকটা নিজের স্বার্থে হলও প্রয়োজন শিষ্টাচার। তবে শিষ্টাচার সম্পর্কে একটি ভ্রান্তম্ন ধারণা প্রচলিত আছে। আর তা হচ্ছে যারা স্বভাব গত কারণে বেয়াদব তারা ভাবে শিষ্টাচার পালন করলে সেটা অনেকটা ভীiæতা, কাপুiæষ চিত্ত বা দুর্বল চিত্তের পরিচায়ক। কিন্তু এটি সম্পূর্ণই ভূল ধারনা। কারণ বড়দের শ্রদ্ধা করা, ছোটদের স্নেহ করা যার যতটুকু সম্মান প্রাপ্য তাকে ততটুকু সম্মান দেয়ার মাঝে কোনই ভীiæতা নেই। বরং এই চর্চা চালিয়ে গেলে নিজেও এক সময় অন্যের কাছে অনুকরণীয় হওয়া সম্ভবপর। যার সাথে জীবনে সফলতার সম্পর্ক শতকরা একশত ভাগ।

আবার শিষ্টাচারের আরেকটি দিকও রয়েছে। আদব-কায়দার পরিমাণ যখন অতিরিক্ত হয়ে যায় তখন সেটা চারিত্রিক দুর্বলতার পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়। অন্যেকে তোষামোদ করা, অন্যের অসংগতিসম্পন্ন আচরণের প্রশংসা করা, অন্যের অন্যায় ইচ্ছাকে সমর্থন করা ইত্যাদি কখনই আদব-কায়দার মাঝে পড়ে না। বরং এগুলোর নাম হচ্ছে দাসবৃত্তি। যা সবার কাছে নিনদনীয়। পÿান্তম্নরে শিষ্টাচার শÎæকেও আপন করে তোলে। পৃথিবীর ইতিহাস গবেষণা করলে দেখা যায় মানুষ নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বা শিষ্টাচার বজায় রেখেই সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে। আজকের উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন রাষ্ট্র নানা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। ফলে তারা নিজেদেরকে উন্নত করতে পারছে। এর মূলে রয়েছে কিন্তু

শিষ্টাচার। আবার যেকানে দেখা যায় স্বার্থের দ্বন্দ্ব, হানাহানি, সন্ত্রাস সেখানেই কিন্তু রয়েছে সৌজন্য বোধের চরম অভাব, শিষ্টাচারের অভাব, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাব। সুতরাং মানবজীবনকে সুন্দর, সার্থক, সফর করার জন্য শিষ্টাচারের উপযোগিতা বলে শেষ করা যাবে না। শিষ্টাচর অর্জন করতে হলে প্রয়োজন শিশুকাল থেকেই এর চর্চা। আর এ ব্যাপারে শিশু পিতা-মাতার কাছ থেকে শিÿা গ্রহণ করতে পারে। তারপর পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতিজন সবার কাছ থেকেই শিষ্টাচার সম্পর্কে শেখা যায়। এছাড়া শিÿা প্রতিষ্ঠান থেকেও শিষ্টাচারের ব্যাপারে বিশেষ শিÿা লাভ করা সম্ভবপর। ভাল বই পড়েও শিষ্টাচার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর। একজন ভালমানুষের পরিচয় পাওয়া যায় তার আচার-আচারণ, ব্যবহার সৌজন্যবোধ, ভদ্রতায়। শিষ্টাচারের এই সমস্তগুণ মানুষকে করে সফল, জীবনকে করে সুন্দর, সামাজিক পরিবেশকে করে শান্তিময়, জাতীয় জীবনে আনে সমৃদ্ধি। বর্তমানে আমাদের সামাজিক অবস্থা সংকট এবং ঝুঁকির সম্মুখীন। কারণ অশিÿা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, বেকারত্ব, বিদেশী সংস্কৃতির আগ্রাসন আমাদের সমাজ জীবনকে করছে জর্জরিত, পীড়িত। মানুষে মানুষে বিদ্বেষের ফলে চারদিকে জ্বলছে আশান্তির আগুন। আর এই সমস্ত অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য প্রয়োজন মানুষে মানুষে শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ, আদব-কায়দা। তাই পাঠক আসুন আমরা অনুশীলন করি, চর্চা করি শিষ্টাচারবোধের। এতে যে শুধু আমাদের ব্যক্তি জীবনই সাফল্য মন্ডিত হবে তা নয়, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবনও হবে সমৃদ্ধ শালী এবং উন্নত।

৫। জনসেবয় নিজেকে নিয়োজিত কiæণ ঃ

মহান আjøাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন- "দয়া, সত্য ও কল্যাণ এই যদি মানুষের আদর্শ হয়, সমাজের প্রতি মানুষ যদি এই সাধনাকে গ্রহণ করে তাহলে মানুষের আদর্শ হয়, সমাজের প্রতি মানুষ যদি এই সাধনাকে গ্রহণ করে তাহলে মানুষের জীবনে এমন কোন সমস্যার কল্পনা করা যায় না যা আপোষে শান্তিতে মীমাংসা হতে পারে না।" হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "মানুষের মাঝে তিনিই শ্রেষ্ঠ যিনি মানুষের উপকার করেন।" পৃথিবীতে মানব সভ্যতার প্রথম পর্ব থেকেই জনসেবা প্রচলিত ছিল। সেই সুদূর অতীত থেকেই পরিবারের পাশাপাশি জনসেবা, জনহিতের প্রয়াস ছিল অব্যাহত। জনসেবার মধ্যেই ঈশ্বর উপাসনার প্রকাশ ঘটে।

সেজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন-

"বহুরূপে সম্মুখে ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন জীবনে সফলতার জন্য জনসেবার কোনও প্রয়োজন আছে কি? এর উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ অবশ্যই যার যতটুকু সামর্থ্য আছে সেই অনুযায়ীই জনসেবা করা উচিত। কারণ সফলতার সংজ্ঞা কখনই আমাদের চার পাশের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বাদ দিয়ে নয়। জগতে আমরা যা কিছু দেখি তার সবই এক বিরাট শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট। সেই বিরাট শক্তি আjøাহ্। আমরা সকলেই তার বান্দা। আর হাদীস শরীফে আছে "আjøাহকে ভালবাসার ইচ্ছা থাকলে প্রথমে মানুষকে ভালবাসতে শিখ।" আর এই মানুষ হচ্ছে অনাহারী, দীনহীন, দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত মানুষ। এই মানুষ হচ্ছে হাজারও সমস্যার জর্জরিত সাধারণ মানুষ, রোগাক্রান্ত, বস্ত্রহীন, খাদ্যহীন, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষ। এদেরকে সেবার মধ্য দিয়েই স্রষ্টাকে পাওয়া সম্ভব।

এই পৃথিবীতে কেউ ধনী, কেউ নির্ধন, কেউ উচ্ছবংশজাত, কেউ নিম্ন বংশজাত। কেউ দরিদ্র, কেউ শিÿিত, কেউ অশিÿিত। কিন্তু সকলেই এক বিধাতার সন্তান। এক বিধাতার রাজ্যে বসবাস করে মানুষে মানুষে সাম্যভাব, ভ্রাতৃত্বভাব স্থাপন মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। আর এর মাঝেই লুক্কায়িত আছে জনসেবার বীজ। শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে আসে না তাদের মতো নরাধম আর জগতে নেই। বলাবাহুল্য স্বার্থপরতা, আত্মমর্যাদাবোধ এসব কারণে মানুষ জনসেবা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু একটি কথা না বললেই নয়। নিজের সফলতাকে সঠিক ভাবে, পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে গেলেও চাই জনসেবার মন-মানসিকতা। ইতিহাস ঘাটলেও আমরা বহু প্রাতঃস্মরণীয়, সফল ব্যক্তিদেরকে জানতে পারবো যারা জনসেবার মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। সম্রাট অশোক থেকে শুiæ করে সম্রাট

শেরশাহ্ সহ অন্যান্য মোঘল সম্রাটেরা জনসেবার অংশগ্রহণ করেছিলেন। যেমন- সম্রাট শেরশাহ্ গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড নির্মাণ করেছিলেন। সম্রাট অশোক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীতে হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হুগলী মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিলেন। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং আমাদেরও উচিত সামর্থ্য অনুযায়ী জনসেবা মূলক কার্যে অংশগ্রহণ করা। আজকের বিশ্ব পরিস্থিতি ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। মানুষের জীবন ক্রমশঃ সমস্যা পীড়িত হচ্ছে। অর্থনৈতিক টানাপোড়নও বাড়ছে। এর মাঝেও যতটা সম্ভব সামর্থ্য অনুযায়ী জনসেবা মূলক কাজে অংশগ্রহণ করলে যে আত্মতৃপ্তি লাভ করা সম্ভব হয় তা জীবনের সফলতার পরিমন্ডলকে বাড়িয়ে দেয় বহু বহু গুণ। তাই আসুন, পাঠক আমরা সবাই আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী জনসেবার নিজেদেরকে নিয়োজিত করি। কারণ জনসেবার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত সুখ, প্রকৃত তৃপ্তি এবং সফলতা উপভোগের চাবিকাঠি।

৬। সৎ সাহচর্য লাভ করতে চেষ্টা কiæন ঃ

যে সান্নিধ্য বা সাহচর্য মানুষকে সুপরামর্শ দেয়, সদুপদেশ দেয়, ভাল কাজে সৎ সাহস দেয় এবং সেই সাথে দেয় সহযোগিতা তাকেই সৎসঙ্গ বলে। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু মানুষ একা থাকতে পারে না। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন ধরণের মানুষের সহযোগিতায় একজন মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। আর একজন মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ প্রাপ্তির সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে জীবনে সফলতা লাভের। একা একা হয়তো কোনও একটি উদ্দেশ্য সফল করতে অনেক কষ্ট হয়। আবার অনেক সময় হয়তো সেটা সম্ভবই হয় না। কিন্তু অপরের সাহায্যে, সাহচর্যে কঠিন কাজ, কঠিন উদ্দেশ্য সফল করতে সহজতর হয়, সম্ভব পর হয়। তাই এটা অবশ্যই আশা করি আমরা সবাই যে সেই সাহচর্য চাই যা হবে সৎ সাহচর্য। যে সব বন্ধু-বান্ধব সৎ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে, উদার সহযোগিতা দান করে লÿ্য অর্জনে এগিয়ে দেয় তাদের সাহচর্যই সৎসঙ্গ। তাদের সঙ্গ চিরদিনই সবার কাম্য। আবার আরেক দিকে চিন্তা করতে গেলে জীবনকে সুন্দর, উপভোগ্য এবং সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য সাহায্যকারী হিসেবে আমরা অন্য মানুষকেই আশা করি। আর সেখানেই উঠে নির্বাচনের প্রশ্ন। কারণ সব আগুন্তককেই তো আর ভাল, সৎ এবং আপনজন বলে বিবেচনা করা যায় না। কারণ আমাদের চারপাশে অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে আমরা দেখতে পাই বন্ধুর বেশে এসে শÎæর চেয়েও বেশী ÿতি করে গেছে। বহু দৃষ্টান্ত আছে বন্ধুর সাহচর্য পেয়ে নেশাগ্রস্থ হয়ে গেছে কিংবা সন্ত্রাসী হয়ে গেছে। বন্ধুর সাহচর্যে এসে পড়াশোনায় অমনযোগীতা এসেছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। পÿান্তরে, সৎ সাহচর্য লাভ করে মানুষ সফলতার চূড়ান্ত শীষে উঠে গেছে এমনও আমরা দেখি। জীবনে সৎসঙ্গী না থাকলে অনেকটা অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হয়। জীবনে চলার পথে অনেক সংকট, জটিলতা সামনে এসে উপস্থিত হয়। তখন বুদ্ধি, পরামর্শ ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে যথার্থ সৎসঙ্গীর পরিচয় দেয় মানুষ। বন্ধুর সহায়তায় কর্মপ্রবাহকে সাফল্যের দ্বার দেশে পৌঁছানো চলে।

তাই সৎসঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা মানবজীবনকে তাৎপর্য মন্ডিত করে তোলে। কোনও মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তার অপূর্ণতা দূর করে তার সমব্যথী সৎ বন্ধু। উত্তম বন্ধুর সৎ পরামর্শে জীবনে সফলকাম হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যাদের বন্ধু সৎ পরামর্শে জীবনে সফলকাম হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যাদের বন্ধু বলে গ্রহণ করতে হবে তাদের আচার-আচরণ, তাদের কার্যকলাপ, প্রবৃত্তি সম্পর্কে আগেই ধারণা নেয়া উচিত। সৎসঙ্গ লাভের জন্য সমমনা মানুষ হতে হয়। দু'জন মানুষের মনের মিল হলেই বন্ধু হয়ে ওঠা সম্ভব পর। সৎ সাহচর্যের জন্য ভাল বন্ধু যেমন গ্রহণযোগ্য তেমনি অসৎ সাহচর্যও অবশ্যই পরিত্যাজ্য। অসৎ সঙ্গী যাতে কখনই জীবনে না জুটতে পারে সেজন্য সারা জীবনই তৎপর থাকতে হয়। আর এ ব্যাপারে শৈশবে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, শিÿক সবারই বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। সৎ সাহচর্যের প্রভাবে মানুষের অসহায়ত্ব বিদূরিত হয়, সংকটকালে শক্তি হিসেবে কাজ করে। সৎসঙ্গী একজনের ÿেত্রে প্রহরীর মত কাজ করে। মানব জীবনে সৎসঙ্গের প্রভাব সম্পর্কে সন্দেহের কোনও অবকাশই নেই। আমাদের জীবন নানা সমস্যায় জর্জরিত। এর মাঝেই আমাদের বাঁচতে হবে। সেÿেত্রে সৎ সান্নিধ্যের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। তাই পাঠক আসুন আমরা সৎসাহচর্য লাভের জন্য সচেতন হই। শুধু তাই নয় অন্যকে সৎসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করার সাথে সাথে নিজেকেও যেন অন্যের সৎসঙ্গী

হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি সেজন্যও আমরা এখন থেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। তাহলেই জীবন সার্থক হবে এবং সফলতা পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

৭। নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হোন ঃ

আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থার প্রেÿাপটে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমাজের সর্ব স্তরে প্রতিটি ÿেত্রে নৈতিক মূল্যবোধের অবÿয় ঘটেছে। জীবনের সর্বস্তরে চলছে এখন দুর্নীতির রাজত্ব। দুর্নীতির মাধ্যমে মানুষ আজ বিত্তশালী, অর্থশালী হয়েও কোনও সংকোচ বোধ করছে না। আপাত দৃষ্টিতে সে নিজেকে সফল মনে করতে পারে। কিন্তু আসলেই কি তাই? একজন সফল মানুষের সবার আগে থাকা প্রয়োজন নৈতিক মূল্যবোধ এবং সে সম্পর্কে সচেতনতা। তাহলেই সে সবার কাছে অনুকরণীয় এবং শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেতে পারবে। বর্তমানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি, শিÿার প্রতি নেই কারো অনুরাগ, ন্যায়ের পথে জীবন গড়তে নেই কারো চেষ্টা। ছাত্রসমাজে চলছে দুর্নীতি, অনিয়ম। রাজনীতিতে চলছে লেজুড়বৃত্তি। শিÿাঙ্গনে চলছে সন্ত্রাস। সমাজের সর্বত্রই চলছে অধৎপতনের বিভিন্ন ধরণের কার্যকলাপ। নিজ কর্তব্যে অবহেলা, আন্তরিকতার অভাব, মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, সহানুভূতির অভাব, স্বার্থ উদ্ধারের ÿেত্রে ব্যাপক তৎপরতা, জনকল্যাণ সাধনে অনীহা-এসবের মূলে যে প্রধান কারণটি দায়ী আর তা হচ্ছে মানুষের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধের দাiæন অভাব। প্রকৃতপÿে মানবজীবনকে যথার্থভাবে সুন্দর, সফল এবং সৌন্দর্যমন্ডিত করে তোলে তার নৈতিক মূল্যবোধ। মানুষ যখন বিবেকবান হৃদয়ের অধিকারী হয়ে নৈতিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখে ঠিক তখনই মনুষ্যত্বের গৌরব বিকশিত হয়। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। একজন সফল মানুষ গড়ে তোলার জন্য নৈতিক মূল্যবোধ অপরিহার্য। নীতি আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবন ব্যবস্থার প্রকাশই হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ। জীবনের যে কোনও পর্যায়ে দুর্নীতি, ঘুষ, বঞ্চনা, শোষণ, স্বার্থপরতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকতে পারলে বলা যায় যে নৈতিকতার আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে।

আরও ব্যাখ্যা করলে বলা যায়, ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলা, সত্য পথের অনুসারী হওয়া, পরোপকারের মহান ব্রতে উদ্দীপ্ত হওয়ার মাঝেই রয়েছে মূল্যবোধের বিকাশ। আর যার মাঝে রয়েছে নৈতিক মূল্যবোধ, জীবনে তার সাফল্য সুনিশ্চিত। তবে হ্যাঁ, নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সাথে প্রয়োজন অন্যান্য গুণাবলীরও বিকাশ সাধন। আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। শিÿাঙ্গনে সন্ত্রাস, সেশন জট, পরীÿা, চাকুরিতে দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বেগতি ইত্যাদি নানা কারণে আমাদের সমাজে নৈতিক মূল্যবোধে চরম অবÿয় খুব বেশী পরিমাণে ঘটছে। আর স্বাভাবিকভাবে নৈতিক মূল্যবোধের জ্ঞান ছাড়া কেউ সফল হলেও, উন্নতি করলেও সেই সফলতা বা উন্নতির মহান পরশ সমাজকে, জাতিকে সর্বোপরি কোনও ব্যক্তিকে স্পর্শ করতে পারে না। তাই নৈতিকতা বিবর্জিত কোনও মানুষই সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে না। পাওয়া ঠিকও নয়। নৈতিক মূল্যবোধে গড়ে তোলার চর্চা ছোটবেলা থেকেই করা উচিত। পিতা-মাতা এÿেত্রে সবচাইতে গুiæত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। কারণ শিশুরা পিতামাতার সাহচর্যই সবার আগে পায়। তারপর ভাইবোন আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এদের সাহচর্য পায়। শিÿা প্রতিষ্ঠানে শিÿকের কাছ থেকে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে।

তাই পাঠক, আসুন আমরা সবাই নিজেরা নৈতিক মূল্যবোধের মহান আলোকে নিজেরা আলোকিত হই এবং সেই সঙ্গে অন্যদের আলোকিত কতে সচেষ্ট হই। কারণ আমরা ব্যক্তি সাফল্য অর্জন করার সাথে সাথে আমরা চাইব আমাদের জাতীয় সাফল্যও অর্জিত হোক। কারণ আমাদের দেশ স্বাধীন দেশ। আমরা স্বাধীন জাতি এবং সেই সঙ্গে অনন্য মানুষ, অনন্য জাতি। কিন্তু এখনও অনুদান, ঋণের অনুগ্রহে আমরা ভারাক্রান্ত। অতীতের পরিপ্রেÿিতে বর্তমানে মূল্যবোধের অবÿয় ঘটেছে চরমভাবে। আমাদের প্রয়োজন ধর্মীয় শিÿা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, পরিমার্জন, মানবিকতার উন্নয়ন এবং বিকাশ। আর সেজন্যে নৈতিক মূল্যবোধের কোনও বিকল্প নেই। তাই পাঠক, আসুন এখন থেকেই আমরা নৈতিক মূল্যবোধকে উপলব্ধি করতে শিখি এবং নিজেরদের চরিত্রকে নৈতিক মূল্যবোধে স্পর্শে পরশপাথরে রূপান্তরিত করি।

৮। জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত হোনঃ

সাধারণতঃ জ্ঞান বলতে বুঝায় “বুদ্ধি” বা বোঝার শক্তিকে। অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার, অপরিচিতের সন্ধান লাভ করার জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। আর জ্ঞানের পরিধি যার যত বেশী সে ততই শক্তিশালী, সমৃদ্ধশালী। আর জীবনে সফল হওয়ার জন্যও তার যোগ্যতার পরিধিও ততটাই ব্যাপক। একজন জ্ঞানী লোকের উপলব্ধির সাথে কখনই আর সবার উপলব্ধি মিলবে না। জ্ঞান মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ এবং শক্তি। জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়ে মানুষ সর্ভতা, সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাচ্ছে পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ সফল হচ্ছে। মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেলেও মানুসের জ্ঞানের সফলতা মানুষকে পৃথিবীতে আমর করে রাখে। যেমন- প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন আজো আমাদের কাছে বিস্ময়কর। এছাড়া মিশরের পিরামিড, চীনের প্রাচীর, আগ্রার তাজমহল থেকে শুiæ করে বর্তমান যুগের কম্পিউটার, ইনটারনেট, মোবাইল ফোন এগুলো সবই মানুষের জ্ঞানের চর্চা এবং সফলতার ধারাবহিকতার নিদর্শন। এভাবে ব্যক্তি জীবনেও জ্ঞানের চর্চা ও সফলতা সম্ভব। কারণ জ্ঞানের কাঝে মরণও হার মেনে যায়। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। অন্যান্য প্রাণীর উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এসেছে মানুষের জ্ঞানের কারণেই। জ্ঞানের কারণেই মানুষ ভাল থেকে মন্দকে পৃথক করতে শিখেছে। ব্যর্থতা এবং সফলতার মাঝে পার্থক্য করতে পেরেছে।

এছাড়া মানুষের মাঝেও যারা জ্ঞানবান তারা অন্যান্য সাধারণ মানুষ অপেÿা উত্তর এবং শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান হচ্ছে উন্নতির মূলমন্ত্র। জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজেকে যেমন- সকলের মাঝে শ্রেষ্ঠ করে তোলেন তেমনি তার অবদান দেশ, জাতিকে করে সমৃদ্ধ। আর তাই মহান আjøাহ্তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করে সর্বাগ্রে জ্ঞানদান করেন। জ্ঞানার্জনের প্রতি শুiæত্ব-আরোপ করতে গিয়ে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর কোরআনের প্রথম বাণী নাযিল করেন “ইকরা” অর্থাৎ পড়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, “জ্ঞানার্জনের জন্য সুদূর চীনদেশে যেতে হলে যাও।” যে জাতি যত বেশী জ্ঞানবান এবং জ্ঞানচর্চায় উৎসাহী সে জাতিও তত বেশী উন্নত। যেমন- জাপান। জাপান বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। এমনকি আমেরিকানরা সারাবিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে কারণ তারা জ্ঞানে, পরিশ্রমে সবার চেয়ে অগ্রগামী। সুতরাং, ব্যক্তি জীবনেও জ্ঞানচর্চার সফলতার কথা অনস্বীকার্য। তবে একটি বিষয় না উjøখ করলেই নয়, আর তা হচ্ছে জ্ঞানচর্চার উৎস হিসেবে শুধু পাঠ্য পুস্তক, বই ইত্যাদিকে বিবেচনা করলে চলবে না। কারণ জ্ঞান অর্জন চারপাশের পরিবেশ পরিস্থিতি, মানুষজন, আচার-অনুষ্ঠান সবকিছু থেকেই করার সুযোগ আছে। আর তাই হয়তো Wren and Martin's High School English Grammar and Composition- এ বলা হয়েছে যে, "We can acquire a great deal of knowledge from books. But it is only second hand knowledge."

সুতরাং, পাঠক আমাদের যার যতটুকুই সামর্থ্য আছে ততটুকু নিয়েই আমরা যেন, জ্ঞানচর্চার ধারাকে অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হই। আমাদের সাফল্য অবশ্যই সুনিশ্চিত। কারণ জ্ঞান মানুষের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠান জন্য অফুরন্ত শক্তি হিসেবে কাজ করে। জ্ঞানের এই সীমাহীন শক্তি কথা মনে নেই। জ্ঞান সাধনারও শেষ নেই। আশা করি, পাঠক তার জীবনের সফলতার ধারাকে মসৃন করতে জ্ঞানচর্চার বিষয়টির শুiæত্ব উপলব্ধি করবেন।

৯। জীবনের লÿ্য স্থির কiæনঃ

জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য জীবনের লÿ্য স্থির থাকাটাও বিশেষ জiæরী। কারণ জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলার জন্য জীবনের লÿ্য স্থিরকরণ একান্তই প্রয়োজনীয়। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, "An aimless life is like a boat without a rudder." অর্থাৎ উদ্দেশ্যহীন জীবন আর হালছাড়া নৌকা একই অর্থে তুলনীয়। লÿ্য স্থির রাখলে মানুষ সেভাবে নিজেকে পরিচালিত করতে পারে। কারণ এই পৃথিবীতে অসংখ্য পেশা আছে, নেশা আছে। কিন্তু একজন মানুষের পÿে সব পেশায় নিবেদিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই সেÿেত্রে উচিত হচ্ছে নিজের iæচি, ইচ্ছা, সামর্থ্য অনুযায়ী যেকোনও একটি নির্দিষ্ট পেশার প্রতি-আত্মমগ্ন থাকা। তা না হলে জীবনে অনেক সমস্যা হতে পারে। আর সেÿেত্রে সফলতা লাভ করাতো দূরের কথা। এখানে হয়তো অনেকেই প্রশ্ন উঠাতে পারেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশে আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেÿাপটে লÿ্য স্থির করে এগোতে গেলে মানসিক কষ্টে নিপতিত হতে হয়। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে,

অনেকের জীবনে লÿ্য থাকে ডাক্তার হওয়ার। কিন্তু সিট সমস্যা, মেধা যাচাই বিভিন্ন কারণে সে ডাক্তারী পড়তে সুযোগ পেল না। আবার কারও হয়তো ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার শখ, শিÿাবিদ হওয়ার ইচ্ছা ইউনিভার্সিটিতে পড়া লÿ্য কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাদের জীবনের প্রারম্ভিক লÿ্য অর্জিত হয় না। কিন্তু তারপরেও আমি পাঠককে বলতে চাই জীবনে লÿ্য সুনির্দিষ্ট থাকাটা বিশেষ জাiæরী। কারণ লÿ্য স্থির না থাকলে জীবনে সফলতা অর্জন, প্রতিষ্ঠা লাভ এগুলো আরও বিলম্বিত হয়, সমস্যার সম্মুখীন হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি গন্তব্যস্থল ঠিক না করে অগোছালোভাবে পথ চললে কেবল পথ হাঁটাই সার হয়, গন্তব্যস্থলে পৌছান যায় না। বিশাল সমুদ্রে aªæবতারাকে লÿ্য করে নাবিকরা পাড়ি জমায়। তেমনি আমাদেরকেও লÿ্য স্থির করে জীবনের পথে অগ্রসর হতে হয়। তাহলেই সাফল্য লাভের আশা থাকে।

আমরা এই মহা বিশ্বের দিকে দৃষ্টি নিÿেপ করলে দেখতে পাব যে, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ, নÿত্র প্রভৃতি একটি সুনির্দিষ্ট লÿ্যকে কেন্দ্র করে, একটি সুনির্দিষ্ট কÿপথে আবর্তিত হচ্ছে। একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব যে, যদি গ্রহ-নÿত্র, চন্দ্র-সূর্যের যদি সুনির্দিষ্ট গতিপথ, সুনির্দিষ্ট লÿ্য না থাকতো তাহলে হয়তো নিজেদের মাঝে সংর্ঘষ লেগে এই মহাবিশ্বই ধ্বংসের সম্মুখীন হতো। সুতরাং, আমাদের অবশ্যই উচিত নিজেদের ইচ্ছা, iæচি, সামর্থ্য অনুযায়ী লÿ্য স্থির করে জীবনে অগ্রসর হওয়া। ছোটবেলা থেকেই লÿ্য স্থির করা বিশেষ জাiæরী। আর এÿেত্রে পিতা-মাতা, ভাইবোন, শিÿক সবাই পরামর্শ দিতে পারেন, উপদেশ দিতে পারেন, সাহায্য করতে পারেন। কারণ ছোটবেলায় শিশুদের মন থাকে অপরিপক্ক, অভিজ্ঞাতা থাকে অপরিণত। সেজন্য তাদের প্রতিভা অনুযায়ী লÿ্য স্থির করণে কিছুটা সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে থাকে। তাই পাঠক, অসুন আমরা জীবনে লÿ্য স্থির করি, সেই অনুযায়ী পরিশ্রম করি, অধ্যবসায় চালিয়ে যাই। অবশ্যই আমরা সফল হবো। আর এই বিষয়টির গুiæত্ব উপলব্ধি করেই হয়তো কবি বলেছেন-

"সংসার সিন্ধুতে aªæবতারা সমস্থির লÿ্য চাই,
লÿ্যবিহীন জীবনতরণী কূল নাহি কভু পায়।"

১০। জীবনে শৃঙ্খলাবোধ বজায় রাখুন ঃ

জীবনকে সুষ্ঠু বিকাশের মাধ্যমে সফল করে তোলার জন্য শৃঙ্খলাবোদের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। মানুষের জীবনকে কঠোর সাধনায় গড়ে তুলতে হয়। ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন, জাতীয় জীবন সর্বত্রই প্রয়োজন কঠোর শৃঙ্খলা। বর্তমানে আমাদের সমাজের সর্বত্র মূল্যবোধের চরম অবÿয় চলছে, সেই সঙ্গে সর্বত্র মানুষের স্বেচ্ছাচারিতার ছাপ সুস্পষ্ট। আর এর মূলে রয়েছে, ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে অসচেতনতা। মানুষের কার্যকলাপের উপর কোনও প্রকার নিয়ন্ত্রণ না থাকলে যে অনাচার, অব্যস্থার সৃষ্টি হয় তা যেমন ব্যক্তিজীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে পারে তেমনি তা একটি জাতিকেও ধ্বংসের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। একটি সমাজে ভালমন্দ সব ধরণের মানুষ থাকে। দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা, প্রাবল্য সব সময়ই বেশী থাকে একটি সমাজে। পারস্পরিক হিংসাবিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, জটিলতা, সংকীর্ণতা, কুটিলতা সবই থাকে সমাজে। এসব বিষয়গুলো উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে যদি না শৃঙ্খলাবোধের সঠিক চর্চা না হয়। আর এর প্রভাব যেমন- ব্যক্তি জীবনে পড়তে থাকে তেমনি রাষ্ট্রীয় জীবনও হতে থাকে বিপর্যস্ত। এমনকি শৃঙ্খলাবোধের অভাবে ধর্মীয় চেতনারও অবলুপ্তি ঘটতে থাকে।

শৃঙ্খলাবোধ বলতে আমরা কি বুঝি? শৃঙ্খলা বলতে বুঝায় নিয়ম-কানুনের প্রতি আইনগত্য এবং তথা সঠিকভাবে অনুসরণ করাকে। শৃঙ্খলাবোধ না থাকলে জীবনের সুন্দর বিকাশ ব্যাহত হয়। আর জীবনে সফল হওয়ার জন্য শৃঙ্খলাবোধের বিশেষ প্রয়োজন। কারণ শৃঙ্খলাবোধ মানুষের জীবন, সমাজ, দেশ তথা একটি জাতির জীবন প্রক্রিয়ার এমন একটি অপরিহার্য ব্যাপার যা কি না সব কিছুকেই সফলতর চরম লÿ্যে পৌছাতে সাহায্য করে। মানব জীবন গতিময় জীবনে চলার পথে সংকট, কুটিলতা থাকবেই। সাময়িক ভাবে সব সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য অনেকেই বিশৃঙ্খল জীবন-যাপন অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। আমাদের চারপাশের জীবন-যাপন লÿ্য করলে আমরা দেখব যে অল্পবয়সী ছেলে-মেয়ে যাদের ছাত্র জীবন চলছে তারা ছাত্র জীবনের শৃঙ্খলা মানতে চাইছে না। পেশাগত জীবনেও অনেকেই আছেন যারা নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ

করতেই বেশী পছন্দ করেন শুধুমাত্র সাময়িক লাভের কথা মনে করে। এতে হয়তো অনেকেই সফলতা অর্জন করেছেন বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু সাময়িক সফলতার জন্য জগৎ সংসারের সিস্টেমের মাঝে অসঙ্গতি আনয়ন করা মোটেই কাম্য নয়। ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন সর্বযে়ত্রে শৃঙ্খলাবোধের ব্যাপাক চর্চা শুiæ করতে পারে। শিÿা প্রতিষ্ঠান, কর্মযে়ত্র, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সর্বযে়ত্রে শৃঙ্খলাবোধের চর্চার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। আমি পাঠককে বলতে চাই, শৃঙ্খলাবোধের চর্চা করলে আপনি লাভবানই হবেন, সফলই হবেন। শৃঙ্খলাবোধের চর্চা চালিয়ে গেলে হয়তো প্রথমে কষ্ট হতে পারে, মনে হতে পারে জীবন বাঁধা পড়ছে বাঁধা নিষেধের বেড়াজালে। কিন্তু একসময় শৃঙ্খলার চর্চা চালিয়ে গেলে তখন মনে হবে একটা সুন্দর সিস্টেমের মধ্যে জীবনটা অতিবাহিত হচ্ছে। তখন সেই সিস্টেমের মাঝে জীবনের সমস্ত্ম কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে। ফলkÖæতিতে জীবনে সফলতা অর্জন খুব একটা কঠিনতর হয়ে উঠে না। তাই পাটক নিজে শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে সচেতন হোন, অন্যদেরকেও শৃঙ্খলাবোধের সুফল সম্পর্কে অবহিত কiæন এবং অন্যদের শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে সচেতন কiæন, উৎসাহিত কiæন।

১১। নিজের সুপ্ত প্রতিভাবে বিকশিত কiæন ঃ

প্রতিভা বলতে আমরা কি বুঝি? প্রতিভা বলতে বুঝায় প্রখর বৃদ্ধি, উদ্ভাবনী কৌশল এবং জ্ঞান, অপূর্ব মেধা শক্তি ইত্যাদির যখন সঙ্গতিসম্পন্ন সমন্বয় ঘটে কারও মাঝে। প্রতিভা এমন একটি গুণ বা শক্তি যার যাহায্যে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা যায়। প্রতিভাবনা ব্যক্তি নিজের জীবনকে গৌরবান্বিত করতে পারেন, সফল করতে পারেন সেই সঙ্গে অন্যের জীবনে, সমাজে বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমাদের চারপাশে আমরা বহু প্রতিভাবান সফল মানুষদের দেখতে পাই। যেমন- কেউ একজন কর্মযে়ত্রে বিস্ময়কর কোন আবদান রাখলে আমরা বলব সে কর্মযে়ত্রে তার প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে। কোনও শিÿার্থী যদি চমৎকার রেজাল্ট করে পরীÿায় তখন অবশ্যই বলতে হবে যে, শিÿার্থীর জীবনে আছে প্রতিভার স্পর্শ। তেমনিভাবে একজন কবি, চিত্রকর, সঙ্গীতশিল্পী, খেলোয়াড়, অভিনেতা-অভিনেত্রী সবারই রয়েছে বিশেষ বিশেষ প্রতিভা। ব্যক্তিজীবনও আমরা এযে়ত্রে পর্যালোচনা করতে পারি। খুব সুন্দর করে কথা বলা, মানুষের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করা, ভালভাবে সংসার করা অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেকটি কাজে, প্রত্যেকটি যে়ত্রে প্রতিভার স্বাÿর রাখা সম্ভব। প্রতিভাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে সম্ভব সফল হওয়া। তবে কারো মাঝে শুধু প্রতিভা থাকলেই হয় না, প্রতিভাকে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন পরিশ্রম এবং সাধনা। আর এই বিষয়টির প্রতি গুiæত্ব আরোপ করতে যেয়ে প্রখ্যাত মনীষী ভলতেয়ার বলেছেন, “প্রতিভা বলে কোনও জিনিস নেই। পরিশ্রম কর, সাধনা কর, প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে।” প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস আলভা এডিসন বলেছেন, “প্রতিভা একভাগ প্রেরণা আর নিরানব্বই ভাগ কঠিন পরিশ্রম।” সুতরাং, প্রতিভার অবদান বেশী না পরিশ্রম বা সাধনার অবদান বেশী এ ব্যাপারে যথেষ্ট অবকাশ থাকলেও একটি বিষয় উcjøখ না করলেই নয় আর তা হচ্ছে প্রতিভা ও সাধনার মধ্যে সমন্বয় সাধন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজiæল ইসলামের ছিল বিস্ময়কর প্রতিভা। কিন্তু তাদের সাধনাও ছিল অপরিসীম। আরেকটি বিষয় উcjøখ না করলেই নয় আর তা হচ্ছে যে কেউ সাধনা করলেই রবীন্দ্রনাথ বা নজiæল হওয়া সম্ভব নয়। সাহিত্যের নমুনা হয়তো দেখানো সম্ভব কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, নজiæল হওয়া প্রতিভা ছাড়া অসম্ভব। তবে নিজের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রয়োজন আত্মসচেতনতা। অনেক মানুষের জীবনেই হয়তো মেধা এবং প্রতিভা নামক অনেক সম্ভাবনা বিরাজ করে। কিন্তু প্রতিভাকে বিকশিত করে সাফল্যের পত্র পjøবে সুশোভিত জীবন অর্জন করতে গেলে অবশ্যই প্রয়োজন চেষ্টা, সাধনা। প্রতিভার সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমেই সম্ভব প্রতিভার মাধ্যমে সঠিক সফলতা অর্জন। তাই পাঠক নিজের প্রতিভা সম্পর্কে নিজে সচেতন হোন। প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর জন্য সঠিক পরিচর্যা চালিয়ে যান। আপনার সাফল্য অবশ্যই সুনিশ্চিত।

১২। আত্মবিশ্বাসী হউন ঃ

একজন মানুষের জীবনে সাফল্যের গতিকে তৃরান্বিত করতে গেলে যে গুণটি না থাকলেই নয় তা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। নিজের উপর বিশ্বাস থাকলে তা একজনের জন্য শক্তি হয়ে কাজ করতে পারে। আমাদের চারপাশে আমরা বহু প্রতিভাবনা

মানুষদের দেখতে পাব। তাদের কেউ জীবনী সফল হয়েছেন কেউ বা হননি। যারা সফল হয়েছেন তাদের জীবনে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, তারা সবাই প্রচন্ড মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। অনেক সময় আত্মবিশ্বাস যোগ্যতা, প্রতিভা, গুণ ইত্যাদিকেও বাড়িয়ে দিতে পারে বহু বহু গুণ। ছাত্রজীবনে আত্মবিশ্বাসের গুiæত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে যে ছাত্র প্রথমে পাঠসংক্রান্ত্ম কিংবা যে কোনও বিষয়বস্তু সংক্রান্ত্ম কিছুই বুঝতে পারে না তখন তার সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রচন্ড মাত্রায় আত্মবিশ্বাস। তাকে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে যে, সে পড়ালেখায় ভাল করবে, জীবনে সফলকাম হবে। ইতহাসের পাতা উল্টালেই আমরা আত্মবিশ্বাসের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারব। যেমন- আমাদের মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ), গৌতম বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ সত্যের বাণী প্রচারের ÿেত্রে মনে-প্রাণে বিশ্বাসী ছিলেন তাদের উদ্দেশ্যর ÿেত্রে। তারা মানব জাতিকে উদ্বুদ্ধ করছেন সত্য বিশ্বাসে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য। আর আত্মবিশ্বাস সেÿেত্রে তাদের জন্য ইতিবাচক প্রভাবক হিসাবে কাজ করেছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা আত্মবিশ্বাসের তাৎপর্য আরও ভালভাবে বুঝতে পারব। যেমন- স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট eªæস, ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ডের সঙ্গে বারবার যুদ্ধে পরাস্ত্ম হয়েও থেমে থাকেননি। তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, তিনি যুদ্ধে জয়ী হবেন। পরিশেষে তিনি তাই হয়েও ছিলেন। আত্মবিশ্বাসের জোর তাকে শেষ পর্যন্ত্ম জয়ী করেছে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ চিরস্মরণীয় অর্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর নেপোলিয়ন আত্মবিশ্বাসের বলে বলীয়ান ছিলেন বলে অত্যন্ত্ম দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে গেছেন।

পরিশেষে তিনি ফরাসী জাতির ভাগ্য বিধাতা হতে পেরেছিলেন। বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, তিনি একটি সঠিক বৈদ্যুতিক বাতি তৈরী করতে পারবেন। আর এই আত্মবিশ্বাসই তাকে তার গবেষণার ÿেত্রে দশ হাজার বার ব্যর্থতার পরও এগিয়ে নিয়ে গেছে। বিজ্ঞানী জগদীসচন্দ্র বসু বহুকাল গবেষণা করে উদ্ভিদের চেতনাশক্তি ও স্পনদন সম্বন্ধে তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। তার মতামতকে অনেকেই অগ্রাহ্য করেছিল। কিন্তু তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন তার গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর। আর সে কারণেই তিনি এক সময় বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। কলম্বাস আত্মবিশ্বাসী ছিলেন বলেই আমেরিকা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তেমনিভাবে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আইরিশ নাট্যকার জর্জ বার্নাডশ, গণতন্ত্রের প্রবক্তা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন, জ্যোর্তিবিদ গ্যালিলিও, বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক মার্কনী সবাই জীবনে ছিলেন সফল এবং তাদের সাফল্যের ধারক-বাহক ছিল প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস। সুতরাং পাঠক আমাদের উপলব্ধিতে আনতে হবে যে, হতাশা মানব জীবনের ধর্ম নয়। আর যাদের আত্মবিশ্বাস আছে তার কখনই হতাশাগ্রস্ত্ম হয় না। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তারা পরিশ্রমের গুণে জীবনে মহৎ কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। আত্মবিশ্বাস মানুষকে তীÿèবুদ্ধি, বিচার ÿমতা, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি লাভ করতে সাহায্য করে। আর একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষই কেবল পারেন কর্ম ও নিষ্ঠা দিয়ে পৃথিবীর বুকে কীর্তি স্থাপন করে অমরত্ব লাভ করতে। আত্মবিশ্বাসের শক্তি অপরিসীম, এক এবং অদ্বিতীয় আত্মবিশ্বাস একটি বুদ্ধি সম্পন্ন মানসিকতা যা কিনা মনকে সুনিপুণ করে, মনকে ধ্বংসের হাত থেকে রÿা করে। সুতরাং, আসুন পাঠক আমরা আত্মবিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে শ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে সামনে এগিয়ে যাই। আমাদের জীবনে সাফল্য আসবেই।

১৩। স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা কiæন ঃ

ইংরেজীতে একটি কথা আছে,

"God helps those who help themselves."

অর্থাৎ নিজের প্রচেষ্টার মধ্যেই জীবনের সফলতা নির্ভর করে। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই এই পৃথিবীতে। সুতরাং আমাদের সবারই উচিত স্বাবলম্বী হওয়া। অন্যের উপর নির্ভর না করে নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়ানোর নামই স্বাবলম্বন। এই পৃথিবী একটি কর্মশালা। সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেককে জ্ঞান বিদ্যা-বুদ্ধি এবং কার্যসম্পাদনের ÿমতা দিয়েছেন। সুতরাং, জগতে নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে চলতে হয়। যারা আত্মনির্ভরশীল, তারা আপন মন ও দেহকে অনন্ত্ম শক্তির উৎস মনে করে সংসারে একাকী চলতে পারেন। তাদের অদম্য উৎসাহ এবং নির্ভীকতার নিকট পাহাড়সম বাঁধাও দূর হয়ে যায়। জগতে সাফল্য লাভের একমাত্র দ্বারই স্বাবলম্বন। স্বাবলম্বন উন্নতির দ্বার সবসময়ই উন্মুক্ত করে দেয়। মহানবী

হযরত মুহম্মদ (সা:) নিজে মুসলমানগণকে স্বাবলম্বন শিÿা দিয়েছেন। একবার এক ভিখারী হযরত মুহম্মদ (সা:) এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাকে যা সাহায্য করলেন সেটা দিয়ে ভিখারী একটি কুঠার কিনল। হযরত মুহাম্মদ (সা:) ভিখারীকে কুঠার দ্বারা কাঠ কেটে তা বিক্রি করে আহার সংগ্রেহের উপদেশ দিলেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও আমরা স্বাবলম্বনের উদাহরণ খুঁজে পাব। মোঘল সম্রাট আকবরের নাম ইতিহাস বিখ্যাত। তিনি কৈশোর বয়সেই যুদ্ধÿেত্রে তার পিতার সাথে এবং সেনাপতি বৈরাম খাঁর সাথে সৈন্য সামন্তম পরিচালনা করে হাতে কলমে যুদ্ধ ÿেত্রে যুদ্ধ করা শিখেছিলেন। তাই পরবর্তী জীবনে এই বিষয়টি তাকে সাম্রাজ্যের পরিচালনা কার্যে সহায়তা করেছিল। বর্তমান বিশ্বে আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া জ্ঞানে-গুণে, ধনে, জনে, মানে, শিল্প, শিÿা, সাহিত্যে উন্নতি, সাফল্যের চরম শিখরে অবস্থান করছে। এর মূলে কিন্তু রয়েছে স্বাবলম্বন। তাই স্বাবলম্বন যেমন একদিকে ব্যক্তিকে বড় করে তেমনি দেশ ও জাতিকেও বড় করে। শৈশব থেকেই স্ববলম্বন শিÿা করতে হয়। অন্তমত সেই শিÿা দেয়া সন্তমানদের জন্য মঙ্গলজনক।

কারণ শৈশব থেকে যদি মানুষ অন্যের উপর নির্ভর করতে শেখে তাহলে তা অভ্যাসের অন্তর্র্নিহিত গুণাবলীর উন্মেষ ঘটায়। যথাযোগ্য লালন-পালনে তা ফলপ্রসূ হয়ে উঠে। ফলে, চরিত্রে দৃঢ়তা আনে, নিজের উপর বিশ্বাস আসে, বাঁধার সম্মুখীন হতে ভয় করে না। আর এভাবে সাফল্যের পথই প্রশস্তম হয় মাত্র। তবে আমাদের চরিত্রে সাংঘাতিক দীনতা রয়েছে। আমরা কখনই অন্যের উপর নির্ভরশীলতাকে লজ্জার বিষয় বলে ভাবি না। কিন্তু স্বাবলম্বন ব্যতিরেকে কখনই আত্মোন্নতি সম্ভবপর নয়। জীবনের উন্নতির পথে ব্যক্তি সাফল্য নির্ভর করে প্রচেষ্টার উপর। আমাদের আত্মোন্নয়ন ঘটবে তখনই যখন আমরা আমাদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন হবো, সর্বোপরি স্বাবলম্বী হবো। সুতরাং, পাঠক আসুন স্বাবলম্বী হই। আমাদের জীবনে সাফল্যের তরী অবশ্যই তীরে ভীড়বে। সেই সঙ্গে আমাদের চার পাশের সবাইকে স্বাবলম্বী হতে উৎসাহিত করি। স্বাবলম্বন আমাদের সবাইকে সফল কiæক এই হোক আমাদের কামনা।

১৪। অলসতা পরিহার কiæন ঃ

পরিশ্রমের প্রতি আগ্রহের অভাব, উদ্যোগের অভাব, সর্বোপরি কাজে আত্মনিয়োগ না করার ব্যাপারে অনেকের যে প্রবণতা থাকে তাকে অলসতা বলে অখ্যায়িত করা যায়। কোনও একটি কাজ করার পর ফলপ্রসূ সম্ভবনা রয়েছে, কাজ করার অনুকূল পরিবেশও রয়েছে। কিন্তু কাজ করার ব্যাপারে রয়েছে প্রচন্ড অনিচ্ছা, অনীহা। আর এই অলসতার পরিণাম অত্যন্তম ভয়াবহ। জীবনে সফলতার স্বাদ আস্বাদন করাতো দূরের কথা বরং যোগ্যতা থাকলেও অলসতা মানুষের জীবনকে অচল করে দেয়, প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায়। মেধার অপচয় হয়। জীবন থেকে উচ্চাশা, আকা•ÿা সবই নষ্ট হয়ে যায়। শুধু তাই নয় সম্পদ বিনষ্ট হয়, দরিদ্রতা স্পর্শ করে জীবনকে। প্রবাদ আছে, “অলস মস্তিমস্ক শয়তানের আড্ডাখানা।” কারণ আমরা জানি আলস্য মানুষের জীবনের সকল সম্ভাবনা দূর করে দেয়। মানুষকে করে কর্ম বিমুখ। অথচ কাজের মাঝেই মানব জীবনের সফলতার বীজ নিহিত থাকে। মানুষ তার কাজের মাধ্যমে কৃতিত্বের স্বাÿর রাখে। জীবনকে সফল করার জন্য দরকার কাজের। কর্মই জীবন একথা মনে রেখে মানুষ প্রতিনিয়ত নিজেকে কর্মে নিয়োজিত রাখে। কিন্তু জীবনে যদি আলস্য প্রাধান্য পায় তাহলে মানুষ কর্মজীবন থেকে বঞ্চিত হয়। কাজের মাধ্যমে জীবনকে মুখরতার পরিপূর্ণ করার সুযোগ থাকে এবং জীবনকে সফলতার পরিপূর্ণ করারও সুযোগ থাকে অনেক। অলসতা অনেক সর্বনামের প্রেরণা যোগায়। আলসেমীতে জীবনের উন্নতির পথও বন্ধ হয়ে যায়।

সবচেয়ে গুiæত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো অলস মানুষ কাজ দেখে ভয় পায়। তার দেহ-মন সবকিছুই থাকে আলসেমীতে ভরা, প্রাণহীন, নিস্তেমজ, নিস্প্রাণ। তবে অলসতা বিষয়টি সম্পূর্ণ মানসিক। মনোভাব দৃঢ় করলেই এর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। প্রত্যেক মানুষকেই তার নিজ জীবনের উদ্দেশ্য, দায়িত্ব, কর্তব্য, সচেতনতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। সে লÿ্য অর্জন করে জীবনে সফলতা অর্জনও জাiæরী মনে রাখতে হবে যে, পরিশ্রম সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। অলস লোক কখনই পরিশ্রম করে না। ফলে সৌভাগ্যের দুয়ারে পৌঁছানো, সফলতার স্বাদ আস্বাদন করা তার পÿে কখনই সম্ভব হয় না। আরেকটি ব্যাপার না উÇjøখ করলেই নয়, সেটা হচ্ছে অলস ব্যক্তির কাছে জীবনের অর্থ কখনই স্পষ্ট হয় না। ছোটবেলা থেকেই অলসতা পরিহার করা শিখতে হবে। ছাত্র জীবনে আলস্য খুবই ÿতিকারক। ছাত্র জীবনেই এই ট্রেনিং হয়ে যাওয়া

আবশ্যক যে, আলস্য পরিহার করার মাঝেই জীবনের সার্থকতা নিহিত। আলসতার ÿতিকর দিক বিবেচনা করে সবাইকে জীবন থেকে আলসেমী দূর করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তি জীবনের কাজ কর্ম এবং সেই কাজকর্মের সফলতার উপরই নির্ভর করে সমাজ, জাতির উন্নতি। ব্যক্তিজীবনকে কর্মমুখর করার জন্য অলসতা পরিহার করা জাiæরী। প্রতিটি মানুষের জীবনে যে সময় চলে যায়, সে সময় আর ফিরে আসে না। সেজন্য অবহেলা বা অলসতা করে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বরং জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগিয়ে জীবনের সাফল্য অনিবার্য করে তুলতে হবে। পৃথিবী আজ অনেক অনেক এগিয়ে গেছে। আমরাও আর পিছিয়ে থাকতে চাই না। আসুন, পাঠক আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, আলস্যবিহীন জীবনই হোক আমাদের প্রধান আদর্শ এবং সফলতার ধারক-বাহক।

১৫। শ্রমের গুiæত্ব উপলব্ধি কiæন ঃ

প্রখ্যাত মনীষী কার্লাইল বলেইল বলেছেন, “আমি মাত্র দু’টি লোককে সম্মান করি, সম্মানের যোগ্য তৃতীয় নাই। প্রথমত, আমার সম্মানের পাত্র ঐ কৃষক এবং শ্রমশিল্পী, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করছেন। দ্বিতীয়ত, আমার সম্মানের পাত্র তিনি, আত্মোন্নতি সাধন করতে নিয়োজিত আছেন, যিনি শরীরে নয়, আত্মার খাদ্য সংস্থানে, জ্ঞান-ধর্ম অনুশীলনে ব্যাপৃত আছেন। এই দুই ব্যক্তিই আমার শ্রদ্ধাভাজন।” এছাড়া কোন একজন প্রখ্যাত মনীষী বলেছেন “ÿণস্থায়ী জীবনটাকে পরিশ্রম দ্বারা যত বেশী পারা যায়, কাজে লাগিয়ে নাও।” আর ইংরেজীতে একটি কথা আছে,-

"Luck is what happens when
Preparation mets opportunity."

অর্থাৎ মানুষের ভাগ্য হচ্ছে প্রস্তুতি এবং সুযোগের সমন্বয়। আর এ প্রস্তুতি হলো নিরলস এবং সুচিন্তিত শ্রমের একটি প্রক্রিয়া। শ্রম দ্বারা সব কিছুই অর্জন করা সম্ভব। পৃথিবীতে সর্ব ধর্মেই শ্রমকে বিশেষ মূল্য দেয়া হয়েছে। আর হাদিসে আছে, “নিশ্চয়ই নিয়তের (পরিকল্পনার) চেয়ে আমল (কাজ) বড়।” সুতরাং, জীবনে সফল হওয়ার জন্য শ্রমের কোনও বিকল্প নেই। জীবনের সকল ÿেত্রেই পরিশ্রমের মর্যাদা অপরিহার্য। পরিশ্রমলব্ধ কর্মের সাফল্যে যে আনন্দ, তা সত্যই নির্মল ও উপযোগী। সুতরাং, মানুষের জীবনে শ্রমের গুiæত্ব অপরিসীম। এটা পরীÿিত সত্য যে, পৃথিবীর যে জাতি যত বেশী পরিশ্রম করেছে, সে জাতি তত বেশী উন্নত ও সম্পদশালী। যে ব্যক্তি যত বেশী পরিশ্রম করেছে, সে ব্যক্তিও তত সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। মানুষ একদিকে যেমন সভ্যতার স্রষ্টা। অন্যদিকে তেমন সে নিজের ভাগ্য নির্মাতা। নিজের ভাগ্যকে মানুষেকে নিজের গড়ে নিতে হয়। আর এ জন্য সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে শ্রম। পরিশ্রম মানুষের ভেতরকার সুপ্ত প্রতিভাবে জাগ্রত করে এবং মানুষকে সফলতার চূড়ান্ত শীর্ষে নিয়ে যায়। মানুষ যা চায় তা পৃথিবীতে বিদ্যমান। তবে তা পেতে হলে শ্রম দিয়ে অর্জন করতে হয়। কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে অনেক মানুষ বিখ্যাত হয়েছে। তাঁরা মানসিক, শারীরিক উভয় প্রকার শ্রমের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আব্রাহাম লিংকন, জর্জ ওয়াশিংটন, আইনস্টাইন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজiæল ইসলাম, এনারা সবাই ছিলেন পরিশ্রমী। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করেছেন। আljøাহ্‌র নবী হয়েও তিনি সব কাজ নিজ হাতে সম্পন্ন করতেন। যুদ্ধ ÿেত্রে তিনি ছিলেন একজন সফল সৈনিক। তিনি কোনও কাজকেই ছোট কাজ মনে করতেন না। তিনি বলতেন নিজের হাতে কাজ করার মতো পবিত্র জিনিস আর নেই। সুতরাং, আমাদের সবারই পরিশ্রমের গুiæত্ব খুব গুiæত্বের সঙ্গে উপলব্ধি করা উচিত। তবে প্রচন্ড দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে শ্রমকে এখনও খুব মর্যাদা দেয়া হয় না। এছাড়া আমরা অনেকেই প্রায় শ্রম বিমুখ। আর এর ফলাফল খুব একটা যে ভাল নয় তার প্রমান হচ্ছে যে আমাদের ব্যক্তি সাফল্য অর্জনের ÿেত্রে আমরা এখনও যথেষ্ট পশ্চাদপদ। এর মূলে কিন্তু আমাদের শ্রমবিমুখতা দায়ী। জীবনের প্রতিটি ÿেত্রে সফলতার জন্য প্রয়োজন শ্রমের গুiæত্ব উপলব্ধি করা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা। শিÿা, কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, সৃজনশীল যে কোনও ÿেত্রে সফলতার জন্য প্রয়োজন শ্রম এবং শ্রমের গুiæত্ব উপলব্ধি করা। তাই আসুন, পাঠক, আমরা শ্রমের গুiæত্ব উপলব্ধি করি এবং সেই সঙ্গে শ্রম দিয়ে জীবনে সফলতার স্বাদ আস্বাদন করি।

পাঠক, আমরা নিজেদের ভেঙ্গে গড়ে তোলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। আর নিজেকে ভেঙ্গে গড়ে তোলার মানসে আমরা আমাদের মাঝে উপরে উjjøখিত গুণাবলীর সমাবেশ ঘটাতে চাই। কিন্তু শুধুমাত্র উcjøখিত গুণাবলীই নয়, আমরা চাইব ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সবখান থেকে ইতিবাচক গুণাবলীর সমাবেশ আমাদের মাঝে যাতে বিকশিত হয় সেদিকেও লÿÿ রাখতে। এছাড়া নিজেকে ভেঙ্গে গড়ে তোলার জন্য যে বিশেষ গুণাবলীর কথা না বললেই নয়, তা হচ্ছে আমাদের আরও প্রয়োজন সাহস। আমরা সাহসী হতে চাই আর পৃথিবী সাহসী মানুষের জন্য। তবে সাহসী হতে যেয়ে কখনও আবার দুঃসাহসী হয়ে উঠা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা যখন আমাদের সম্পূর্ণ নিজেদেরে ভেঙ্গে গড়ে তুলতে পারব, তার পরে আমাদের প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গী বদলানোর। কারণ দৃষ্টিভঙ্গী বদলালে অবশ্যই আমাদের জীবনও বদলে যাবে। পাঠক, আমি এখন আলোকপাত করতে চাই কিভাবে আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে পারি, তার উপর।

দৃষ্টিভঙ্গী বদলান আপনার জীবন বদলে যাবে

আমরা সবাই জীবনে সফল হতে চাই। সফলতার জন্য দৃষ্টিভঙ্গী বদলানো বিশেষ জাiæরী। কারণ একজন মানুষের জীবনে দৃষ্টিভঙ্গী এক বিশেষ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী একজন মানুষের জীবনে যেমন, ব্যর্থতার জন্য দায়ী হতে পারে তেমনি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী একজন মানুষের জীবনে সফলতা আনয়ন করতে পারে। সেÿেত্রে দৃষ্টিভঙ্গী বদলানো বিশেষ জাiæরী। কারণ তাতে জীবন অবশ্যই বদলে যেতে বাধ্য। আমরা আমাদের জীবনকে কিভাবে দেখছি সেটা একটা গুiæত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন যারা জীবনে শুধু অর্থ বিত্ত, টাকা-পয়সাকেই বিশেষ গুiæত্ব দিয়ে থাকেন। অনেকেই জীবনে টাকা-পয়সা, অর্থ-বিত্ত অর্জন করতে না পেরে প্রচন্ড মনঃকষ্টে ভুগতে থাকেন। একসময় জীবনে যা অর্জন করেছেন সেটাও ভোগ করতে পারেন না। তাদেরকে আমি অবশ্যই বলতে চাই তারা যেন দৃষ্টিভঙ্গী বদলান। তাদের জীবন বদলাতে বাধ্য। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উ
jøখ করা প্রয়োজন। আর তা হচ্ছে ধরা যাক আমি আপনাদের দু'টি জিনিস দিতে চাই। একটি হচ্ছে ব্রেইনে ক্যান্সার এবং এক কোটি টাকা। কিংবা বললাম মাইগ্রেশনের ব্যথাসহ কোটি কোটি টাকা আমি আপনাদের দিতে চাই। আপনারা তখন অবশ্যই বলবেন এক টাকাও জীবনে অর্থ বিত্ত, টাকা পয়সা অর্জনেই সফলতার অর্থ নিহিত নয়। সফলতার অর্থ আপনার কাছেই ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে ধরা দেবে যদি আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গী সামন্য বদলে যেতে পারে। যোগ্যতা অনুসারে যার যতটুকু অর্জন সেই ততটুকু হাসিমুখে উপভোগ করম্নন আপনারা সফল হবেনই। এই পৃথিবীতে আমাদের জীবন খুবই অল্প সময়ের। আমাদের বাংলাদেশের প্রেÿাপটে চিন্তা করলে আমরা দেখব যে, একজন মানুষ গড়ে ৬০ বছর বাঁচে। তাঁর মধ্যে প্রায় ৩০ বছর ঘুমিয়ে কাঁটে। দিনে ঘুমালে আরও ৫ বছর চলে যায়। বাকী ২৫ বছরের মধ্যে প্রায় ২০ বছর চলে যায় লেখা-পড়া শিখে, চাকুরী, ব্যবসা, বাণিজ্য করে প্রতিষ্ঠা পেতে। বাকী থাকে মাত্র ৫ বছর। এই ৫ বছর শুধু মাত্র উপভোগের। এই অল্পসময়ের জন্য আমরা শুধু শুধু আর না পাওয়ার বেদনায় ভারাক্রান্ত হতে চাই না। আমরা আমাদের মনের শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগোতে চাই। কারণ মনই সকল শক্তির উৎস। আমাদের পরিপূর্ণভাবে প্রয়োজন মনের চর্চা। মনের সঠিক বিকাশ এবং প্রয়োগ একজন মানুষকে সফলতার চূড়ান্ত শীর্ষে পৌঁছাতে সাহায্য করে। অথচ আমরা সবসময় দেহের চর্চায় ব্যস্ত। মনের চর্চা আদৌ কি আমরা করছি?

ছোটবেলা স্কুল জীবনে শরীর চর্চা ক্লাশেই আমাদের দেহের চর্চা শুiæ হয়। কিন্তু মনের চর্চা আদৌ আমরা করছি না। মনের শক্তিকে বাড়নো সম্ভব এবং মনকে নিয়ন্ত্রন করাও সম্ভব। এছাড়া রাগ, জেদ, ÿোভ ইত্যাদিও একজন মানুষের পÿে যতটা সম্ভব প্রশমন করা সম্ভব। কারণ আপনি রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। রাগের মাতায় কখনই মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে ব্যর্থতার কালো অন্ধকারে। আমাদের কাছে সেটা কখনই গ্রহণযোগ্য কাম্যও নয়। কারণ আমরা আকৃতির মানুষ নয়। প্রকৃত মানুষ হতে চাই। আর প্রকৃত মানুষ হতে গেলে অবশ্যই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা প্রয়োজন। আমরা সবাই আকৃতির ই মানুষ। আমাদের মাঝে প্রকৃত মানুষের সংখ্যা খুব বেশী নয়। এ প্রসঙ্গে কবির ভাষায় বলতে চাই-

"ফুলের বাগান সবার মনেই আছে,
ফুল ফুটাতে সবাই নাহি পারে।"

আমাদের জীবন আসলে ফুলের বাগানের মত। আমরা মনের মাটিতে আকাঙ্ÿার বীজ বুনি তাতে গাছ জন্মায় আমাদের আকাঙ্ÿা রূপ বৃÿ শত শাখায় পত্র পুষ্পে বিকশিত হতে চায়। জ্ঞান ও কার্যে জীবনকে পূর্ণতা দান করতে চায়। চেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবনরূপ বাগানকে ফুলে ফলে ভরে তোলা যায়। পরিশ্রম ছাড়া শুধু স্বপ্ন দিয়ে জীবনকে সুন্দর করার কোনও পথ নেই। জ্ঞান, সেবা, আদর্শ, ত্যাগ, শিÿা মানুষের জীবনকে সুন্দর ও মহৎ করে। এতসব গুণের আকাঙ্ÿা সবারই আছে। কিন্তু সব মানুষ এগুণ গুলোকে সার্থক ভাবে বিকশিত করে তুলতে পারে না। জীবনকে জ্ঞানময় ও পরিপূর্ণ করতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন একনিষ্ঠ চেষ্টা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী।

সুতরাং, পাঠক অবশ্যই দৃষ্টিভঙ্গী বদলান আপনি লাভবানই হবেন, সফলই হবেন।

সাফল্যের গতিকে ত্বরান্বিত করার উপায়

পার্থিব কামনা বাসনায় পরিপূর্ণ আমাদের এ মানবজীবন। প্রাপ্তির প্রত্যাশায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত্ম এখানে চলছে কর্মোদ্যোগ। আর সেই সঙ্গে জীবনে সফল হওয়ার জন্যও মানুষ তাই সাধনা করে চলে নিরন্ত্মর। সাধনা এবং কর্মকুশলতাকে কাজে লাগিয়ে সফল হওয়ার জন্য মানুষ তাই এগিয়ে যায় সম্মুখ পানে। কিন্তু জীবনে সফলতা অর্জন অতটা সহজ নয়। সফলতা অর্জনের প্রয়োজন কঠোর সাধনা। কঠোর সাধনায় জীবনে সাফল্য অর্জিত হলে তার আবেদনই আলাদা। এ প্রসঙ্গে আমি একটি উদাহরণ বলতে চাই। কাঁটার আঘাতে রক্ত ঝরিয়ে কাঁটাবন থেকে গোলাপ ফুল সংগ্রহ করে যে আনন্দ তার তুলনা নেই। কিন্তু যে গোলাপ, নাগালের কাছেই ফুটে থাকে, যাকে যখন তখন হাত বাড়ালেই ছেঁড়া যায় তা হয়ত পরিপূর্ণ আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। তেমনি খুব সহজেই যা লাভ করা যায় তা পেয়ে আনন্দ নেই। কিন্তু প্রচুর পরিশ্রমের মাধ্যমে যা অর্জন করা যায় তা পেয়ে মানুষ দ্বিiæন আনন্দ উপভোগ করে।

আমাদের এ জীবন সংগ্রামে ভরপুর। সাহসী যোদ্ধার মতো জীবন সংগ্রামে যারা অবতীর্ণ হয় তারাই সফলতা অর্জন করতে পারে। তাদের গলায় শোভা পায় বিজয়ের মালা। তারাই হাসতে পারে সাফল্যের হাসি। তবে আমরা সবাই চাইব যেন সাফল্য আমাদের হাতের মুঠোয় ধরা দেয়। সাফল্যের গতিকে ত্বরাণ্বিত করতে চাই আমরা সবাই। তবে আমাদের সবারই সীমাবদ্ধতা আছে। আমাদের সবার যোগ্যতাও সমান নয়। পরিশ্রম করার ÿমতাও সবার সমান নয়। তাই সেÿেত্রে জীবনে সাফল্যের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সাহায্য নিতে পারি।
যেমন-

১. মেডিটেশন চর্চা করা।
২. প্রয়োজনে জ্যোতিষশাস্ত্রের সঠিক দিক-নির্দেশনা নেয়া।
৩. ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা।
৪. হাসি-খুশী থাকার চেষ্টা করা।
৫. আত্মিক নিরাময় লাভ করা।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি আমরা এভাবে আলোকপাত করতে পারি। যেমন-

১) মেডিটেশন চর্চা করা ঃ মেডিটেশনের সার্বজনীন সংজ্ঞাটি হচ্ছে। "সচেতনভাবে মনোযোগ পরিচালনার মাধ্যমে আমাদের সফলতার বিভিন্ন ধাপ পরিবর্তন করা।" প্রকৃত পÿে মেডিটেশন একটি মূল্যবান হাতিয়ার বা কৌশল যার দ্বারা আমরা শিথিলায়নের চরম পর্যায়ে পৌঁছাতে পারি। প্রকৃতপÿে মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে মনের শক্তির সঠিক ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ এবং সেই সঙ্গে মনের শক্তি বাড়ানোর কৌশল মানুষ শেখে। আর তাই তখন মানুষের মনে দুঃখ, দুশ্চিন্ত্মা, ÿোভ, কষ্ট, ক্রোধ এগুলো আসন গেড়ে বলতে পারে না। সেজন্য মানুষ সবসময় উচ্ছ্বল, প্রাণবন্ত্ম থাকে, যা মানুষের জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তোলে বহুগুণ। মেডিটেশন নিয়মিত চর্চায় ব্রেইন ওয়েভের কার্যকারিতা বেড়ে যায়। এছাড়া ব্রেইন ওয়েবের কার্যকারিতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রেইনের বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতাও বেড়ে যায়। বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে দেখা গেছে যে ফলkÖæতিতে মানুষের সৃজনশীলতা বেড়ে গেছে বহুগুণ, নৈতিক চরিত্রের উন্নতি হয়েছে যথেষ্ট এমনকি T.S. এর মাত্রাও যথেষ্ট উঁচু হয়েছে।

এই পৃথিবীতে যত সাধক, মুনি, ঋষি দেখি এছাড়া যত সফল ব্যক্তিত্ব দেখি তাদের বেশীরভাগই কিন্তু মেডিটেশন চর্চা করতেন। যারা মেডিটেশন চর্চা করেন তাদের অভিজ্ঞাতালব্ধ ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, মেডিটেশন মেনটাল স্ট্রেস বা মানসিক চাপকে বহুলাংশে হ্রাস করে। মেডিটেশন করার সময় আমরা যখন আলফা লেভেলে উপনীত হই তখন প্রকৃতপÿে আমরা শিথিলায়নের চরম পর্যায়ে উপনীত হই। তখন আমাদের ব্রেইনের ডানে, বামে, সামনে, পিছনে এই চার অংশ উদ্দীপিত হয়। এ পর্যায়ে ব্রেইন ওয়েবের কার্যকারিতা আমরা যেভাবেই চাইব, সেভাবেই সম্ভব হবে। এটা

সাংঘাতিকভাবে পরীᐧ্যিত যে, মেডিটেশন মানুষকে আত্মপ্রত্যয়ী হতে সাহায্য করে। মানুষের আত্ম-বিশ্বাস বেড়ে যায় বহুগুণ। হতাশাগ্রস্থদের জন্য মেডিটেশন হতে পারে বেঁচে থাকার দুর্লভ প্রেরণা।

এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই চায় জীবনে সফল হতে। আমরা সবাই সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখি প্রতিটি মুহূর্তে। শিᐧ্যাজীবন, চাকুরী, ব্যবসা, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অন্যান্যদের সাথে সম্পর্ক প্রতিটি ᐧ্যেত্রেই আমরা সফল হওয়ার স্বপ্নদেখি। আসলে সফল হওয়ার ব্যাপারটা অনেকটা চ্যালেঞ্জিং। সাধারণত আমরা দেখি বেশীর ভাগ মানুষই হয়তো বিশ্বাস করে যে, তারা কোনও সাফল্য অর্জন করতে পারবে না কারণ তাদের যথেষ্ট প্রাচুর্য নেই, ভাগ্য তাদের সুপ্রসন্ন নয়। কিন্তু একজন মানুষ জানে না তার দ্বারা কতটুকু সাফল্য অর্জন সম্ভব হতে পারে। দরকার এᐧ্যেত্রে বিশ্বাস, পরিশ্রম এবং সঠিক দিক নির্দেশনা। মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে জীবনকে সঠিক দিক নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালনা করা সম্ভবপর। জীবনকে একটা সিস্টেমে নিয়ে আসা সম্ভবপর। জীবনে সাফল্যের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য মেডিটেশনের বিকল্প আর নেই। মেডিটেশন চর্চার জন্য বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ১০৮ টিরও বেশী পদ্ধতি প্রচলিত আছে। আর আমি দীর্ঘ ১৫-১৬ বৎসর গবেষণা করে মেডিটেশন চর্চার জন্য উদ্ভাবন করেছি লাইফ শাইনিং মেথড। যা সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য। আপনি যে পদ্ধতিতেই মেডিটেশন চর্চা কiæন না কেন, যাদুর মতো চোখের পলকে সাফল্য এসে ধরা দেবে না হয়তো ঠিকই। কিন্তু সবধরণের দুঃখ দুর্দশা, রোগ-শোক, অসুস্থতা, সমস্যা নিরাময় হয়ে জীবন একটা সিস্টেমের মধ্য নিয়ে আসা সম্ভব হবে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন সম্ভব হবে। আমরা জীবনের অর্থ নতুনভাবে খুঁজে পাব। আর সাফল্যের গতি অবশ্যই ত্বরান্বিত হবে। কারণ যে কোনও সমস্যার সমাধানের ᐧ্যেত্রে মেডিটেশন চর্চা শ্রেষ্ঠত্ব আনয়নের পথকে সুগম করে।

২) প্রয়োজনে জ্যোতিষশাস্ত্রের সঠিক দিক-নির্দেশনা নেয়া ঃ যদিও যে কোনও কাজে সফলতার জন্য প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি এবং সেই অনুযায়ী পরিশ্রমেই যথেষ্ট তারপরও প্রয়োজনে জ্যোতিষশাস্ত্রের সঠিক দিক-নির্দেশনা নেয়াটা অযৌক্তিক কিছু নয়। কারণ প্রতিটি মানুষের উপরে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতুর প্রভাব পড়ে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে জ্যোতিষ বিজ্ঞানের মতে এই নয়টি গ্রহের অবস্থান প্রতিটি মানুষের হাতেই বিদ্যামান রয়েছে। যাদের প্রভাবে মানব জীবন পরিচালিত হয়। আর সে জন্যই বলা হয়, সুর্য আত্মা, চন্দ্র-মন, মঙ্গল-বীর্য্য, বুধ, বানী, বৃহস্পতি জ্ঞান, শনি সংবেদনার প্রতিনিধিত্ব করে। এই সমস্ত্ম গ্রহ সৌর মন্ডলে নিরন্তর আপন আপন কᐧ্যে ঘুরতে ঘুরতে একমসময় পৃথিবীর চারিদেকে ঘুরে আসে। শিশু যখন মাতৃগর্ভ থেকে প্রথম পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে তখন সে থাকে সমস্ত্ম কিরণমুক্ত। কিন্তু পৃথিবীতে জন্ম নেয়ার পরেই তার উপর বিভিন্ন গ্রহের রশ্মি পতিত হয়। সেই সময় যে গ্রহের রশ্মি ঘণীভূত থাকে সেই গ্রহের প্রভাব সন্তানের উপর সর্বাধিক পড়ে। আর যে সব গ্রহের রশ্মি হালকা ভাবে থাকে, সেসব গ্রহের প্রভাব শিশুর উপর হালকা ভাবে পড়ে। এভাবে সর্বপ্রথম যে গ্রহের রশ্মি শিশুর উপর তীব্রভাবে পড়ে সেই গ্রহের প্রভাব শিশুর উপর সারাজীবন থাকে। জন্মকুন্ডলী বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে তৎকালীন কোন গ্রহের প্রভাব শিশুর উপরে ছিল। সুতরাং, আমরা খুব ভালভাবেই বুঝতে পারছি যে একজন মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব এবং সফলতার জন্যও প্রয়োজন তার জীবনের গ্রহগুলোর শুভদৃষ্টি ও শুভস্থানে থাকার।

সাফল্যমন্ডিত জীবনের জন্য প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন শারীরিক সুস্থাতা, ভাগ্যের প্রবল সহায়তা, সুন্দর-সুখময় দাম্পত্য জীবন, আয়, উপার্জন ক্যারিয়ার, উন্নতি ইত্যাদি। আর এগুলোর জন্য বিভিন্ন গ্রহের অনুকূল প্রভাবের একান্ত্ম প্রয়োজন। কারণ শরীর-স্বাস্থ্য, দাম্পত্য-জীবন, আয়-উপর্জন, ক্যারিয়ার উন্নতি সবকিছুর জন্যই পৃথক পৃথক গ্রহের প্রভাব রয়েছে। এই সমস্ত্ম গ্রহের মধ্যে যে কোনও গ্রহের দুর্বলতা মানব জীবনকে অসফলতায় ভরিয়ে তুলতে পারে, নেমে আসতে পারে জীবনে ভীষণ ব্যর্ততা ও হতাশা।

যেমন- রবির অশুভ প্রভাব প্রড়লে যে কোন সর্বনাশ ঘটতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যে ধস্ নামতে পারে। চন্দ্রের অশুভ প্রভাব পড়লে মানুষ শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে যেতে থাকে এবং মন-মানসিকতায় অস্থিরতা পরিলᐧ্যিত হতে থাকে। মঙ্গল গ্রহের অশুভ প্রভাব পড়লে গেহে, মনে, প্রাণে বিভিন্ন অমঙ্গল যতসব ঘটনা ঘটতে থাকে। পাওয়ার চেয়ে চাওয়ার বেদনা বেশী হয়। বুধের অশুভ প্রভাব পড়লে প্রেম ভালবাসায় সৌহার্দের ভাটা পড়ে।

শনির অশুভ প্রভাব থাকলে যে কোন ওসময় যে কোন মানুষের যে কোন সর্বনাশ ঘটে। রাহুর অশুভ প্রভাবে সংসারে চরম সর্বনাশ ডেকে আনে। কেতুর অশুভ প্রভাবে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শান্তি বিপন্ন হয়। নয়টি গ্রহের মধ্যে প্রথম সাতটি গ্রহ মানব জীবন বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ ভাবে পরিচালনা করে থাকে। সুতরাং আমরা সহজেই বুঝতেই পারছি যে, যে কোনও গ্রহের অশুভ প্রভাব মানুষের জীবনে সফলতাকে পশ্চাদপদ করতে পারি। তাই গ্রহের অশুভ প্রভাব থেকে রÿা পাওয়ার জন্য আমরা জ্যোতিষশাস্ত্রের সঠিক দিক নির্দেশনা নিতে পারি। জ্যোতিষশাস্ত্রের যারা অভিজ্ঞ তারা মানুষের বার্থচার্ট নিয়ে গবেষণা করে থাকেন। প্রয়োজনে হরোস্কোপ করেন। মানুষের জন্মতারিখ, চেহারা, হাতের রেখা, মাউন্ট এগুলো পরীÿা-নিরীÿা করে গ্রহ-নÿত্রের প্রভাব সম্পর্কে উÌøখ করেন। প্রয়োজন বোধে সঠিক দিক নির্দেশনা দেন। কিংবা প্রয়োজন বোধে সঠিক রত্ন পাথর ব্যবহজার করতে বলেন। কাজেই জীবনে সাফল্যের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য কিংবা জীবনে সফলতাকে আনয়ন করার জন্য আমরা অবশ্যই জ্যোতিষশাস্ত্রের সঠিক দিক-নির্দেশনা নিতে পারি। এতে দোষের কিছুই নেই। তবে এÿেত্রে জ্যোতিষশাস্ত্রের যিনি অভিজ্ঞ তার পরামর্শ নেয়াটা একান্ত জাiæরী।

৩) ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা ঃ এই পৃথিবীতে সুখ-দুঃখ, সাদা-কালো, আলো-আন্ধকার, জন্ম-মৃত্যু, ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, সৎ-অসৎ, ক্রোধ-অসহিষ্ণুতা, ÿমা-প্রতিহিংসা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রভৃতির সহাবস্থান। এখানে সুখ যেমন চিরন্তন, দুঃখও তেমনি নিত্য। এরই মাঝে জীবনে সফলতা অর্জন করতে হয়। আর আমাদের প্রত্যেকের কাছেই সফলতা একান্তভাবে কাম্য। আর এজন্য আমাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ গুiæত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ এই জগতে বিরাজিত সীমাহীন দুঃখের মাঝেও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী মানুষকে চলার পথ দেখায়। ম্যাক্সিম গোর্কি বলেছেন, "দুঃখ-কষ্ট হলো এ জগতের চরম লজ্জা তাকে রোমাঞ্চকর দেখার মাঝে নেই কোনও সার্থকতা। মানুষ প্রতিমুহূর্তের সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ঘটাতে পারে তার বিলোপ।"

অর্থাৎ এই জগতে পথ চলতে গেলেই বাঁধা-বিঘ্ন এসে আমাদের পথরোধ করে দাঁড়ায়। তখন স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মাঝে নেতিবাচক চিন্তা এসে ভর করে। নেতিবাচক কথাবার্তা এবং চিন্তার মানসিক ও দৈহিক প্রভাব বলে শেষ করা যাবে না। যেমন- নেতিবাচক কথাবর্তা এবং চিন্তর কারণে একজনের শিÿাজীবন, কর্মজীবন সম্পূর্ণই ব্যর্থ হতে পারে। কেউ যদি কোনও কাজের শুiæতেই ভেবে থাকে, "আমার দ্বারা এ কাজ সম্ভব না।" "আমাকে এত বড় দায়িত্ব দিও না।" "কিংবা পরীÿায় খারাপ রেজাল্ট করার জন্য কারও বাবা মা যদি বলে "তোর দ্বারা আর কিছু সম্ভব না।" তাহলে তার জীবন অবশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। জীবনে চলার পথে সংকটের মুখোমুখি হয়ে মানুষ যদি ধৈর্যহারা হয়ে নেতিবাচক কথা এবং চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে সেই সংকট ত্বরান্বিতই হবে। সাফল্যের গতি হবে মন্থর এবং একসময় তা থেমে যাবে। কিন্তু জীবনে সাফল্য অর্জন করতে গেলে অবশ্যই আমাদের নেতিবাচক চিন্তাকে পরিহার করে ইতিবাচক চিন্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ, আমরা জানি ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে-

"Where is life, there is hope."

অর্থাৎ এই দুঃখপূর্ণ জগতের চালিকাশক্তি হচ্ছে আশা। আশা জীবনকে চিরচঞ্চল করে রাখে তাই অবশ্যই আমাদের ইতিবাচক মনোভাব সম্পন্ন হওয়া উচিত। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের দুঃসময়ের বন্ধু, অন্ধকারচ্ছন্ন পথের আলোক বর্তিকা, অন্ধকার জীবনের aªæবতারা। তাই পরিশেষে বলতে চাই, সৃষ্টির শুiæ থেকে জীবনকে সুন্দর ও সফল করার যে সাধনায় মানুষ নিজেকে সমর্পণ করেছে তা সফল করার জন্য ইতিবাচক কথা এবং চিন্তার কোনই বিকল্প নেই। তাই পাঠক আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, এই মুহূর্ত থেকে আমরা ইতিবাচক মনোভাব কে বিশেষ গুiæত্ব দিব এবং সেই অনুযায়ী জীবনকে পরিচালিত করতে সচেষ্ট হবো।

৪) হাসি-খুশী থাকার চেষ্টা করা ঃ মানব জীবন বৈচিতময়। বিচিত্র বাধার প্রাচীর পেরিয়ে মানুষ এগিয়ে যেতে হয়। বাঁধাহীন জীবন কোন জীবন নয়। হাসি-কান্না, দয়া দাÿিণ্য, বিরহ-বেদনা, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত মানুষের উন্মেষ ঘটে। তাই সকল বাঁধা বিপত্তি সড়িয়ে অভীষ্ট লÿ্যে যাতে পৌঁছানো যায়, জীবনে যাতে সফলতা অর্জন করা যায় সেই

নবদিগন্দেত্মর অনুসরণ করা সকলেই দরকার। এই পৃথিবীতে আমরা সবাই সবধরণের বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করে ধৈর্য ধারন করে সবকিছুর মুখোমুখি হয়ে জীবনে সফলকাম হতে চাই এসবই হচ্ছে মানব জাতির জন্য মিশন। আর এই মিশনে জয় লাভ করার জন্য হাসি-খুশী থাকাটা হচ্ছে এক বিশেষ শক্তিশালী হাতিয়ার। হাসি-খুশী থাকাটা এক ধরণের নিরাময় বটে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, জীবনে সাফল্যের গতিকে ত্বরান্বিত করতে হাসি-খুশী থাকার ভূমিকা কি? ভূমিকা অবশ্যই রয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হাসিমুখে কথা বলার প্রতি অত্যন্ত্ম গুiæত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন কারও সাথে হাসিমুখে কথা বলাও একটি সদকা অর্থাৎ দান।

হাসি-খুশী থাকলে মানুষ শারীরিক ভাবে, মানসিকভাবে অনেক অনেক শক্তি সম্পন্ন হয়ে উঠে। যেমন শুধু শারীরিক অবস্থার কথা ভাবলে বলা যায় হাসির কারণে শরীরের রক্ত প্রবাহে বিভিন্ন এনিটবডিসমূহের সার্কুলেশন বৃদ্ধি পায়, রক্ত প্রবাহে শ্বেতরক্ত কণিকার প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া মানসিক অবস্থার কথা ভাবলে বলা যায়, হাসি-খুশী থাকার কারণে হতাশা, বেদনা, ÿোভ মানুষের ধারে কাছে ঘেষতে পারে না। ফলে মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মানুষ অবিরাম কাজ করে যেতে পারে হাসি-মুখে। আর এভাবে একজন মানুষের সাফল্য অবশ্যই সুনিশ্চিত। এছাড়া হাসি-খুশী থাকলে একজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীও ইতিবাচক হতে বাধ্য। সুতরাং, পাঠক এই মুহূর্ত থেকে হাসি-খুশী থাকার অঙ্গীকার কiæন। নিজে হাসি-খুশী থাকুন, অন্যকে হাসি-খুশী থাকতে উপদেশ দিন। আপনার জীবনে সাফল্যের গতি ত্বরান্বিত হবেই হবে।

৫) আত্মিক নিরাময় লাভ করা ঃ পৃথিবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম প্রয়োজন। সংগ্রামহীন জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জগতের বুকে স্মরণীয় হগতে চাইলে, সফল হতে চাইলে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। আর সেজন্য অবশ্যই আমাদের আত্মিক নিরময় লাভ করা প্রয়োজন। জন্মের শুiæ থেকে আমরা আত্মার উন্নতির জন্য সংগ্রাম করি, পরিশ্রম করি। কারণ একজন মানুষের মনের পবিত্রতা সর্বাগ্রে গুiæত্বপূর্ণ। আর এজন্য আত্মিক নিরাময়ের বিকল্প নেই। আর এই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেÿিতে ধর্মচর্চা করা একান্ত্ম জাiæরী। কারণ ধর্মচর্চার মাধ্যমে একজন মানুষের মনের পবিত্রতা বৃদ্ধি পায়। আর স্বাভাবিকভাবেই একজন সফল মানুষের মনের পবিত্রতা বিশেষ গুiæত্বপূর্ণ। একজন সফল মানুষের মনের পবিত্রতাই যদি না থাকে তাহলে তার সফলতার পরম পবিত্র স্পর্শ অন্যকে কখনই স্পর্শ করতে পাবে না। আর এর ফলে সফলতা কখনই পূর্ণরূপ লাভ করতে পারবে না। তাই আত্মিক নিরাময়ের প্রথম ধাপ হিসেবে প্রয়োজন নামাজ কায়েম করা। কারণ নামাজ কায়েম করা ছাড়া কেউ আjøাহ্‌র সমীবর্তী হতে পারে না। হযরত খাজা গরীব নেওয়াজ (রাঃ) বলেছেন, “পরম কiæণাময় আjøাহ্‌ তায়ালা তাঁর বানদাদের প্রতি নামাজ আদায় করার জন্য যতটা দৃঢ়ভাবে গুiæত্ব আরোপ করেছেন আর কোনও কাজের প্রতি এতটা দৃঢ়ভাবে গুiæত্ব আরোপ করেননি।” এরপর আত্মিক নিরাময়ের জন্য দরকার ধর্মোদ্দেশ্যে উপবাস করা। ইসলাম ধর্মে ধর্মোদ্দেশ্যে উপবাসটিকে বলা হয়েছে রমজান।

পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা বাক্বারাহ্‌-র ১৮৩ নং আয়াতে আjøাহ্‌ তায়ালা আমাদের বলেছেন, “হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেরূপ ফরয় করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর।”

এছাড়া আত্মিক নিরাময় লাভ করার জন্য সবসময় সত্য কথা বলার চর্চা করা, দরিদ্র দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো, দান-সদ্‌কা করা এসব করে যাওয়া বিশেষ জাiæরী। তবে নীচ, হীন প্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকার চর্চা করা এবং যে সমস্ত্ম কাজ বিধিসম্মত সম্পূর্ণভাবে আjøাহ্‌র নিমিত্তে নিবেদিত সে সমস্ত্ম কাজ বা অভ্যাসের চর্চা চালিয়ে গেলে মানুষের নৈতিকতা, আত্ম-সংযম এবং আjøাহ্‌র প্রতি চিন্ত্মা, সচেতনতা গভীর থেকে গভীরতর হয়। আর এখানেই পার্থক্য শুধু স্বাস্থ্যের কথা চিন্ত্মা করে উপবাস করা এবং ধর্মোদ্দেশ্য উপবাস করা। সুতরাং, পাঠক আপনি যে ধর্মাবলম্বীই হোন না কেন আপনার নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী, ধর্ম চর্চা কiæন এবং আত্মিক নিরাময় লাভ কiæন।

কারণ জীবনে সফলতা অর্জনের জন্যই যে শুধু আত্মিক নিরাময়ের প্রয়োজন তা নয় বরং ইহকাল, পরকালের শান্ত্মি আনয়নের জন্যও আত্মিক নিরাময়ের বিশেষ প্রয়োজন। যখন একজন মানুষ সম্পূর্ণ আত্মিক নিরাময় লাভ করে তখন তার মনের শক্তি থাকে অপার। ফলে তার জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে খুব একটা বেগ পেতে হয় না। কারণ মানব জীবন

ফুলশয্যা নয়। অনেক কষ্টে, ত্যাগ, তিতিÿা, পরিশ্রম ও সংগ্রামের বিনিময়ে মানুষ মহিমান্বিত হতে পারে। বিশ্বের অগণিত মানুষ আত্ম-প্রতিষ্ঠা অর্জন ততা টিকে থাকার জন্য অবিরত সংগ্রাম করে চলেছে। এ ধরায় মানুষের আগমন ঘটেছে হাজার হাজার বছরে পূর্বে। সে থেকে আজ পর্যন্ত অগণিত মানুষ জন্মেছে, আবার কিছুকাল সংসার রচনা করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে পরপারের যাত্রী হয়েছে। সেই অসংখ্য, অগণিত, অজস্র বিলনি মানুষের মধ্যে গুটিকতক বীর্যবান ও গণ্য মানুষ মাত্রই আমাদের অন্তর্লোকে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। তারাই সফল, তারাই সার্থক এবং ধন্য। সুতরাং পাঠক আমরাও সফল হতে চাই, চাই স্মরণীয় বরণীয় হতে। আর সেজন্য আত্মিক নিরাময় লাভ করা বিশেষ জiæরী। কারণ আত্মিক নিরাময় আমাদের আত্মকে প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত রাখে। আসুন পাঠক এই মুহূর্ত থেকে আত্মিক নিরাময় লাভ করার জন্য অঙ্গীকার করি এবং সেই সঙ্গে জীবনে সাফল্যের গতিকে ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট হই।

পাঠক, জীবনে সফলতা অর্জন করার জন্য কিংবা জীবনে সাফল্যের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য শুধু যে এই কয়েকটি উ‡jøখিত বিষয় জiæরী তা নয়। কারণ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের অবস্থান ভিন্ন, যোগ্যতা ভিন্ন, মেধাও ভিন্ন এমনকি পরিশ্রম করার ÿমতাও ভিন্ন। তাই সফলতা অর্জনের প্রেÿাপটও মানুষ ভেধে ভিন্ন। তারপরেও যতটা সম্ভব এক জন মানুষের জীবনে ব্যর্থতা এবং সফলতার মাঝে ব্যালেন্স করার মাঝেই নিহিত আছে মানব জীবনের চরমতম সত্য।

আসুন, পাঠক সাফল্যের গতিকে ত্বরান্বিত করতে চেষ্টা করি এবং জীবনে সাফল্যকে উপভোগ করি চরমভাবে।

পাঠকের উদ্দেশ্যে কিছু কথা

এই পৃথিবীতে পার্থিব জীবনে কোন মানুষেই নিজের বর্তমান অবস্থায় সুখী নয়। প্রত্যেকেই অপরকে সুখী মনে করে এবং নিজের দুঃখের মাত্র আরও বাড়িয়ে তোলে। যেমন- নদীর প্রত্যেক তীরই নিজেকে মনে করে দুঃখী এবং অপর তীরকে মনে করে সুখী। এ প্রসঙ্গে রবার্ট ব্রাউনিং এর মন্তব্যের দিকে আলোকপাত করতে পারি। তিনি বলেছেন, “এজগতে প্রতিটি পদে যেন চলছে চাওয়া আর পাওয়ার লুকোচুরি। এটা চাই, সেটা চাই, নানা কিছু চাই। চাই অর্থ, চাই প্রতিপত্তি, চাই আরো নাম, যশ, খ্যাতি। পাইও ঠিক ওগুলোই, তবু যেন আশা মিটে না। আজ যা চাই সে চাওয়া না মিটাতেই কোথা থেকে আসে আরো আকাঙ্ক্ষা, আরো পিপাসা, আরো পাওয়ার ইচ্ছা।” সুতরাং রবার্ট ব্রাউনিং এর এই মন্তব্য থেকেই আমরা বুঝতে পারছি যে, মানুষের জীবনে আসলে চাওয়ারও শেষ নেই, পাওয়ারও শেষ নেই। নেই সফলতা অর্জনেরও পরিসমাপ্তি।

আমরা সবাই-ই চাই জীবনে সফলতার স্বাদকে আস্বাদন করতে। আর এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই আমি এই বইটি রচনা করেছি আপনাদের সবার জন্য। বইটির প্রথমে আমি সফলতা বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছি। কারণ সবার জীবনে সফলতার সংজ্ঞা এক রকম নয়। কারণ সফলতা মানুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আমি আশা করব এই বইটি পড়ে পাঠক তার দৃষ্টিভঙ্গী বদলাবেন। কারণ সাফল্যের পেছনে ছুটতে ছুটতে কেউ যেন নৈরাশ্যের এক অন্ধকারে নিÿিপ্ত না হয়, এই বিষয়টি লÿ্য রাখা বাঞ্চনীয়। কেননা, মানুষ আসলে কি চায় তা সে নিজেই জানে না। তাই সে অনাদি অন্তহীন আকর্ষনে উর্ধ্বশ্বাসে অনবরত পথ চলতে থকে। কিন্তু মানুষকে তো একটা পর্যায়ে যেয়ে অবশ্যই থামতে হবে। সফলতার জন্য দৌড়াতে যেয়ে যা অর্জন তা যেন বিফলে পর্যবসিত না হয় সেদিকে গুiæত্ব দেয়া উচিত।

পাঠক, আরেকটি বিষয় উÏjøখ না করলেই নয় আর তা হচ্ছে আমাদের চাওয়া এবং পাওয়ার মাঝে যেন সংগতি থাকে। এই দুইয়ের মাঝে ব্যালেন্স ঘটলেই সম্ভব সফলতা আনয়ন। আর সেজন্যই ক্যালভিন ওরেন বলেছেন, “মানব জীবন চিরদিনই সুখ-শান্তিতে কাটে না। আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। চাওয়া পাওয়ার গন্ডী তাই মাটির কাছাকাছি হওয়া ভালো।”

তবে আমার এই বইটি পড়েই হয়তো যাদুর মতো কারো জীবনে সফলতা এসে যাবে না। কিন্তু আমি আশা করি, পাঠক একটি সঠিক দিক-নির্দেশনা পাবেন। কারণ আমি দীর্ঘ ১৫-১৬ বছর বহু বহু মানুষকে কাছে থেকে দেখেছি তাদের বিফলতা, সফলতা সবকিছুই আমি উপলব্ধি করেছি। তাই আমি চেষ্টা করেছি পাঠক যেন এই বইটি পড়ে সঠিক দিক নির্দেশনা লাভ করে জীবনে অধ্যবসায় চালিয়ে যেতে পারেন এবং পরিশেষে সফল হতে পারেন।

তবে আমি আবারও বলতে চাই যে বিষয়টি আর তা হচ্ছে মানুষের আকাঙ্ক্ষা করার শক্তি সীমাহীন। কিন্তু তাকে সফল রূপদানের সার্থকতা মানুষের সীমিত।

সুতরাং, পাঠক জীবনে সফল হওয়ার জন্য আপনার যাত্রা শুভ হোক, সার্তক হোক এই কামনা করি। তবে আপনার জীবনে চাওয়া পাওয়ার গরমিল যতটা কমাতে পারেন ততই ভাল। কারণ এই গরমিলই মানুষের চিরন্তন অতৃপ্তির কারণ। আশা করি, পাঠক সফল হবেন, সার্থক হবেন। আর আপনার যদি কোন কিছু বলার থাকে এই বইটির কোনও বিষয়ে কিংবা অন্য কোনও সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে আপনাদের সবার সাদর আমন্ত্রণ রইল আমার সাইকী ভবনে।

সবাইকে ধন্যবাদ এবং সবাইকে শুভেচ্ছা।

আকুপ্রেশার থেরাপী বই এর লেখা নিচ থেকে

আকুপ্রেশার বিন্দু পরিচিতি

ডান হাত

আকুপ্রেশার বিন্দু পরিচিতি

বাম হাত

আকুপ্রেশার বিন্দু পরিচিতি

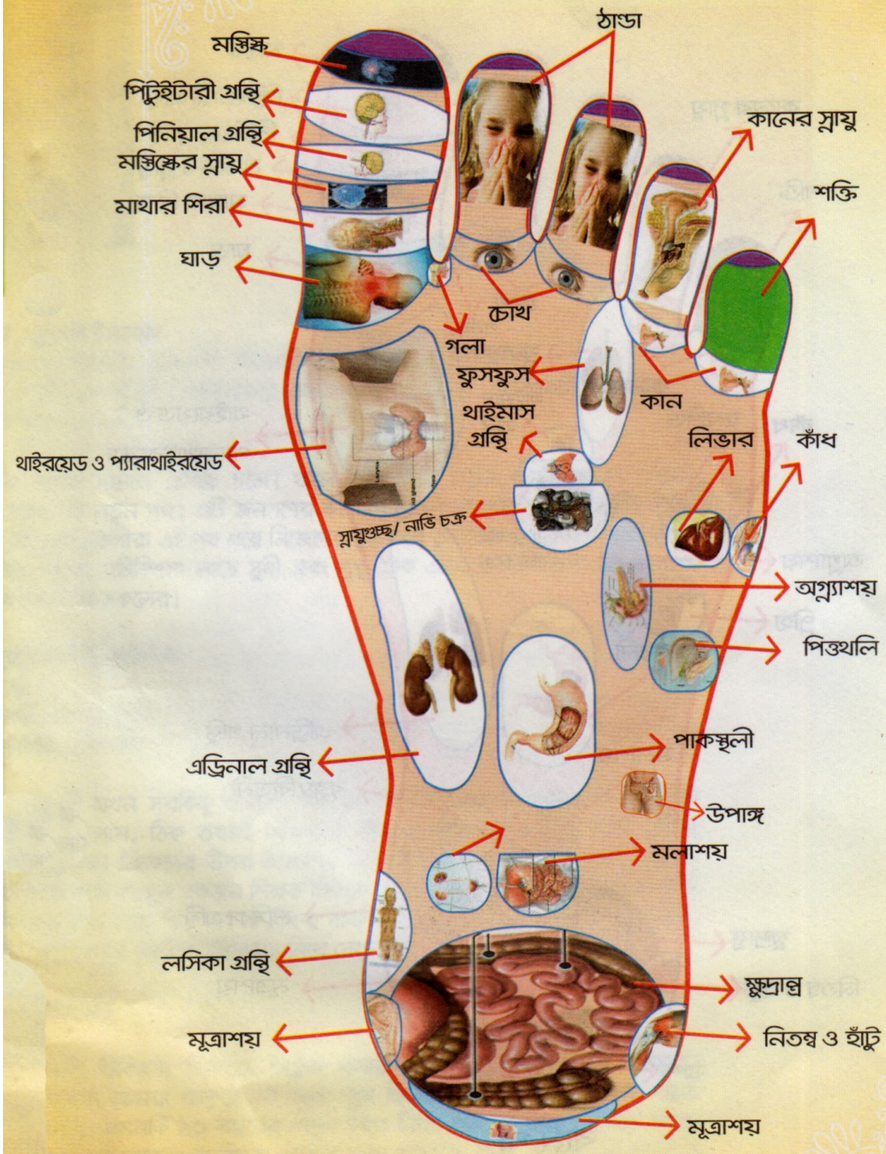

ডান পা

আকুপ্রেশার বিন্দু পরিচিতি

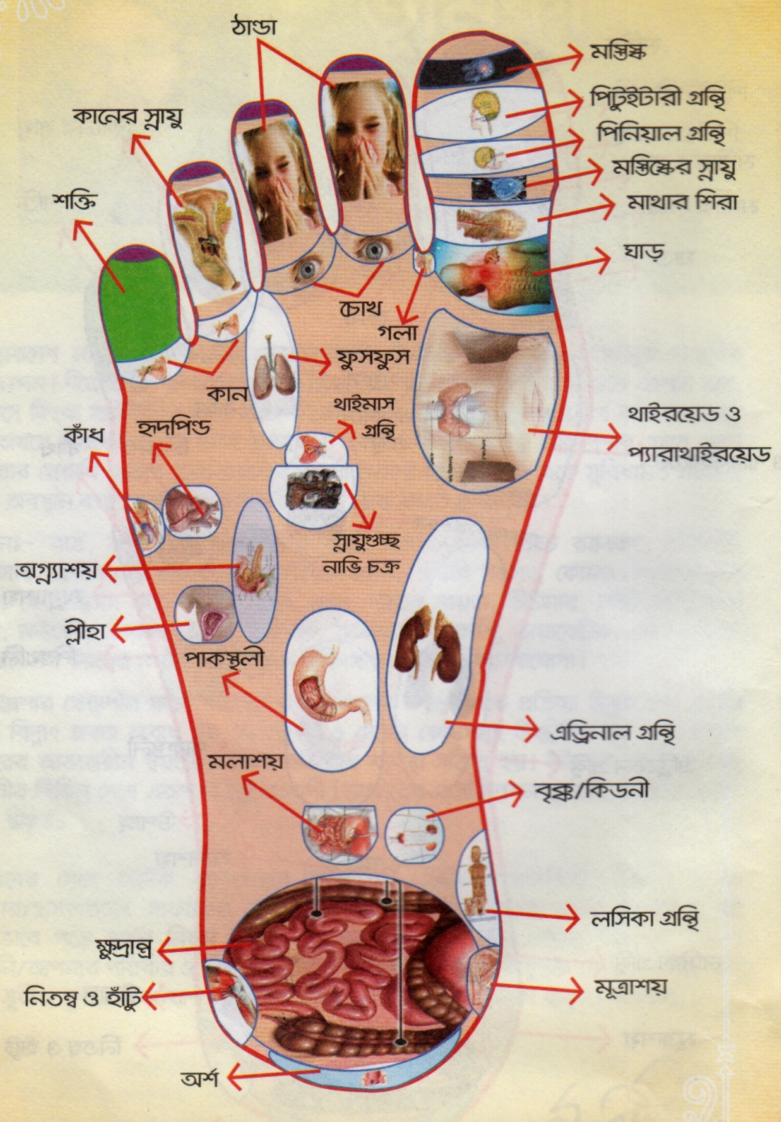

বাম পা

আকুপ্রেশার বিন্দু পরিচিতি

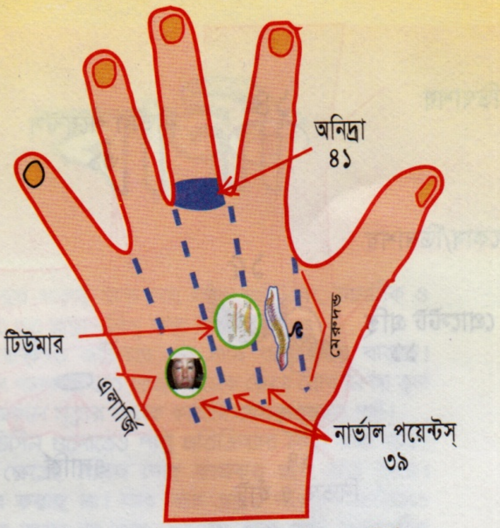

বাম হাতের উল্টো পিঠ

ডান হাতের উল্টো পিঠ

আকুপ্রেশার বিন্দু পরিচিতি

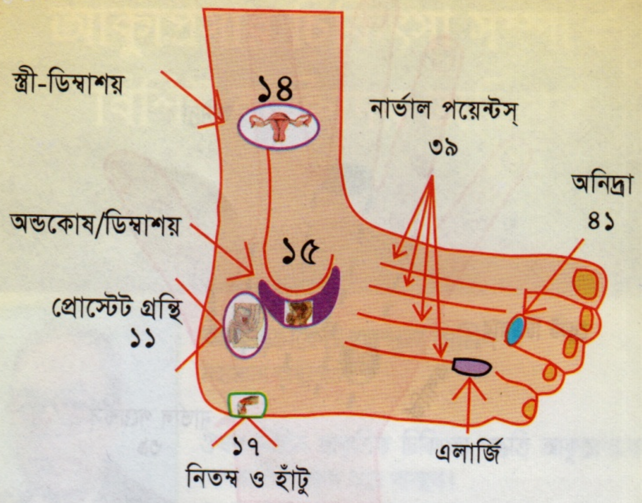

ডান পায়ের উপর অংশের বাহিরের দিক

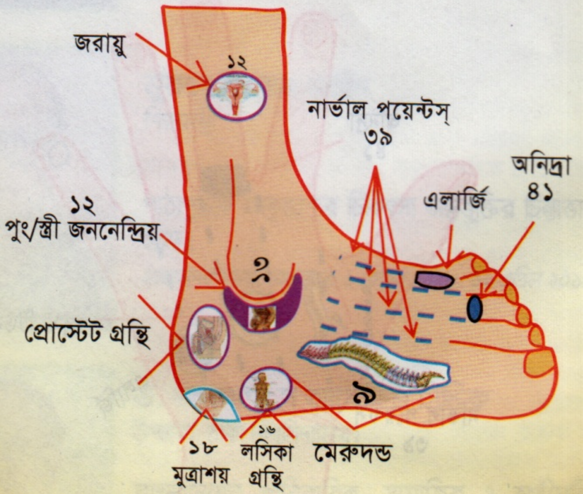

বা পায়ের উপর অংশের ভেতর দিক

আকুপ্রেশার বিন্দু পরিচিতি

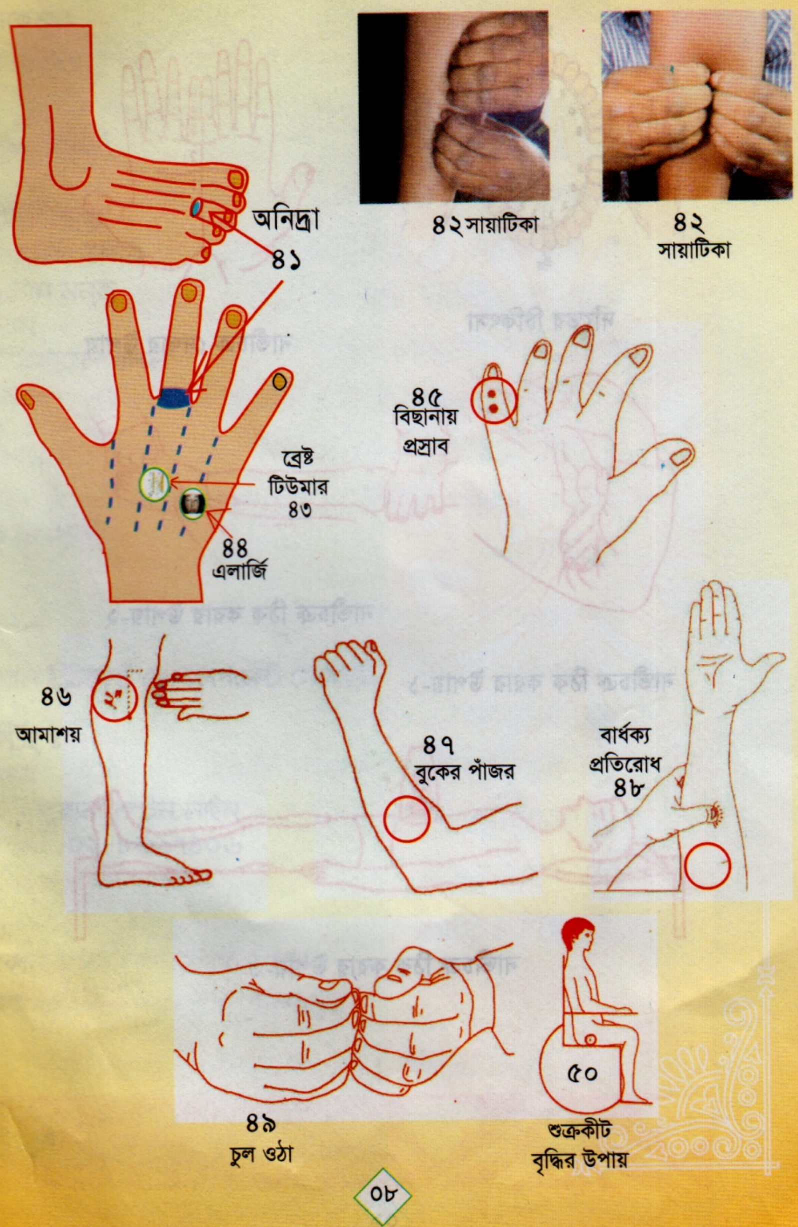

আকুপ্রেশার বিন্দু পরিচিতি

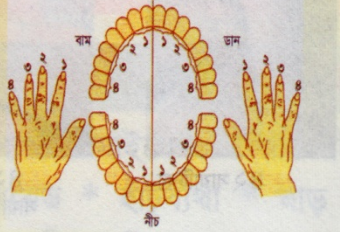

দাঁতের চিকিৎসা

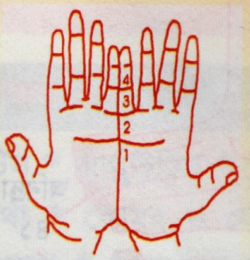

নাভীচক্র দেখার উপায়

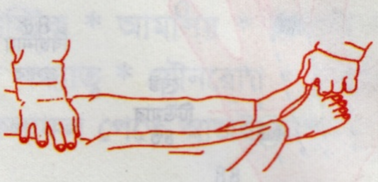

নাভীচক্র ঠিক করার উপায়-২

নাভীচক্র ঠিক করার উপায়-১

নাভীচক্র ঠিক করার উপায়-৩

তৃতীয় অধ্যায়

আকুপ্রেশার থেরাপীর প্রাকটিক্যাল চিত্র

০১. মস্তিষ্ক

০২. মস্তিষ্ক স্নায়ু

০৩. পিটুইটারী গ্রন্থি

০৪. পিনিয়াল গ্রন্থি

০৫. মাথার শিরা

০৬. গলা

০৭. ঘাড়

০৮. থাইরয়েড /প্যারাথাইরয়েড

০৯. মেরুদন্ড

১০. অর্শ/পাইলস

১১. প্রোস্টেট গ্রন্থি

১২. জরায়ু

আকুপ্রেশার থেরাপীর প্রাকটিক্যাল চিত্র

১৩. পুংজননেন্দ্রিয়

১৪. স্ত্রী ডিম্বাশয় / ওভারি

১৫. অন্ডকোষ

১৬. লিমফ / লসিকা গ্রন্থি

১৭. হাঁটু নিতম্ব

১৮. মূত্রথলি / মুত্রাশয়

১৯. ক্ষুদ্রান্ত

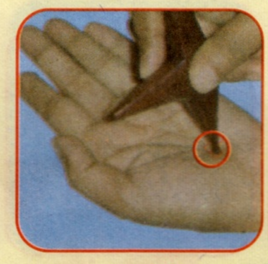

২০. মলাশয়

২১. উপাঙ্গ

২২. পিত্তকোষ

২৩. লিভার বা যকৃত

২৪. কাঁধ

আকুপ্রেশার থেরাপীর প্রাকটিক্যাল চিত্র

২৫. অগ্নাশয়

২৬. বৃক্ক বা কিডনী

২৭. পাকস্থলী

২৮. এড্রিনাল গ্রন্থি

২৯. অন্ত্রগুচ্ছ

৩০. ফুসফুস

৩১. কান

৩২. শক্তি

৩৩. কানের স্নায়ু

৩৪. ঠান্ডা

৩৫. চোখ

৩৬. হৃৎপিন্ড (Heart)

আকুপ্রেশার থেরাপীর প্রাকটিক্যাল চিত্র

৩৭. প্লীহা

৩৮. থাইমাস গ্রন্থি

৩৯. সাইনাস

৪০. NP ঃ স্নায়ুতন্ত্র

৪১. MF মধ্যমা আঙ্গুল

৪২. সায়াটিকা

৪৩. ব্রেষ্ট টিউমার

৪৪. এলার্জি

৪৫. বিছানায় প্রস্রাব

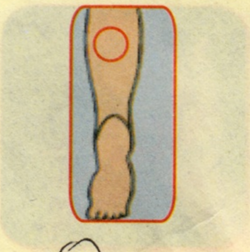

৪৬. আমাশয়

৪৭. বুকের পাঁজর

৪৮. বার্ধক্য প্রতিরোধ

আকুপ্রেশার থেরাপীর প্রাকটিক্যাল চিত্র

৪৯. চুল ওঠা

৫০. শুক্রকীট বৃদ্ধির উপায়

০১. মস্তিষ্ক

০২. মস্তিষ্ক স্নায়ু

০৩. পিটুইটারী গ্রন্থি

০৪. পিনিয়াল গ্রন্থি

০৫. মাথার শিরা

০৬. গলা

০৭. ঘাড়

০৮. থাইরয়েড /প্যারাথাইরয়েড

০৯. মেরুদন্ড

১০. অর্শ/পাইলস

আকুপ্রেশার থেরাপীর প্রাকটিক্যাল চিত্র

১১. প্রোস্টেট গ্রন্থি

১২. জরায়ু

১৩. পুংজননেন্দ্রিয়

১৪. স্ত্রী ডিম্বাশয় / ওভারি

১৫. অন্ডকোষ

১৬. লিমফ / লসিকা গ্রন্থি

১৭. হাঁটু / নিতম্ব

১৮. মূত্রথলি / মুত্রাশয়

১৯. ক্ষুদ্রান্ত্র

২০. মলাশয়

২১. উপাঙ্গ

২২. পিত্তকোষ

আকুপ্রেশার থেরাপীর প্রাকটিক্যাল চিত্র

২৩. লিভার বা যকৃত

২৪. কাঁধ

২৫. অগ্নাশয়

২৬. বৃক্ক বা কিডনী

২৭. পাকস্থলী

২৮. এড্রিনাল গ্রন্থি

২৯. অন্ত্রগুচ্ছ

৩০. ফুসফুস

৩১. কান

৩২. শক্তি

৩৩. কানের স্নায়ু

৩৪. ঠান্ডা

আকুপাংচার ও আকুপ্রেশারের মধ্যে পার্থক্য ঃ

আকুপাংচার হলো প্রথাগত চাইনিজ চিকিৎসা পদ্ধতি। আজ হতে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারত উপমহাদেশ হতে সর্ব প্রথম এই পদ্ধতি চালু হয় (অনেকের মতে)। এই পদ্ধতিতে চাইনিজরা সুঁচের ব্যবহারের মাধ্যমে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক শক্তি চলাচল অবাধ করার মাধ্যমে শরীরের নানাবিধ রোগের চিকিৎসা করত। প্রাচীনকালে চাইনিজরা বিশ্বাস করত আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে মেরিডিয়ান নামক ১০টি প্রধান পথ দিয়ে চলাচল করে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক দুটি মিলিত শক্তি। এই শক্তি দুটি সঠিক সমন্বয়ের মাধ্যমে মেরিডিয়ানের মধ্য দিয়ে চলাচল করলেই কেবল শরীর সুস্থ থাকে। যদি এ চলাচলের ধারা বাধাগ্রস্থ হয় তাহলে শরীর নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। অনেকের ধারণা, করত যেহেতু সুঁই দ্বারা শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছিদ্র করে এই চিকিৎসা করা হয় তাই এ চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলা হয় আকুপাংচার। মেরিডিয়ান রেখার শেষ প্রান্ত গুলো হল হাত এবং পায়ের তলায়। হাত-পা এবং বডির বিভিন্ন। আকুপাংচার নিয়ে গবেষণা চালাতে গিয়ে বলা যায় গবেষকগণ বিস্ময়ের সাথে এক নতুন আবিষ্কারের মুখোমুখি হলেন। তারা লÿ্য করলেন আকুপাংচারে যে বিন্দুতে সুঁচ ফুটালে রোগ নিরাময় হয়, সেই বিন্দুটিতে আঙ্গুলের মাধ্যমে বা ভোঁতা কাঠির মাধ্যমে চাপ বা প্রেশার দিয়েও রোগ নিরাময় করা যায়।

আকুপাংচার আকুপ্রেশার

আকুপ্রেশার থেরাপী কীভাবে মানব দেহে কাজ করে ঃ

আকুপ্রেশার থেরাপীর উদ্দেশ্য হলো, হাত, পা, দেহ ও দেহের কিছু প্রধান কেন্দ্রের উপর চাপ দেওয়া। এই কেন্দ্রগুলিকে রেসপন্স সেন্টার বা রিফলেক্স সেন্টার বলা হয়। রোগের অবস্থা অনুসারে এই কেন্দ্রগুলির উপর প্রেশার দিলে খুব যন্ত্রনা হয়, কারণ এটি খুবই সংবেদনশীল হয়ে থাকে। প্রত্যেক রেসপন্স কেন্দ্র হাত, পা বা দেহের চর্ম স্তরের নীচে এবং মাংস স্তরের কিছুটা গভীরে বিভিন্ন বীজের দানার আকারে হয়ে থাকে। প্রত্যেক রেসপন্স কেন্দ্রে চাপ দিলে বা বিন্দুতে প্রেশার নিলে দেহের মধ্যে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া শক্তি জাগ্রত হয়। এই শক্তি বাস্তবে বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কাজ করে। যার ফলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ÿমতা বৃদ্ধি পায় এবং দেহে রোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া সচল হয়। ১০টি চ্যানেলের সমান্তরাল রেখা ধরে সারা শরীরে দেহে অজস্র আকুপয়েন্ট ছড়িয়ে আছে। সে সব পয়েন্টগুলোতে নির্দিষ্ট নিয়মে পালস্ প্রয়োগ `ªঞ্চত রোগ নিরাময় হয়। আকুপাংচার পদ্ধতিতে দেহের যে কোনো অংশে এরূপ চিকিৎসা দেয়া হয়। অন্য দিকে রিফ্লেক্সোলজী পদ্ধতি অনুসারে মানুষের হাত এবং পায়ে চিকিৎসা দিয়েই রোগ নিরাময় করা যায়। যেহেতু হাত এবং পায়ের তালুতে এসে উপরোক্ত ১০ চ্যানেলের সব কটি চ্যানেলের শীর্ষ বিন্দুগুলো উন্মুক্ত হয়েছে। এসব পয়েন্ট বিশেষ নিয়মে চাপ দিয়ে বিভিন্ন অঙ্গের রোগ নির্ণয় করা যায়। আবার ঐসব বিন্দুগুলোতে থেরাপী দিয়ে এদের সুস্থ করা যায়। আকুপ্রেশার থেরাপী হচ্ছে শক্তি সঞ্চালন ও প্রতিবন্ধকতা দূর করার একটি বিকল্প চিকিৎসা। প্রতিফলন তত্ত্ব বা রিফ্লেক্সোলজী একই ধরনের একটি পদ্ধতি কিন্তু এ পদ্ধতি প্রয়োগের ÿেত্রে প্রধানত হাত পা। হাতের তালু ও পায়ের তলায় সমস্ত স্নায়ুর শেষ প্রান্ত অবস্থিত। এখানে রয়েছে প্রতিফলন অঞ্চল, যা শরীর ও মস্তিষ্কের সকল অংশে সংযোগ রÿা করে। অমাদের পায়ের পাতা ও হাতের তালু শরীরের সকল অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। এই প্রতিফলন অঙ্গগুলো

সংশিষ্ট অঙ্গের সমস্যার কারণে স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। শরীরের ডান পাশের বিশেষ তিনটি অঙ্গ, যেমন- লিভার, গলeøাডার ও এপেনডিক্স, এ তিনটি অঙ্গের জন্য ডান হাত ও ডান পায়ের তিনটি বিশেষ প্রতিফলন বিন্দু আছে। অন্যদিকে, দেহের বাম অংশে অবস্থিত দুটি বিশেষ অঙ্গ, যেমন- হার্ট এবং স্পøীন অংশের বেলায় বাম হাত ও বাম পায়ের দুটি বিশেষ প্রতিফলন বিন্দু থাকে। মাঝের অঙ্গগুলোর প্রতিফলন অঞ্চল উভয় দিকের হাত পায়ে অবস্থিত। হাত ও পায়ের আকু পয়েন্ট হাতের আঙ্গুল বা কাঠির মাধ্যমে চাপ দিলে শরীরের অঞ্চল ভিত্তিক রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে বিদ্যুৎ তরঙ্গের সৃষ্টি করে। প্রতিফলন তত্ত্ববিদরা বিশ্বাস করে, হাত ও পায়ের সব পয়েন্ট প্রেশার বা চাপ দিলে প্রতিবন্ধকতা দূর হয় এবং শরীর ও সত্ত্বায় জীবনী শক্তির প্রবাহ বাড়ে ও দেহ মনে সুস্থতার বিকাশ ঘটে।

মেডিসিন বিকল্প চিকিৎসা আকুপ্রেশার ঃ

মানুষ আjøাহ তায়ালার অপূর্ব সৃষ্টি। মানুষের দেহ একটি সুপার কম্পিউটার। এর প্রোগ্রামগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত অঙ্গগুলো ঠিকমত কাজ না করতে পারলে আমাদের শরীর দেখা দেয় অসুস্থতা। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ৯৫% ভাগ মানুষেই কোনো না কোনাভাবে অসুস্থ, এর মধ্যে ১৫% ভাগ গুiæতর অসুস্থ। শরীরের গুiæত্বপূর্ণ অঙ্গ বা গ্রন্থিগুলোর জন্য রয়েছে বৈদুতিক লাইনের মত স্নায়ুবিক কানেকশন, হাত পায়ে আছে সুইচিং পয়েন্ট। যেখানে চাপ দিয়ে অঙ্গগুলোর সুস্থতা বা অসুস্থতা নিরূপন করা যায়। মানুষের হাতে পায়ে বিশেষ ৫০টি সুইচ/বিন্দু চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩নং সুইচটি মাস্টার গøান্ড পিটুইটারী গন্থির নিরূপক। হাতে পায়ে ব্যথা অনুভূত হলে বুঝতে হবে বহুমুত্র বা ডায়েবেটিস আক্রমণ করেছে। হাত-পায়ের এ ধরেণের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে দেহের বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। উপরোক্ত ৫০টি পয়েন্ট বিভিন্ন উপায়ে চাপ দিয়ে চিকিৎসার যে পদ্ধতি সেটি হল আকুপ্রেশার যা আজকে উন্নত দেশ আমেরিকা, চীন, জাপান সহ উপমহাদেশে প্রসার লাভ করেছে এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থান দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। আকুপ্রেশার একটি মেডিসিন বিকল্প চিকিৎসা। প্রচলিত ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমরা জানি। ওষুধের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় আমরা নিজের আজান্তে শরীরের অনেক ÿতি করছি। মানুষ এখন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। আকুপ্রেশার পদ্ধতির চিকিৎসায় মেডিসিন ছাড়াই হাঁপানী, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যান্সার, কিডনি, এইডস, হৃদরোগ, বাত, কোমর ব্যথা, অর্শ, গেজ, যৌন/গোপন রোগ, মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে। এ পদ্ধতি শিখে নিজেই নিজের চিকিৎসা করতে পারে। তাই বলা হয়ে থাকে আপনার স্বাস্থ্য আপনার হাতে। মেডিসিনের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয় বিকল্প খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি। মানুষের শরীরে কাঁচা শাকসবজি, ফলমূল হলো বিপুল শক্তির আধার। এ কাঁচা শাকসবজি ও ফলমূলের রস পথ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। পাশপাশি প্রয়োজন ধাতু সোনা, রূপা, তামা, লোহা, সিদ্ধ পানি এবং সঠিক পদ্ধতিতে সুষম খাদ্য গ্রহণ। এভাবেই মেডিসিনের বিকল্প আকুপ্রেশার পদ্ধতির চিকিৎসা দেওয়া হয়ে থাকে। আমলকি ও আদার মিশ্রণে তৈরি পানীয়কে স্বাস্থ্য পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দেখা গেছে আট থেকে দশ বছরের শিশুদের এই চিকিৎসা প্রণালীর পথ ধরিয়ে দিতে পারলে এদের শুধু শারীরিক বৃদ্ধিই স্বাভাবিক হবে এমন নয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অপরাধ প্রবণতা হ্রাস ও তাদের দেহশ্রী বাড়ার সাথে সাথে জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলবার মানসিকতা অর্জন ক'রে সমাজের সুস্থ নাগরিক হিসেবে জীবনযাপন করার অবকাশ পাবে। ফলে আমরা সুস্থ জাতি হিসেবে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সÿম হবো।

কোন রোগের জন্য কোন বিন্দুতে থেরাপি প্রয়োগ করবেন

১। দুঃচিন্তা জনিত সমস্যার জন্য আকুপ্রেশার বিন্দু ১-৫, ৭, ৮, ২৫, ২৮, MF

২। তীব্র ব্যথার জন্য আকুপ্রেশার বিন্দু ১-৫, ২৫, ২৮, MF

৩। যৌন সমস্যাজনিত সমাধানের জন্য আকুপ্রেশার বিন্দু ৩, ৪, ৮, ১১-১৫, ২৫, ২৮

৪। ডায়াবেটিস এর জন্য আকুপ্রেশার বিন্দু ৩, ৪, ৮, ১১-১৬, ১৮, ২৫, ২৮

৫। আমাশয় এর জন্য আকুপ্রেশার বিন্দু ১৯, ২৩, ২৭

লাইফ শাইনিং মেথড বই এর লেখা নিচ থেকে

পৃষ্ঠা নং

ভূমিকা ■ ১৫
নিয়তির জালে বন্দী ■ ১৭
কিভাবে যাত্রা করলাম ■ ১৯
আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক বিশ্ব সৃষ্টি ■ ২২
মেডিটেশন কি ? ■ ২৫
মন কি ? ■ ৩০
প্রাণ কি ? ■ ৩৩
মেডিটেশন (প্রাণায়াম) ■ ৩৫
বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের স্বরূপ ■ ৩৭
ব্রেইন কি ? ■ ৪১
মানসিক চাপ কি ? ■ ৪৬
মানসিক চাপের কারণ সমূহ ■ ৪৯
মেডিটেশন (আলফা ড্রইং iæমে যাওয়া) ■ ৫৪
মেডিটেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি ■ ৫৬
মেডিটেশনের প্রকারভেদ ■ ৬৩
মেডিটেশন সম্পর্কে সাধারণ গাইড লাইন ■ ৬৬
মেডিটেশন সম্পর্কিত কিছু প্রচলিত ভুল ধারণা ■ ৬৯
মেডিটেশনের উপদেশ ■ ৭০
মেডিটেশন (শিথিলায়ন) ■ ৭৩
মেডিটেশন কিভাবে কাজ করে ■ ৭৫
মেডিটেশনের উদ্দেশ্য কি ? ■ ৮০
হাসির নিরাময় শক্তি ■ ৮২
কান্নার সাহায্যে নিরাময় ■ ৮৬
চুম্বকের সাহায্যে নিরাময় ■ ৯০
মেডিটেশনের (অটোসাজেশন) ■ ১০০
মেডিটেশনের সাহায্যে আয়ু বৃদ্ধি ■ ১০৭
মেডিটেশনের সাহায্যে নিরাময় ■ ১১০
মনছবি এবং মনছবির মাধ্যমে সফলতা আনয়ন ■ ১২২
মেডিটেশন (মনছবি) ■ ১২৭
ধ্যান এবং ব্রেইনের সচেতনতা ■ ১২৯
নেতিবাচক কথাবার্তা, চিন্তা ও ভয় ■ ১৩৪
মেডিটেশন (নিরাময় সেন্টার ও গুiæজী) ■ ১৪১
কিভাবে জীবনে সফল হওয়া যায় ■ ১৪৩
অভয় সংকেত ■ ১৪৬
লাইফ শাইনিং মেথডের সাহায্যে নিরাময় ■ ১৫৩

লেখকের কথা

মানুষের জীবন কর্মমুখর। মানুষ বেঁচে থাকে তার কাজের মধ্যে, মানুষ মর্যাদা পায় তার কাজের জন্য। কিন্তু মানবজীবনে সব কাজে কর্মেই পরিমিতিবোধ থাকা প্রয়োজন। এই পরিবর্তনশীল জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকেই উপভোগ ও আনন্দের উৎস হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। আর তাই সময়ের ব্যবধানে একটি মানুষের জীবনে যা-ই ঘটুক না কেন সবকিছুকেই সহজভাবে গ্রহণ করার ÿমতা তাঁর থাকতে হবে। এতে জীবন থেকে কষ্ট, বেদনা, হতাশা দুর হবে। জীবন হয়ে উঠবে আনন্দমুখর। আর তার জন্য প্রতিটি মানুষের নিজেকে জানার জন্য তথা অন্তরের শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা এবং চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন। আর সেই চেষ্টা যেন প্রতিটি মানুষের জীবনে সফল হয় সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমি আমার এই ***"লাইফ শাইনিং মেথড্"*** বইটি আপনাদের হাতে তুলে দিলাম। দীর্ঘ ১৪ বৎসর ধরে আমি বহু মানুষকে দেখেছি। তাদের সমস্যাগুলো জেনেছি। সমস্যাগুলোর কারণ চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছি। তাদের সমস্যাগুলোর সমাধান দিতে চেষ্টা করেছি। আর সেই সঙ্গে দীর্ঘ ১৪ বৎসর আমার অভিজ্ঞতালব্ধ ফলাফল নিয়ে গবেষণা করেছি কিভাবে একটি সুন্দর, সঠিক দিক নির্দেশনা তথা একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি সবার সামনে উপস্থাপন করা যায়। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে সংকট আছে, সমস্যা আছে। কিন্তু সেটাই জীবনের সব কিছু নয়। আলো ও আঁধার, সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও বেদনা জীবনে পাশাপাশি আছে বলেই জীবনের আসল বৈশিষ্ট্য আমরা সহজে অনুধাবন করতে পারি। আঁধারের জন্য আলোর উপস্থিতি স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। তেমনি জীবনে সুখ, শান্তি-আনন্দ-উপভোগ সহ সকল সুখ দুঃখের পটভূমিকায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর উজ্জ্বল করার দায়িত্ব প্রত্যেকটি মানুষের নিজেরই। প্রতিটি মানুষকে হতে হবে প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী, সেই সঙ্গে সৎ এবং পরিশ্রমী। আমি দীর্ঘদিন আধ্যাত্মিক জগত, জ্যোতিষ বিজ্ঞান, মেডিটেশন, প্রাকৃতিক নিরাময় তথা অতিন্দ্রীয় বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় বিচরণ করে আসছি। আমি দেখেছি মানুষ ইচ্ছা শক্তির গুণে চেষ্টা করলে তার মনের শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মনের শক্তিকে বাড়াতে পারে বহুগুণ। আর এভাবে আপনিও পারেন একজন অনন্য, অসাধারণ মানুষ হিসেবে নিজের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলতে। আপনিও পারেন শুধু একজন আকৃতির মানুষ না হয়ে প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে।

আর সেজন্য আমার এই ***"লাইফ শাইনিং মেথড্"*** বইটি আপনার জন্য হতে পারে একটি সুন্দর, নির্মল, বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক গাইড লাইন। দীর্ঘ চার বছর ধরে আমি এই বইটি রচনা করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি এই বইটি পড়ে উপকৃত হবেনই। বইটি পড়ে অবশ্যই আপনার মন, ব্যক্তিত্ব নিজ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠবে। আপনি অফুরাণ প্রাণশক্তি অর্জন করে হয়ে উঠবেন প্রাণবন্ত।

আমি মেডিটেশনকে জনপ্রিয় করার জন্য তথা আমার উদ্ভাবিত ***"লাইফ শাইনিং মেথড্"*** এর সাহায্যে মেডিটেশনের পদ্ধতিটিকে সবার উপকারের জন্য, সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য স্থাপন করেছি আমার ***"সাইকি ভবন"***। আপনি এই ***"লাইফ শাইনিং মেথড্"*** বইটি পড়ে শতকরা ৪০ ভাগ উপকৃত হবেন এবং অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। আর আমার কাছে মেথড্‌টি শিখলে শতকরা ১০০ ভাগ উপকৃত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। আপনি শিখবেন কিনা, সেই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণই আপনার। তারপরও আমার সাইকি ভবনে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ রইল।

আমি আপনাদের একটি উদাহরণ দিতে চাই। নির্জন বনে অনেক সুন্দর, সুগন্ধি ফুল ফোটে। সেই ফুলকে জনসমক্ষে আনতে না পারলে তার সুঘ্রাণ এবং সৌন্দর্য কেউই উপভোগ করতে পারে না। তেমনি আপনার মাঝেও রয়েছে বিশাল সম্ভাবনা এবং শক্তির অফুরন্ত সম্ভার। যা হয়ত আপনার অজান্তে এবং অবহেলায় নীরবেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আপনি আপনার ইচ্ছাশক্তি, মনের শক্তি অর্থাৎ সেই লুক্কায়িত শক্তিকে বিকশিত কiæন। আপনি উপকৃতই হবেন। আপনি লাভবান হবেন। আপনি হয়ে উঠবেন অনন্য এবং অসাধারণ।

এই বইটি লিখতে আমাকে সর্বাঙ্গীনভাবে সহায়তা করেছেন-“সীমা” যার জীবনে হাজারো ব্যক্তিত্ববান সফল মানুষদের মধ্যে আমি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

গুiæজী
জীবন চৌধুরী
সাইকি ভবন
১৬৯/১, কণকর্ড গ্রান্ড (৩য় তলা)
কÿ নং-২১০, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩১৬৪৩৯, ৮৩১৭৫৮৭
ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩১৬৪৩৯

ভূমিকা

বিভিন্ন ধরনের নিরাময় প্রক্রিয়ার মধ্যে মেডিটেশনের ধারণা একটি পুরনো প্রচলিত ধারণা। অর্থাৎ মেডিটেশনের ধারণা নতুন কোনও কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি, বর্ণের মানুষ এবং তাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি সেই সঙ্গে মানব সমাজের মানসিক বিকাশের ক্রমবর্ধমান ধারা থেকেই মেডিটেশন এবং মেডিটেশনের বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। মেডিটেশনের মূল অস্থিত্ব বা শিকড়ের সন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রচলিত ধর্মে এর মূল বা শিকড়। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে সব ধর্মের মানুষের মাঝেই মেডিটেশনের বা ধ্যান করার কিছু না কিছু চর্চা রয়েছে। কিন্তু তার ধরন হয়ত বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন রকম। প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, মানুষ মেডিটেশনের চর্চা করে আসছে জাগতিক বিভিন্ন দুঃখ, দুর্দশা, কষ্ট, রোগ, শোক থেকে মুক্তি পাবার জন্য, নিরাময় প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য।

যতদূর জানা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সম্ভবত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ ব্যাপকভাবে মেডিটেশনের চর্চা করে আসছে- যা বিস্তার লাভ করেছে প্রাচ্য দেশসমূহে এবং মধ্য এশিয়াতে। বৌদ্ধ ধর্মবলাম্বীদের জন্য মেডিটেশনের চর্চা খুবই জাiæরী জ্ঞানসম্পন্নতা, বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা অর্জনের জন্য এবং সেই সঙ্গে সমবেদনা এবং বাস্তবতা বোঝার জন্য। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ বিশ্বাস করেন যে, আমাদের সাধারণ মনের সচেতনতা খুবই সীমাবদ্ধ। একমাত্র মেডিটেশনের মাধ্যমেই আমাদের সচেতনতা এবং অসচেতনতার পরিপূর্ণ সমৃদ্ধি সম্ভব। মেডিটেশনের মাধ্যমেই দেখা মনছবি আমাদের চিন্তাশক্তিকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করে।

যদি মেডিটেশনের খুবই প্রচলিত এবং সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে কিন্তু মাত্র তিন দশক আগে থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহ মেডিটেশনের উপর শুiæ হয়। মাত্র তিন দশক আগে স্বাস্থ্যের উপর মেডিটেশনের ক্লিনিক্যাল প্রভাবসমূহের উপর আলোকপাত করা শুiæ হয়। ১৯৬০ সালের দিকে পশ্চিমা যোগসাধকগণ এবং ভারতে মেডিটেশনের মাস্টারগণ কৃতিত্বের সাথে দৈহিক নিয়ন্ত্রণ সাধন করতে পেরেছিলেন এবং সেই সাথে মনের সচেতনতার বিভিন্ন ধাপগুলোর পরিবর্তন কৃতিত্বের সাথে করতে পেরেছিলেন। এই ব্যাপারটি অতি `aæত বিস্তার লাভ করতে থাকে। পশ্চিমা গবেষকগণের মধ্যে এবং তারা মন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি চর্চা করতে থাকেন। সেই সাথে নার্ভাস সিস্টেম অর্থাৎ স্নায়ুবিক ব্যাপারগুলোর উপর স্বেচ্ছাধীন নিয়ন্ত্রণেরও একটা চর্চা চলতে থাকে। একই সময়ে কিছু বৈজ্ঞানিক বিকাশ সাধন (রোগী) অনেক সময় মানসিক চাপের কারণে সৃষ্ট মানসিক সমস্যা অসমতা, অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহৃত ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে অসন্তুষ্ট মনের উপর মেডিটেশনের প্রভাব এবং নিয়মিত মেডিটেশন চর্চার ব্যাপারটিকে বেশ উপভোগ করছেন।

হার্ভাড মেডিক্যাল স্কুলের প্রফেসর হার্বাট বেনসন, এম.ডি (Herbert Benson. M.D) মেডিটেশনের অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করেছেন "শিথিলায়ন প্রতিক্রিয়া" হিসেবে। তিনি অনেক যোগসাধক এবং অনেক দিন ধরে মেডিটেশন করেন এরকম লোকদের উপর গবেষণা করে বের করেছেন যে মেডিটেশন সমবেদী নার্ভাস সিস্টেম বা সমবেদী নার্ভ তন্ত্র-এর প্রভাবকে ব্যর্থ করে দেয়। অথচ সমবেদী নার্ভতন্ত্র চোখের মণি বা তারাকে প্রসারিত করে, হার্টবিট বাড়ায়, শ্বাস-প্রশ্বাস বাড়ায়, রক্তচাপ বাড়ায়। যখন আমরা মেডিটেশন শুiæ করি তখন অর্ধসমবেদী নার্ভাস সিস্টেম কার্যকর হতে শুiæ করে যার কার্যকারিতা সম্পূর্ণ সমবেদী নার্ভাস সিস্টেম-এর বিপরীতমুখী। যখন আমরা মেডিটেশন করি তখন মা¯ø(মাংস)-এর প্রসারণ কমে যায়, উচ্চ রক্তচাপ কমে যায়। যারা খুবই দক্ষ মেডিটেশন চর্চার ব্যাপারে, তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় মেডিটেশনের কারণে তাদের শরীরের তাপমাত্রা কমে গেছে, বিপাকীয় প্রক্রিয়ার হার হ্রাস পেয়েছে। যখন কেউ একজন শিথিলায়নের চরম পর্যায়ে থাকে তখন শরীরের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। মস্তিষ্ক তরঙ্গ ব্যস্ততম বিটা লেভেল থেকে পরম সুখময় আশীর্বাদপূর্ণ আলফা লেভেলে চলে যায়।

নিয়তির জালে বন্দী

প্রতিটি মানুষের মাঝেই রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। প্রতিটি মানুষের মাঝেই রয়েছে সম্ভাবনাময় প্রাণশক্তি। কিন্তু শুধু প্রতিভাকে ধারণ করলেই হয় না, প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রয়োজন সঠিক চর্চা। সেই চর্চা ব্যাহত হয় বিভিন্ন কারণে। প্রধান কারণই হচ্ছে আমরা বিভিন্ন সংস্কার, কুসংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা ইত্যাদির দ্বারা প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্থ হই। আর আমাদের সমাজ এবং পরিবেশেও অনেক সময় আমাদের অনুকূল থাকে না। আর তাই আমরাও এমনটাই হয়ে বড় হয়ে উঠতে থাকি যেন পরিবেশ, পরিস্থিতি আমাদের যা করতে বলে আমরাও তেমনটি করতে বাধ্য হয়ে যাই। এতে নিজেদের সৃজনশীলতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কারও হয়ত শিল্প জগতের সাথে জড়িত হওয়ার ইচ্ছা রয়েছে। তার সেই অনুযায়ী প্রতিভাও রয়েছে। কিন্তু পরিবেশ, পরিস্থিত তাকে অনেক সময় সহায়তা করে না। কিংবা পরিবেশ পরিস্থিত তাকে অনেক সময় সহায়তা করে না। কিংবা পরিবেশ পরিস্থিত তাকে নিiæৎসাহিত করে। এভাবে সে একসময় নিয়তির কাছে পরাজয় স্বীকার করে। ফলে সে শিল্প জগতের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে না। নিজের মেধার বিকাশ ঘটাতে পারে না। পরবর্তী জীবনে সে হয়ত যা হয় সেটা তার হওয়ার কোনও ইচ্ছা ছিল না। এভাবে মেধা, প্রতিভা তীব্রভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। কারও হয়ত রাজনীতিবিদ হওয়ার ইচ্ছা প্রখর। কিন্তু বর্তমান সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রথমত পরিবার থেকেই হয়ত বাধা আসল। তারপর একসময় সে উৎসাহ হারিয়ে সাদামাটা একজন পেশাজীবীতে পরিণত হল। কিন্তু একজন দÿ রাজনীতিবিদ হওয়ার মেধা সুপ্তই রয়ে গেল তার ভেতরে। কারণ সাধারণ পেশাজীবী হতে গেলে দক্ষ রাজনীতিবিদ হওয়ার যে মেধা সেটা কাজে লাগানোর কোনও প্রয়োজন নেই।

কারও হয়ত গবেষণা কার্যের প্রতি ভীষণ আগ্রহ। কিন্তু সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা, উৎসাহের অভাবে সেও গবেষণাকার্যে মনোযোগ হারিয়ে পরবর্তী জীবনে সে এমন কিছুতে নিয়োজিত হল যে, যা তার হওয়ার ইচ্ছা ছিল না। এভাবে একটি জাতি কিংবা একটি দেশ একজন দক্ষ বিজ্ঞানী, গবেষক, চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, অমর কথাশিল্পী, চিত্রকর, অভিনয় শিল্পী হারায়। আর সঠিক প্রতিভার বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়ে একজন হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে, কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে। এক সময় জীবনে সে ব্যর্থ হয়। সে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে, সে নিয়তির জালে বন্দী।

আমাদের চারপাশের, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের প্রতিটি পরিবারে, সমাজে অর্থাৎ পুরো জাতির রয়েছে বিপুল মেধাশক্তি এবং বিপুল প্রতিভা। কিন্তু শুধুমাত্র সংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা, অহেতুক ভয় ইত্যাদির কারণে আমরা উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করতে পারছি না। আর ব্যর্থ হয়ে অহেতুক আমরা আমাদের নিয়তিকে অনবরত দোষারোপ করে চলেছি।

কিন্তু এ অবস্থা সুখকর নয়। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের কোনও উপায় খুঁজে নিতে হবে।

মেডিটেশন হচ্ছে এমনি একটি উপায়। মেডিটেশনের মাধ্যমে আমরা অতীতের Møানি, দুঃখ-দুর্দশা ইত্যাদি ভুলে যেয়ে সুন্দর একটি ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারব। মেডিটেশন সঠিকভাবে চর্চা করলে আমাদেরকে নিয়তির জালে বন্দী হয়ে থাকতে হবে না, বরং নিয়তিকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। মেডিটেশনের মাধ্যমে আমাদের সামনে সমস্ত ইতিবাচক চিন্তা-ভাবনার চাবিকাঠি উন্মোচিত হয়। আরেকটি ব্যাপার ভীষণ গুiæত্বপূর্ণ। আর সেটা হল আত্মউপলব্ধি। নিজের অন্তরের শক্তির উন্মোচণ করা, নিয়তির উপর শুধু ভরসা না করে আত্মশক্তি সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য মেডিটেশনের কোনও বিকল্প নেই। আর আত্মউপলব্ধি এমন একটি বিশ্বাস বা শক্তি যার দ্বারা আমরা সব ধরনের সংস্কারের বেড়াজাল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারব।

তাই শুধু নিয়তির বন্ধনে আবদ্ধ না থেকে অন্তরের শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য প্রয়োজন মেডিটেশনের সঠিক দিক নির্দেশনা, সেজন্য লাইফ শাইনিং মেথড্ হতে পারে সকল স্তরের মানুষের জন্য বিশেষ মূলমন্ত্র। লাইফ শাইনিং মেথড্ হতে পারে মানুষের জন্য সকল ধরনের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার জন্য একটি সঠিক উপায়।

কিভাবে যাত্রা করলাম

এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষের জীবন গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সফলতা ব্যর্থতা পর্যায়ক্রমে এসেছে তাদের জীবনে। আর সেই মানুষটিই জীবনে সার্থক যিনি সফলতাকে দীর্ঘায়িত করতে পারেন এবং ব্যর্থতার পরিধি যতটা সম্ভব কমিয়ে আনতে পারেন। আর সফলতাকে মানুষ উপভোগ করে এবং ব্যর্থতার কারণে মানুষ হতাশাগ্রস্থ হয়। কিন্তু একজন মানুষ তখনই সফল যখন তিনি সফলতাকে উপভোগ এবং ব্যর্থতার কারণ এই দুটোর মধ্যে ব্যালেন্স করতে পারেন। কারণ জীবনে চলার পথে হাসি, কান্না, আনন্দ, বেদনা, কষ্ট, শোক, ক্ষোভ এগুলো থাকবেই। আবার একজনের জীবনে শুধু সাফল্যই থাকবে, ব্যর্থতা আসবেনা তাও নয়। কিন্তু সবচেয়ে গুiæত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে আমাদের মন যেন সবসময় সচেতনভাবেই হোক আর অবচেতনভাবেই হোক ইতিবাচকভাবে কাজ করে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ মনই হচ্ছে সকল শক্তির আধার। তাই অতীতের কোনও ব্যর্থতার কারণে হতাশাগ্রস্থ হয়ে থাকলে দেখা যাবে যে বর্তমান এবং ভবিষ্যত দুটোই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। তাই হতাশাগ্রস্থ না থেকে অতীতের ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বের করে সেভাবে নিজেরকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে হবে; পরিচালিত করতে হবে। অতীতের ব্যর্থতার কারণ খুঁজলে দেখা যাবে যে, সেই ব্যর্থতা কোন ধারাবহিক ব্যর্থতারই ফলাফল। সুতরাং কালক্ষেপণ না করে ব্যর্থতা থেকে সফলতার চাবিকাঠি খুঁজে নিতে হবে। আর এজন্যই দার্শনিক কনফুসিয়াস বলেছেন, ***"ব্যর্থতার মাঝেই সুপ্ত থাকে সাফল্যে বীজ।"***

তবে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করাটা মুখের কথা নয়। ধৈর্য ধরে অধ্যবসায় চালিয়ে যেতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। অনুশীলনের কোনও বিকল্প নেই-ব্যাপারটি ব্রেইনে গেঁথে ফেলতে হবে। সঠিক দিক নির্দেশনা অনুযায়ী অনুশীলন, চর্চা চালিয়ে যেতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে- বর্তমান যুগ কম্পিউটারের যুগ, ইন্টারনেটের যুগ। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিcøব ঘটে গেছে গত কয়েক বছরে। কেউ কম্পিউটারে প্রোগামিং শিখতে চাইলে তাকে সেই অনুযায়ী চর্চা করতে হবে। প্রসঙ্গত উÏjøখ করা প্রয়োজন যে, সেক্ষেত্রে কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে তার মেকানিজম বা সেই কৌশলগত বিদ্যার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে কম্পিউটারে দক্ষ হতে চাইবে সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। ইন্টারনেটের ব্যাপারেও বলা যায় যে, এক মুহূর্তে আমরা হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী জায়গায় যোগাযোগ করতে পারছি। ওয়েব সাইটে মুহূর্তেই ভেসে উঠছে হাজার হাজার তথ্য। এখন এগুলো কিভাবে সংগ্রহ করা যায় শুধু সে অনুযায়ী চর্চা চালিয়ে গেলেই হয়। কিন্তু কিভাবে ই-মেইলে যোগাযোগ করা যাচ্ছে কিংবা ওয়েবসাইটে কিভাবে তথ্য ভেসে উঠে তার মেকানিজম জানার প্রয়োজন নেই উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে।

আমাদের ব্যক্তি জীবনেও এ কথা অনস্বীকার্য। আমরা যে উদ্দেশ্যে সফল হতে চাই সেই উদ্দেশ্যে অনুযায়ী চর্চা চালিয়ে যেতে হবে। উদ্দেশ্যে সাথে জড়িত আনুষঙ্গিক বিষয়াদিগুলো আমাদের কাছে গৌণ হওয়া উচিত। সেই সঙ্গে থাকতে হবে একাগ্রতা, মনোযোগ, ধৈর্য এবং পরিশ্রম। সবসময় ইতিবাচক চিন্তার দ্বারা মন পরিপূর্ণ রাখতে হবে। আর এই ব্যাপারটিকে সহজ করে দিতে পারে মেডিটেশন। মেডিটেশন শুiæর দিকে শিথিলায়ন চর্চার মাধ্যমে মনের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করা অর্জন করতে হবে। আর এ অবস্থার নাম হচ্ছে মনের ধ্যানবস্থা। এ অবস্থায় মনের শক্তিকে কাজে লাগানোর আপরিসীম সুযোগ রয়েছে। এ অবস্থায় রোগ মুক্তির কামনা, কোনও কিছুতে সাফল্য লাভের কামনা, বিপদ মুক্তির কামনা অর্থাৎ যে কোনও ইতিবাচক কামনা করলে সাফল্যের সম্ভাবনা শতকরা ১০০ ভাগ, এ অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীবিখ্যাত বিজ্ঞানী, গবেষক, দরবেশ, সাধক শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদগণ প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছেন। তারা যা চেয়েছেন তার জন্য মনের শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন অপরিসীমভাবে।

সুতরাং তারা যদি সফল হয়ে থাকেন আমাদের পক্ষেও সম্ভব সফল হওয়া। কারণ মনের শক্তির উপর অধিকার সম্পূর্ণ নিজের। আর একজন ইচ্ছা করলেই মনের শক্তি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পারে। আমাদের ভুলে যেতে হবে যে, আমরা সাধারণ মানুষ।

কিন্তু এভাবে শুiæ করতে গেলে হয়ত একজনের পক্ষে প্রথমেই সফলকাম হওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন সঠিক দিক নির্দেশনা। মেডিটেশনের প্রচলিত বহু পদ্ধতির মধ্যে বর্তমানে ***“লাইফ শাইনিং মেথড্”*** একটি আধুনিক এবং সেই সঙ্গে একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা যাত্রা শুiæ করতে পারি একটি প্রো-অ্যাকটিভ্ অর্থাৎ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। আমরা কামনা করতে পারি যেন আমাদের যাত্রা সাফল্যমন্ডিত হয়ে আমাদের সঠিক গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে পারি। আমদের ব্রেইনকে আমরা সক্রিয় করতে চাই অর্থাৎ ব্রেইনের ডান ও বাম বলয়-এর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ব্রেইনকে অধিকমাত্রায় সক্রিয় করতে পারি; শক্তিশালী করতে পারি। আমাদের মনের শক্তিকে বাড়াতে পারি বহুগুণ। সুতরাং লাইফ শাইনিং মেথডের মাধ্যমে আমাদের যাত্রা হোক শুiæ।

আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক বিশ্ব সৃষ্টি

দীর্ঘ পথ পরিক্রমা শেষে মানুষ আজ যে যুগে উপনীত হয়েছে তাকে বিজ্ঞানের যুগ বলে অভিহিত করা যায়। বিজ্ঞানের বিচিত্র ও বিস্ময়কর আবিষ্কারের ফলে আমাদের জীবন-যাপন সুখময় হয়ে উঠেছে। আমাদের বাড়িঘরে, অফিস-আদালতে, কল-কারখানায়, কৃষিক্ষেত্রে, চিকিৎসাক্ষেত্রে, শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সুবিন্যস্ত পদচারণ এমনভাবে বিস্তৃত হয়েছে যে, সেটা তালিকাবদ্ধ করার চেষ্টা বাহুল্য মাত্র। মানুষের জীবন এখন বিজ্ঞাননির্ভর, মানুষের কর্মজীবন, কর্ম পদ্ধতি এখন বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত, মানুষের সমৃদ্ধির স্বপ্ন এখন বিজ্ঞান-রাজ্যের মধ্যেই বাস্তবায়নের পথ সন্ধান করছে। আমাদের হাতের কাছের বলপেন থেকে বিস্ময়কর কম্পিউটার, হাতের কাছের নিউজপেপার থেকে শুiæ করে তথ্য প্রযুক্তির সমুদ্র ইনটারনেট, সামান্য ছুরি, কাঁচি থেকে পারমাণবিক বোমা, ঠেলাগাড়ি, রিক্স থেকে আজকের কনকর্ড বিমান, সর্দি-কাশির ওষুধ থেকে হৃৎপিন্ডের বাইপাস সার্জারি ইত্যাদি সবকিছুই বিজ্ঞানের অবদান হিসেবে মানব জীবনকে আধুনিক থেকে আধুনিকতর করছে।

কৃষিকাজে বিজ্ঞানের অবদান মানুষের জন্য সরবরাহ করছে বিপুল খাদ্য সম্ভার, যানবাহনের নতুন নতুন আবিষ্কারে ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী। চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অবদান মানুষের আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছে। আত্মরক্ষার জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার মানুষের চিন্তাশীলতারই বহিঃপ্রকাশ। তবে বিজ্ঞানের সর্বব্যাপী বিস্তৃতি মানুষের জীবনকে সবদিক থেকে উৎকর্ষমন্ডিত ও সুখকর করে তুললেও বৈজ্ঞানিকদের সাধনার এখনও সমাপ্তি ঘটেনি; বরং নিরন্তর গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় বিশ শতকে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের ধ্যান-ধারণায় প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ দীর্ঘদিন বিজ্ঞান ছিল বস্তুকেন্দ্রিক। কিন্তু বর্তমানে সেই বিজ্ঞানই মানুষের চিন্তাশীলতাকে, চেতনাকে, সর্বোপরি মনকে, মনের শক্তিকে অনেক অনেক বেশি গুiæত্ব দিচ্ছে। ফলkÖæতিতে নিউরোসাইন্স, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আধুনিক বিজ্ঞানের জগতে এক বিcøবের সূচনা করেছে। প্রাচ্যের মুণি, ঋষি, সাধকগণ যেভাবে মনকেন্দ্রিক দর্শনকে মনে লালন করেছেন, তেমনি পাশ্চত্যের আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক গবেষকগণ, বিজ্ঞানীগণ মনের শক্তিকেই সকল শক্তির আধার বলে বিবেচনা করছেন। আর বিভিন্ন গবেষণার আলোকে তাই বেরিয়ে এসেছে যে, মনই সকল শক্তির নিয়ন্তা।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ইউজিন উইগনার তার "Remarks on the Mind Body Question" নিবন্ধে লিখেছেন যে, চিন্তাশীলতা অর্থাৎ মনই হচ্ছে মূল। নিবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেছেন, ***"বিশ্বের বৈজ্ঞানিক গবেষণা শেষ পর্যন্ত চেতনাকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।"***

এভাবেই বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ দৃষ্টিভঙ্গী একীভূত হয়েছে প্রাচ্যের সাধকদের মনকেন্দ্রিক দর্শনের সাথে। কেননা মনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আবার মনের শক্তিকে বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু সেটা অবশ্যই কোনও সঠিক দিক নির্দেশনা অনুযায়ী কোন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে।

গত তিরিশ বছরে নিউরোসাইন্স যথেষ্ট বিকাশ লাভ করেছে। নিউরোসাইন্সের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্ক বা ব্রেইন। কেননা মানুষের মন, চিন্তা, দর্শন, বিশ্বাস এসব বস্তুজগতকে প্রভাবিত করতে পারে পুরোপুরিভাবে। আর এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত নিউরোসাইনটিস্ট স্যার জন একলস বলেছেন, ***"আমরা যখন চিন্তা করি, তখন প্রতিটি চিন্তার সাথে সাথে ব্রেইন নিউরোনে অবস্থিত কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণু স্থান পরিবর্তন করে। কার্বন, হাইড্রোজেন ইত্যাদির পরমাণু হচ্ছে বস্তু আর চিন্তা হচ্ছে বস্তু অস্তিত্ব বিবর্জিত।"***

আধুনিক বিজ্ঞানের আরেকটি গুiæত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। জেনেটিক্যাল সাইন্স অনুসারে বলা যায়, সমস্ত প্রাণীর বিকাশের মূলে নিহিত রয়েছে-জেনিটিক কোড তথা ডিএনএ-তে (ডিএন-ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড)। প্রাণের বিকাশ কিভাবে ঘটবে তার সবটাই লিপিবদ্ধ আছে এই ডিএনএ-তে। মানুষ, পশু-পাখি, গাছপালা, ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া সবকিছুরই প্রাণকেন্দ্র এই ডিএনএ।

মানব দেহের বিকাশের দিকটি যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাব যে, মাতৃগর্ভে একটি ডিম্ব এবং একটি শুক্র কীটের মিলনের পর ডিম্বের ডিএনএ ও শুক্রকীটের ডিএনএ মিলে সৃষ্টি হয় নতুন ডিএনএ। একসময় নতুন ডিএনএ পরিণত হয় মানব শিশুতে। আর বর্তমান যুগে এই ডিএনএ কোডকে নিয়ে জেনেটিক্যাল সাইন্স, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রচুর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া নিউরোসাইন্সের গবেষণাও এগিয়ে চলেছে অদম্য গতিতে।

তবে বর্তমান যুগে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক সভ্যতার মানুষ হয়ে আমরা প্রত্যেকেই চাই সুস্থ, সুন্দর, নিরোগ, সাফল্যমন্ডিত জীবন লাভ করতে। আর সেজন্য আমাদের রি-অ্যাকটিভ না হয়ে প্রো-অ্যাকটিভ হওয়া অত্যাবশ্যক। মনের শক্তির সীমানা অসীম। মনের শক্তিকে ইতিবাচকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, মনের শক্তিকে বাড়িয়ে আমরা সুন্দর একটি জীবন লাভ করতে পারি। হতে পারি সাধারণ থেকে অসাধারণ, অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আর এজন্য আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে ***"লাইফ শাইনিং মেথড"*** দিতে পারে মানুষের মনের শক্তিকে বাড়ানোর অভূতপূর্ব প্রেরণা এবং সঠিক দিক-নির্দেশনা। কারণ ***"লাইফ শাইনিং মেথড্"*** মনের শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ এবং মনের শক্তিকে বাড়ানোর জন্য একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।

মেডিটেশন কি?

মেডিটেশনকে আমরা বিভিন্ন ভাবে সংক্ষায়িত করতে পারি। কিন্তু মেডিটেশনের সার্বজনীন সংজ্ঞাটি হচ্ছে ***“সচেতনভাবে মনোযোগ পরিচালনার মাধ্যমে আমাদের সচেতনতার বিভিন্ন ধাপ পরিবর্তন করা।”***

আমাদের মনোযোগ আমরা কিভাবে কিসের কিসের মাধ্যমে পরিচালনা করব তার কোনও সীমাবদ্ধ নেই... হতে পারে সেটা কোনও চিহ্ন, শব্দ, রঙ, শ্বাস-প্রশ্বাস, চিন্তাশক্তিকে উর্ধ্বে উত্তোলন করা আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি মাধ্যমে আমরা তিন ধাপে মেডিটেশনকে বর্ণনা করতে পারি।

স্বাভাবিক অবস্থা মন–

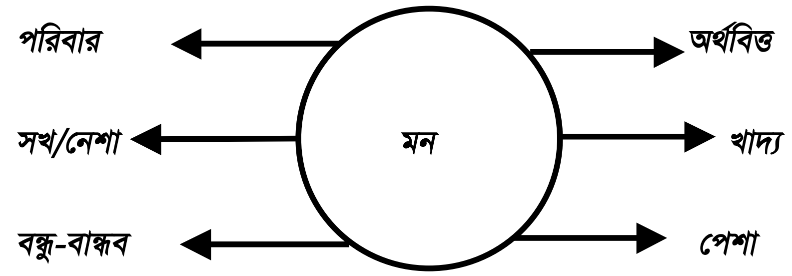

প্রথম ধাপে আমাদের মনের স্বাভাবিক অবস্থা একেবারেই অস্বাভাবিক। কারণ আমরা পার্থিব, জাগতিক বস্তুসমূহের কারণেই হোক আর মস্তিষ্কে সংবেদনশীল কোনও উদ্দীপনার কারনেই হোক-আমাদের মস্তিষ্ক কোনও তথ্য পাচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী আমরা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছি। যদিও এ অবস্থাটাকেই আমরা বলছি যে, আমরা খুবই নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছি। আমরা তখন সহসাই এক চিন্তা থেকে অন্য চিন্তায় অনেকটা লাফিয়ে লাফিয়ে চলি এবং সেই অনুযায়ী আমাদের আবেগ অর্থাৎ শারীরিক মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো ব্যক্ত হয়। আবার সেই একই ধরনের চিন্তা অনেক সময় বিপরীতমূখী হয়। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, ধরা যাক রাস্তায় আমরা একটি কুকুর দেখলাম, তাকে দেখে হয়ত আমাদের কোনও পোষা প্রাণীর কথা মনে পড়ল। ফলে আমরা কুকুরটির প্রতি হয়ত অনেকটা ভালবাসা অনুভব করতে শুiæ করলাম। আবার অনেক সময় সেই একই কুকুর দেখে হয়ত ভয় পেয়ে যেতে পারি। তখন কুকুর দেখে আক্রান্ত হয়ে যাওয়ার ভয় পাওয়াটাও বিচিত্র কিছু নয়।

<u>কেনদ্রীভূত মনোযোগ। মনকে ধ্যানশীল করার প্রচেষ্টা বা ধ্যানমগ্ন মন।</u>

মেডিটেশনের দ্বিতীয় ধাপে আমরা মনকে কেনদ্রীভূত করার চেষ্টা শুiæ করি। প্রকৃতপক্ষে এটাই মেডিটেশনের প্রথম ধাপ। এখন থেকেই শুiæ হয় মনকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা, যার ফলে জীবনকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও অনেকটা শুiæ হয়ে যায়। এই পদ্ধতিটি খুবই সিম্পল বা সাধারণ মনে হতে পারে। কিন্তু মেডিটেশনের পুরো পদ্ধতিতে এমন কিছু জটিল বিষয় থাকে– যা একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের নির্দেশনা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব হয় না।

মেডিটেশনের প্রথম বা প্রধান বিষয়টিই হচ্ছে কোনও উদ্দেশ্য বা বিষয়কে সামনে নিয়ে আসা আমাদের মনোযোগের প্রথম বা প্রধান বিষয় হিসেবে। এরপরে সেটাতে মনোযোগ ছড়িয়ে দেয়া, যাতে কখনই মনোযোগ ভিন্নমুখী না হয়। উদাহরণস্বরূপ বলতে পরি, ধরা যাক আমরা ঠিক করলাম “ভালবাস” এই শব্দটিতে মনোযোগ নিবিষ্ট করতে চাই। শুiæতেই আমাদের শরীরকে রিলাক্স বা শিথিল করতে হবে। খুবই আরামদায়ক পজিশনে অবস্থান নিতে হবে। আবেগকে প্রশমিত করতে হবে। বার বার “ভালবাসা” শব্দটি মনমস্তিত্মষ্কে অনুরণিত করতে থাকবে।

সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে, আমাদের সারা জীবনে মনই হচ্ছে আমাদের প্রভু বা গাইড। কাজেই মেডিটেশনের শুiæতে সহসাই সেই মন তার অবস্থান থেকে হঠাৎ সরে আসতে চাইবে না।

কিন্তু সুকৌশলে সেই মনকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে। চমৎকার এবং অভিনবভাবে সেই বিক্ষিপ্ত মন একপাশে সরে আসবে অর্থাৎ ধ্যানশীল হয়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রে যেটা হয়, হঠাৎ মনোযোগ বিচ্যুতি ঘটে, মেডিটেশনের আসল উদ্দেশ্য থেকে মন সরে যায়।

ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে, আমরা “ভালবাসা” এ শব্দটিতে মনোযোগী হতে যেয়ে হঠাৎ চিন্ত্মা করে বসলাম যে “আমি আইসক্রিম খেতে ভালবাসি। প্রিয় ব্যান্ডের আইসক্রিম অমুক দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। সেখানে আমি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি আমার প্রিয় আইসক্রিমটি কিনতে। তারপর আইসক্রিমটি কিনলাম এবং খেতে শুiæ করলাম..... ইত্যাদি।” অর্থাৎ “ভালবাসা” তে মনোযোগ সন্নিবেশ করতে যেয়ে মনোযোগ প্রিয় কোন খাবারের দিকে সন্নিবেশিত হয়ে গেল। এরকমও হতে পারে।

তবে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার ব্যাপারটি অত্যন্ত্ম সুবিন্যস্ত্ম এবং খুবই সুখময়, আর্শীবাদপূর্ণ।

ধ্যানশীল মন/ধ্যানমগ্ন মন

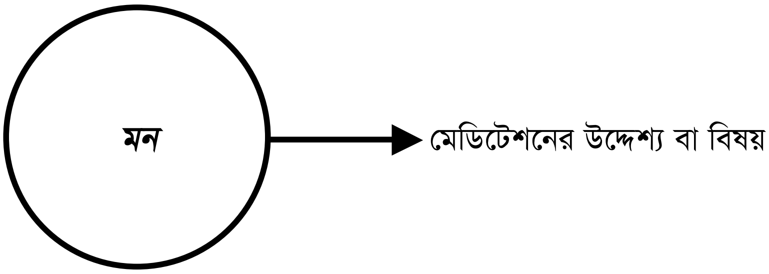

তৃতীয় ধাপটিতে আমরা পরিপূর্ণ ধ্যানশীল অবস্থা বা মেডিটেশন অর্জন করতে সক্ষম হই। এখানে আমাদের অভঙ্গুর এবং অনমনীয় মনোযোগ থাকে।

কেন্দ্রীভূত মন এবং ধ্যানশীল মন এই দুটো ধাপের মধ্যে পার্থক্য বোঝার জন্য সবচেয়ে ক্ল্যাসিক বা সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, ধরা যাক একটি তেলের বোতল থেকে একটি বাটিতে তেল ঢালছি। যখন তেল ফোঁটা ফোঁটা করে বোতল থেকে বাটিতে পড়ছে এই অবস্থাটিকে তুলনা করতে পারি কেন্দ্রীভূত মন বা মেডিটেশনের দ্বিতীয় ধাপ। আর যখন তেল সম্পূর্ণ পড়া হয়ে গেল, যখন বাটিতে তেলের স্রোত বইছে- এই অবস্থাটি হচ্ছে মেডিটেশন বা ধ্যানমগ্ন অবস্থা। আরও ব্যাখ্যা করতে চাইলে বলা যায়, বোতল থেকে তেলের প্রতিটি ফোঁটা পড়ছে। প্রত্যেকটি ফোঁটা যেন আমাদের বিক্ষিপ্ত চিত্ত একপাশে সরিয়ে নিয়ে আসার এক একটি চেষ্টা। যখন বাটিতে তেল পড়া শেষ হল তখন বাটিতে তেলের স্রোতধারা বইতে শুiæ করল। অর্থাৎ যখন আমাদের বিক্ষিপ্ত চিত্ত একপাশে সন্নিবেশিত হয়ে গেল, তখন আমরা সম্পূর্ণ ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলাম। আস্ত্মে আস্ত্মে আমাদের মনোযোগ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। আমরা নিজেরাই অনুধাবন করতে পারব ব্যাপারটি। পুনরায়, আমরা আগের উদাহরণের ফিরে যাই। আমাদের মনোযোগের বিষয়বস্তু “ভালবাসি”, আমরা আমাদের মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করছি। এক সময় দেখব যে, আমাদের মন ভালবাসা সংক্রান্ত্ম বিভিন্ন চিন্ত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। যেমন- মায়ের প্রতি ভালবাস, পিতার প্রতি ভালবাসা, দেশের প্রতি ভালবাস, সন্ত্মানের প্রতি ভালবাসা, অর্থবিত্তের

প্রতি ভালবাস, নাম-যশ, খ্যাতির প্রতি ভালবাসা........ ইত্যাদি। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে ভালবাসার সাথে জড়িত সকল কিছুই আমাদের মনছবিতে ভেসে উঠছে।

আমাদের প্রত্যেকটি চিন্ত্মা, প্রত্যেকটি অনুভূতি, প্রত্যেকটি জ্ঞান সকল কিছুই তখন ভালবাসাকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকবে। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের উক্ত উjøখ্য। তিনি বলেছেন, ***“এই পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুই একটির সাপেক্ষে আরেকটি আপেক্ষিক।”***

সম্পূর্ণ ধ্যানমগ্ন মন

মেডিটেশনের উদ্দেশ্য–

চতুর্থ ধাপ

অর্থাৎ “ভালবাসা” শব্দটিকে ঘিরে থাকা সবকিছু মেডিটেশনের মাধ্যমে আমাদের সাথে যেন যোগাযোগ করতে শুiæ করবে। এক্ষেত্রে মেডিটেশনের উদ্দেশ্যের সাথে আমাদের মনের একাত্বতা ঘটবে। অর্থাৎ এটি চতুর্থ বা শেষ ধাপ। এই ধাপে মনোযোগ বা ধ্যানের পরিপূর্ণ প্রাপ্তি ঘটে। আমরা এই ধাপে সচেতন থাকি ঠিকই কিন্তু সচেতনতার ধাপ পরিবর্তন হয়। একমাত্র আমরা শারীরিকভাবে সচেতন থাকি কিন্তু আমাদের মন আমাদেরকে এই পৃথিবী থেকে আলাদা ভাবতে শুiæ করে। মেডিটেমনের এই অভিজ্ঞতাটুকু অর্জন হয়ে গেলে আমরা বিশ্ব নিখিল সম্পর্কে সচেতন হয়ে যাই, এই পৃথিবীর বা জগতের একটি গুiæত্বপূর্ণ অংশ বলে ভাবতে শুiæ করি। আমাদের আত্মার সাথে জগতের প্রতিটি জিনিষের একাত্মতা অনুভব করতে শুiæ করি। প্রকৃতিপক্ষে এটি অনুধাবন প্রক্রিয়া, সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা। এটা আমাদের এক ধরনের জন্মগত অধিকার, সৃষ্টি, সৌন দর্য, সচেতনতা সম্পর্কে সত্য অনুধাবন নিংসনে দহে উপভোগ্য।

সচেতনতা, আশীর্বাদ এগুলো আমাদের অনাদি, অনন্ত্ম ও চিরন্ত্মন প্রাকৃতিক সত্য। সুতরাং, একজন পাঠকের জন্য মেডিটেশন সংক্রান্ত্ম পাঠ্যাভ্যাস এবং সে সাথে চর্চা বুঝাতে চেষ্টা করবে মেডিটেশন কি এবং কেন আমরা মেডিটেশনকে আমাদের জীবনের গুiæত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে বিবেচনা করব।

মন কি?

গত কয়েক শতকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। দার্শনিক মতবাদও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর বিস্তৃত হয়েছে। মস্তিষ্ক সংক্রান্ত গবেষণারও প্রচুর উন্নতি হয়েছে। নিউরোসাইন্স এগিয়ে গেছে অনেকখানি। কিন্তু মন কি, মন সম্পর্কে ধারণা এখনও যথেষ্ট অস্পষ্ট, বিতর্ক সমন্বিত এবং আমাদের ভাষায় মনকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব। তবে বহু বছরের রিসার্চ এবং পর্যক্ষেণ থেকে বলা যায় যে, মনই হচ্ছে সকল শক্তির নিয়ন্ত্রা। মানুষের মনই হচ্ছে সকল শক্তির উৎস। মনের শক্তির ক্ষমতা সম্বন্ধে জানতে পারলেই আমরা মনের শক্তিকে কাজে লাগাতে পারব।

তবে মন ব্রেইন থেকে সম্পূর্ণই আলাদা। ব্রেইনের নিজস্ব একটা মেকানিজম রয়েছে, একটা কৌশল রয়েছে। কিন্তু মনের অস্তিত্ব যা রয়েছে তা থেকে ব্রেইনের মেকানিজম সম্পূর্ণ ভিন্ন। যদিও আমরা এখন মন এবং ব্রেইনকে সম্পূর্ণ আলাদা বলছি কিন্তু ব্রেইন ছাড়া মনের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ একজন মানুষের অস্তিত্বও ব্যাখ্যা করা যায় না তার মানসিক কার্যাবলীর অস্তিত্ব ছাড়া। আর মানসিক কার্যাবলী সেটাই, যা একজন মানুষকে চিন্তা করায়, কোন কিছুর তাৎপর্য উপলব্ধি করায়, ভালবাসায় অনুপ্রেরণা জাগায়, ঘৃণা করতে শেখায়, শিক্ষা গ্রহণ করতে শেখায়, স্মরণশক্তি বাড়ায়, সমস্যার সমাধান করায়, অন্যদের সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি করায়, সৃজনশীলতা জাগায় এমনকি যে কোনও ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীও শেখায়। আর উপরোক্ত প্রত্যেকটি কাজই ব্রেইনের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। কারণ মন থেকে তাগাদা আসবে, প্রেরণা আসবে যে, শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে কিন্তু ব্রেইন তখন চিন্তাশক্তির যোগান দেবে কিভাবে কাজটি ত্বরান্বিত করা যায়। কোনও সৃজনশীল কাজের প্রেরণা আসবে মন থেকে আর ব্রেইন সেই সৃজনশীল কাজকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করবে। এভাবেই মনের শক্তিকে বাস্তবে রূপ দেয় ব্রেইনের চালিকাশক্তি।

যারা আধ্যাত্মিক লাইনে গবেষণা করেন তারা মনকে আত্মার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে চান। তারা বলেন আত্ম এবং মন পরস্পর একীভূত যার চালিকাশক্তি আসে স্বয়ং স্রষ্টা থেকে।

তবে আমরা যেভাবেই ব্যাখ্যা করিনা কেন, মনের শক্তি হচ্ছে সর্বাধিক গুiæত্বপূর্ণ বিষয়। আর এই মনের শক্তিকে কে কিভাবে ব্যবহার করবে সেটা সম্পূর্ণই তার ব্যাপার। কেউ মনের শক্তিকে সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, কেউ সক্ষম হয় না। আর সেখাহে সফলতা, ব্যর্থতার প্রশ্ন।

জেনেটিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সমস্ত প্রাণীর বিকাশের মূল হচ্ছে ডিএনএ (ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড)। প্রতিটি জীব কেষের কেনদ্রবিন দু হচ্ছে ডিএনএ। একটি প্রাণীর বংশ ক্রমগতির ধারা থেকে শুiæ করে সব ধরনের চারিত্রিক, শারীরিক বৈশিষ্ট্য এই ডিএনএ-তে থাকে। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, গাছপালা, পশুপাখী, মানুষ সবকিছুরই প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে এই ডিএনএ। এই ডিএনএ-এর গঠনও খুবই চমকপ্রদ। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী এবং ডিএনএ বিশেষজ্ঞ ড. জন কেনড্রু বলেছেন, ***"এটি জীব কোষের নিউক্লিয়াস টেপের মত প্যাঁচানো থাকে।"*** ডিএনএ-কে সোজা করা হলে তা এক মিটার লম্বা হয়। আর মানব দেহে এই ডিএনএ-র কাজের সংখ্যা সাত লক্ষ। একটি সেলের ডিএনএ-তে যে তথ্যাবলী রয়েছে, তাকে ভাষান্তর করে লিপিবদ্ধ করতে এক হাজার খন্ড বিশ্বকোষ লাগবে।

মাতৃগর্ভে একটি ডিম্ব এবং একটি শুক্রকীটের মিলনের পর ডিম্বের ডিএনএ ও শুক্রকীটের ডিএনএ মিলিত হয়ে নতুন একটি ডিএনএ সৃষ্টি হয়। এরপর মানব শিশুতে রূপান্তরিত হয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পূর্ণাঙ্গভাবে দেহ ও মনকে বিকশিত করে পূর্ণাঙ্গ মানব দেহে পরিণত হয়। এরপর মনকে পরিচালিত করার জন্য ব্রেইন থেকে সঠিক দিক-নির্দেশনা নিয়ে অগ্রসর হয়।

সুতরাং মনকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে এককভাবে আমরা কখনই মনকে সংজ্ঞায়িত করতে পারব না। কারণ উপরোক্ত আলোচনার সাপেক্ষে বলা যায়, মন এককভাবে পরিপূর্ণ নয়। ব্রেইনের চালিকা শক্তি দ্বারা মন পরিপূর্ণতা লাভ করে। আবার জীবকোষের ডিএনএ যা বংশগতি, শারীরিক বৈশিষ্ট্য, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য সবকিছুর ধারক-বাহক সেটাও মনের গতি প্রকৃতিকে অনেকে মনকে আত্মার সাথে সম্পর্কযুক্ত করেন। সেটাও বহুলাংশে ঠিক। কারণ আত্মার শক্তি যা স্রষ্টা কর্তৃক পরিচালিত, পরিশীলিত, সেটাও মনকে চালিকাশক্তির যোগান দেয়। তারপরও যেহেতু বর্তমান যুগ

কম্পিউটারের যুগ, আধুনিক যুগ। আজকের এই তথ্য-প্রযুক্তি, ইনটারনেট, কম্পিউটার এগুলো মানুষের স্বপ্নেও এক সময় বিচরণ করত না। কিন্তু এখন এগুলো মানুষের হস্তগত। আর তাই বলা যায়, মন কি, মনের গতি প্রকৃতি এগুলো নিয়ে গবেষণা করতে করতে একসময় হয়ত কোনও গ্রহণযোগ্য একক সংজ্ঞা ঠিকই বেরিয়ে আসবে।

প্রাণ কি?

প্রাণ কি? প্রাণকে এক কথায় সংজ্ঞায়িত করার চেয়ে আমরা বরং প্রাণকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে চাই যে কি কি বৈশিষ্ট্য সাপেক্ষে আমরা প্রাণের অস্তিত্ব বিদ্যমান বলতে পারি। যেমন–

গতি অনুভব ঃ প্রাণের অস্তিত্ব তখনই বিদ্যমান বলতে পারি যখন কোন কিছু গতিসম্পন্ন। এমনকি নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও সে গতিসম্পন্ন থাকবে। যেমন–ক্ষুধা লাগলে খাবারের প্রতি টান অনুভব করবে। অতি উষ্ণতা, অতি ঠান্ডা কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত কোনও পরিবেশ থেকে সরে যাওয়ার জন্য একটা গতি অনুভব করবে।

প্রজননে অংশগ্রহণ ঃ প্রজননে অংশগ্রহণ করা প্রাণের অস্তিত্ব ঘোষণা করে উjjøখযোগ্যভাবে। কারণ প্রাণ আছে এমন কোনও কিছু বংশবৃদ্ধি করে। তবে তার পদ্ধতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হতে পারে।

খাদ্যগ্রহণ এবং পুষ্টিসাধন ঃ প্রাণের অস্তিত্ব আছে এমন কোনও কিছু খাদ্যগ্রহণ করে এবং খাদ্য গ্রহণ করার সাথে সাথে তার পুষ্টি সাধনও হয়। আর এই খাদ্যগ্রহণ, পুষ্টি সাধন সবকিছুই তার প্রাণের অস্তিত্বকে রক্ষা করা জন্য।

বৃদ্ধি ঃ সময়ের বিবর্তনে প্রাণের অস্তিত্ব আছে এমন কিছুই অবশ্যই বৃদ্ধি ঘটবে। আর সেটা শারীরিকভাবেই হোক কিংবা মানসিকভাবেই হোক।

উদ্দীপনায় সাড়া দেয়া ঃ প্রাণ আছে এমন কোনও কিছু অবশ্যই উদ্দীপনায় সাড়া দেবে। আর সেটা অন্তঃস্থ উদ্দীপনাই হোক, কিংবা বহিরাগত উদ্দীপনাই হোক। প্রাণ আছে এমন কিছু অবশ্যই যৌন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হবে। স্নায়ুবিক উত্তেজনাও তাকে উদ্দীপিত করবে বিশেষভাবে।

সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি যে, উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো যাতে বিদ্যমান তাতেই প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। প্রাণকে সংজ্ঞায়িত করতে আরেকটি বিশেষ গুiæত্বপূর্ণ ব্যাপার আলোচনা করা দরকার। আর তা হচ্ছে "দম"। বাতাসের অক্সিজেন পরমাণু আমাদের দম নেয়ার সাথে সাথে আমাদের ফুসফুসের প্রায় স্বচ্ছ পর্দা অতিক্রম করে রক্তের হিমোMøাবিনের সাথে যুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই জীবন্ত হয়ে ওঠে। প্রতিবার দম নেয়ার সাথে সাথে ১১ x $১০^{২১}$ টি অক্সিজেন পরমাণু শরীরে প্রবেশ করছে।

সুতরাং এই দমের ব্যাপারটিও বিচিত্র। কারণ চোখের নিমিষে প্রাণহীন অক্সিজেন পরমাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করার সাথে সাথে জীবন্ত হয়ে উঠছে, ব্যাপারটি সত্যিই বিস্ময়কর। সাধারণত ৬০ সেকেন্ড ব্যায়াম কালে ১৫ সেকেন্ডে অক্সিজেন পরমাণু আমাদের পুরো শরীর ঘুরে আসে একবার।

অক্সিজেন আমাদের কার্যকলাপে পুরোপুরিভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। আবার অক্সিজেন নিউরো-ট্রান্সমিটারের সাথে জড়িত হয়ে আমাদের একটি সুখকর চিন্তায় পরিণত হতে পারে। আবার এড্রিনালিন হরমোনের সাথে জড়িত হয়ে আমাদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে। Møyকোজের সাথে মিশে ব্রেন সেলের খাবারে পরিণত হতে পারে। আবার শ্বেত কনিকার অংশ হয়ে আক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়াকে প্রতিহতও করতে পারে।

কিন্তু যাই কiæক তা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ডিএনএ ***(ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড)*** দ্বারা। তবে জীবন ও প্রাণের মূলে রয়েছে এক অন্তর্চেতনা। আর এই অন্তচেতনার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারলেই আমরা প্রাণের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারব।

প্রকৃতপক্ষে মনের শক্তি আমাদের অন্তর্চেতনারই একটি রূপমাত্র। মনের শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই আমরা জীবনে সফল হই বা অগ্রসর হই। পৃথিবীতে যারা সফল ব্যক্তিত্ব তারা তাদের মনের শক্তিকে পরিহর করে ইতিবাচক চিন্তার দ্বারা মনের শক্তিকে বৃদ্ধি করা। আর মনের শক্তির সুদৃঢ় প্রকাশই প্রাণের অস্তিত্বের জয়গান ব্যক্ত করে।

মেডিটেশন (প্রাণায়াম)

সত্যি কথা বলতে কি, পৃথিবীতে যে জিনিসের উপরে এখনও ট্যাক্স বসে নাই সে জিনিসটি হল বাতাস বা অক্সিজেন। আমরা জানি, আমাদের শরীর অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। তাহলে আমরা এক কথায় বলতে পারি, অক্সিজেন আমাদের প্রাণ। আর সেজন্যই আগেকার মুণি, ঋষিরা বলতেন, প্রাণায়াম। সত্যি কথা বলতে কি অজান্তে হলেও আমরা ৯০% লোক ঠিকমত অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারি না। অথচ শক্তির প্রধান উৎস অক্সিজেন দেহের প্রতিটি কোষে পৌঁছে রক্তের মাধ্যমে। একজন পূর্ণবয়স্কের শরীর গড়ে রক্তের পরিমাণ আড়াই থেকে তিন লিটার। এক হাজার পৃথক পৃথক iæটে এই রক্ত প্রবাহিত হয়ে শরীরের ৭৫ ট্রিলিয়ন সেল বা দেহকোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং কোষে সঞ্চিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে সে ফুসফুসে ছেড়ে দেয়। আবার ফুসফুস থেকে অক্সিজেন নিয়ে রক্ত ছুটে চলে দেহ কোষে। এভাবেই দেহকোষের খাবার অক্সিজেন পৌঁছাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই প্রক্রিয়ায় আমাদের হার্ট প্রতিদিন গড়ে ৩ থেকে ৪ হাজার লিটার রক্ত পান করে। আর এই রক্ততে অক্সিজেন সমৃদ্ধ করে আমাদের ফুসফুস।

সুতরাং আমরা গভীরভাবে অনুধাবন করলাম, অক্সিজেনই আমাদের শক্তি, অক্সিজেনই আমাদের প্রাণ। কিন্তু আমাদের এই প্রাণ অক্সিজেন আমরা ঠিকমত গ্রহণ করতে না পারায় শতকরা ৯০ জনের মধ্যে আসছে আলস্য-নির্জনতা, প্রাণচাঞ্চল্যের অভাব এবং সেই সঙ্গে কর্ম উদ্দীপনাও হারিয়ে ফেলছি। আর সেজন্যই আমরা প্রথমেই বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে শিখব। চর্চা করব প্রাণায়ামের।

এই প্রাণায়াম করার জন্য কোনও জায়গার প্রয়োজন নেই। কোনও বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন নেই। আপনি দাঁড়িয়ে, বসে যখন খুশী, যে কোনও অবস্থাতেই প্রাণায়ম করতে পারেন। আচ্ছা আমরা মনে করি, একটি শক্ত কাঠের চেয়ারে বসলাম। মেiæদন্ড সোজা করে বসুন। হাত দুটি দুই উiæর পাশে ছেড়ে দিন। একদম রিল্যাক্স। হালকাভাবে চোখ বন্ধ কiæন। åæ এবং চোখ কুচঁকাবেন না। চোখের দু'পাতাকে ধীরে ধীরে একসাথে লেগে যেতে দিন। চোখ বন্ধ করার সাথে সাথে আপনি কোনও কিছু দেখা থেকে বিরত থাকছেন। সবচেয়ে সক্রিয় ইনিদ্রয় চোখকে বিশ্রাম দেয়ায় কোনও কিছু থেকে উত্তেজিত বা চিন্তাগ্রস্ত হওয়া থেকে রেহাই পাচ্ছেন। এবার নাক দিয়ে লম্বা দম নিন। আস্তে আস্তে মুখ দিয়ে দম ছাড়ু ন। দম নেবেন এক বিশেষ পদ্ধতিতে। বুক ফুলিয়ে নয়। দম নেয়ার সাথে ধীরে ধীরে আপনার পেটের উপরিভাগ ফুলবে। আবার দম ছাড়ার সময় পেটের উপরিভাগ চুপসে যাবে। দম নেয়া ও ছাড়ার সময় ধীরে ধীরে পেটের উপরের অংশ ওঠানামা করবে।

১, ২, ৩, ৪, ৫ এভাবে গুণে গুণে অন্তঃথ ১০ বার দম নিন। দম নেয়ার চেয়ে দম ছাড়তে বেশি সময় নিন। এভাবে ৫-১০ বার দম নেয়ার পর দম স্বাভাবিক হতে দিন। অর্থাৎ দম নাক দিয়ে নিয়ে, নাক দিয়েই ছাড়তে থাকুন।

আর এভাবে আপনি যখনই সময় পান, যে কোনও অবস্থাতেই প্রাণায়ম চর্চা করুন। এভাবে আপনি হয়ে উঠবেন সুন্দর, সজীব দীর্ঘজীবি এবং প্রাণবন্ত।

বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের স্বরূপ

বিশ্বাসকে আমরা নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। তবে যেভাবেই আমরা বলি না কেন, বিশ্বাসের শক্তি অপরিসীম, এক এবং অদ্বিতীয়। প্রথমেই বলা যায়, বিশ্বাস কোন আবেগ নয়। বিশ্বাস কোন অনুভূতিও নয়। অথবা নয় কোনও অন্ধ সংস্কার। কিংবা বিশ্বাস কোন মানসিক তাগাদাও নয়, বিশ্বাস কোনও অস্পষ্ট অতিপ্রাকৃত ব্যাপারও নয়। বিশ্বাস কারও নিজস্ব হস্তগত জিনিস নয়, কিংবা বিশ্বাস একজন আরেকজনের সাথে শেয়ারও করতে পারেনা। বিশ্বাস কোনও বৈজ্ঞানিক ঘটনাও নয়।

থমাস মার্টন (Thomas Marton) রচিত নিউ সিড্স অফ কনটেমcøশন (New seeds of contemplation) নামক বইটিতে বিশ্বাসকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে-

প্রথম বিশ্বাস হচ্ছে একটি বুদ্ধিভাবাসম্পন্ন মানসিকতা যা মনকে সুনিপুন করে। মনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে আমরা কোন নির্দিষ্ট, নিশ্চিত উপসংহার টানতে পারি। বিশ্বাস এমন একটি গুiæত্বপূর্ণ অবস্থা, যার দ্বারা স্রষ্টার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা যায়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বিশ্বাস মনের এমন একটি ধারণা যা আমরা সত্য বলে ধরে নিই। বিশ্বাস হচ্ছে মনের এমন একটি প্রস্তাবনা যার কোনও সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকলেও আমরা সেটা সাপোর্ট করে যাই। কেউ কেউ এভাবেও বলেন, ***'বিশ্বাস একটি সাধারণ ব্যাপার যা আমরা প্রতিনিয়ত চর্চা করে যাই।'***

জে. হেওয়েজ (J.Hawes) বলেছেন, "বিশ্বাস হচ্ছে স্রষ্টার ঐশ্বরিক বিধি বিধানগুলোর প্রতি সন্দেহ বাস্তবসম্মত দৃঢ়তা স্থাপন।"

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মই একটি বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের মনের শক্তি অপরিসীম এবং মনের শক্তির ক্ষমতাও সুদূরপ্রসারী। মনের শক্তিকে একজন মানুষ তখনই সফলভাবে কাজে লাগাতে পারে, যখন তার বিশ্বাসের জোরও থাকে প্রবল। অর্থাৎ বিশ্বাসের জোরের উপর ভিত্তি করে মনের শক্তি এগিয়ে যাবে হাজার হাজার গুণ। মানুষের ব্রেনই হচ্ছে সকল কিছুর নিয়ন্তা। নিউরো সাইনটিস্টদের কথা অনুযায়ী বলা যায়, ***মানুষের ব্রেইন সর্বাধুনিক কম্পিউটারের চেয়েও কমপক্ষে দশ লক্ষ গুণ বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন।*** কিন্তু সাধারণ মানুষেরা ব্রেনর ৪% - ৫% ক্ষমতা ব্যবহার করে থাকে। পক্ষান্তরে পৃথিবীবিখ্যাত প্রতিভাবনা, সফল ব্যক্তিরা ব্রেনের ১০% - ১৫% ব্যবহার করে থকেন। সুতরাং ব্রেইনের এই অপরিসীম ক্ষমতা ব্যবহার করার জন্য বিশ্বাসের ভূমিকা অপরিসীমা।

সর্বাত্মক অন্তঃকরণে বিশ্বাস করতে হবে যে, আমার মস্তিষ্ক অপরিসীম শক্তির আধার। আর এই শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার দায়িত্ব আমার। অর্থাৎ প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে ব্রেইনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবনে সফল হওয়ার ইচ্ছা দৃঢ়তার সঙ্গে পোষণ করতে হবে।

প্রচলিত কথা আছে যে, ***"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদুর।"*** আমাদের ব্যক্তি জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোনও অসুস্থতার কারণে আমরা যে চিকিৎসা গ্রহণ করতে চাই; যদি তার উপর আমাদের শতকরা ১০০ ভাগ বিশ্বাস না থাকে তাহলে দেখা যাবে যে, চিকিৎসা গ্রহণ করেও আমাদের খুব একটা লাভ হচ্ছে না।

তবে জীবনে সফলকাম হতে গেলে বিশ্বাসের সাথে সাথে আনুষঙ্গিক গুণাবলীও থাকতে হবে একজন মানুষের। যেমন– পরিশ্রম, ধৈর্য, উদ্যম, অভিনিবেশ এবং সেই সঙ্গে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। যে চাত্র প্রথম চেষ্টায় পাঠ্যসংক্রান্ত কিছুই বুঝতে পারেনা তখন তাকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে, সে অবশ্যই সাফল্য অর্জন করতে পারবে ছাত্র জীবনে। এভাবে বিশ্বাস নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করে গেলে লেখাপড়ায় সাফল্য আসতে বাধ্য।

শুধু তাই নয়, ইতিহাসের পাতা উল্টালেই বিশ্বাসের তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারি। মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ), গৌতম বুদ্ধ, যীশু খৃস্ট, শ্রীকৃষ্ণ সত্যের বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে মনে প্রাণে বিশ্বাসী ছিলেন তাদের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে। তারা মানব জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন সত্য বিশ্বাসী হওয়ার জন্য। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা বিশ্বাসের চর্চার আরও উদাহরণ খুঁজে পাব। স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট e^aæস, ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ডের সাথে বারংবার যুদ্ধে পরাস্ত হয়েও

থেমে থাকেননি। অন্তরে পোষণ করেছেন যে, তিনি জয়ী হবেন। পরিশেষে তিনি জয়ী ও হয়েছিলেন। বিশ্বাসের জোর তাকে শেষ পর্যন্ত জয়ী করেছে। ইতিহাসে চিরস্মরণীয় অর্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর নেপোলিয়ন বিশ্বাসের বলে বলীয়ান ছিলেন বলেই কোন কাজকে অসম্ভব বলে মনে করতেন না। তাই তিনি একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও চরম আত্মবিশ্বাস নিয়ে শ্রম নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে গেছেন বলেই ফরাসি আলভা এডিসন বিশ্বাস করতেন যে, তিনি একটি সঠিক বৈদ্যুতিক বাতি তৈরি করতে পারবেন। এই বিশ্বাসই তাকে গবেষণার ক্ষেত্রে দশ হাজার বার ব্যর্থতার পরও এগিয়ে নিয়ে গেছে। তিনি সক্ষম হয়েছিলেন সঠিক ধাতু প্রয়োগ করে যথার্থ বৈদ্যুতিক বাতি তৈরি করতে।

বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বহুকাল গবেষণা করে উদ্ভিদের চেতনা শক্তি ও স্পনদন সম্বন্ধে তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। তখন তাঁর মতামতকে অনেকেই হেয় বলে প্রতিপন্ন করেছিল। কিন্তু জগদীশচন্দ্র বসু আত্মবিশ্বাসী ছিলেন তার গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর। আর সে কারণেই তিনি এক সময় বিশ্ববরেণ্য বেজ্ঞানিক বলে স্বীকৃতি লাভ করলেন। সত্যেন বসু, সুনীতি কুমার চট্রোপাধ্যায়, শেরে বাঙলা-এরা সকলেই তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে সফল আর তাদের সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল বিশ্বাস। আমরা বাঙ্গালী মাত্রই তাদের জন্য গর্বিত। পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন দরিদ্র ব্রাক্ষণ পরিবারের সন্তান। কিন্তু চরম আত্মবিশ্বাস নিয়ে সাধনা করে গেছেন বলেই উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী সন্তানের সম্মান লাভ করেছিলেন।

উইলিয়াম ক্যারী বাল্যকালে গাছে উঠতে পা ভেঙে ছিলেন। ভাল হবার পর তিনি আবার সেই গাছে ওঠার জন্য বারবার চেষ্টা করেন এবং এভাবে সকলের আগে গাছে আরোহণ করার ক্ষমতা অর্জন করেন। কারণ তার মনে বিশ্বাস ছিল যে, তিনি গাছে উঠতে সফল হবেনই। আর এ বিশ্বাসই তাকে সাফল্য এনে দিয়েছিল।

এরূপ দৃষ্টান্ত আমেরিকা আবিষ্কারক কলম্বাসের মধ্যে দেখা যায়। তিনি যখন পর্তুগালের রাজসভাতে আমেরিকা আবিষ্কারের প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন তখন স্বয়ং রাজা পর্যন্ত তার প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কলম্বাস ছিলেন তার বিশ্বাসে অটল। আর তিনি সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মাত্র কয়েকজন সহচর নিয়ে জাহাজে আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করলেন। সবাই তখন ভেবেছিল যে, এটাই কলম্বাসের শেষ যাত্রা। তার ক্ষুদ্র জাহাজ সাগরবক্ষে অগ্রসর হতে থাকল। আহার্য ও পানীয় প্রায় শেষ হয়ে এল। সহচরদের অনেকেই হতাশ হয়ে প্রত্যাবর্তনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করল। কিন্তু কলম্বাস ছিলেন বিশ্বাসে অবিচল। তার বিশ্বাস ছিল যে তিনি নতুন মহাদ্বীপ আবিষ্কার করবেনই। আর তাই অবিচলিত উদ্যমে জাহাজ চালিয়ে তার লক্ষ্য-স্থলে পৌঁছে ছেলেন।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আইরিশ নাট্যকার জর্জ বার্নাডাশ দারিদ্র্যের কারণে পড়ালেখা করতে পারেননি। কিন্তু তার মনস্কামনা ছিল তিনি লেখক হবেন এবং বিশ্বাস করতেন যে তিনি একদনি বড় লেখক হবেন। এভাবে তিনি তার চেষ্টা শুiæ করলেন। লেখক হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা পেতে সময় লেগেছিল মাত্র ৯ বছর।

তেমনিভাবে আব্রাহাম লিংকন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, জ্যোর্তিবিদ গ্যালিলিও, বাস্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কারক জেমস্ ওয়াট, জর্জ স্টিফেনসন, চীনা মাটির বাসন নির্মাতা বার্নাড প্যালিসি, বেতার যন্ত্রের সার্থক আবিষ্কারক মার্কনী সবাই জীবনে সফল এবং তাদের সাফল্যের ধারক-বাহক ছিল বিশ্বাস, প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস।

সুতরাং আমরাও যেন আমাদের বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হতে পারি সেজন্য আমাদের অধ্যবসায় চালিয়ে যেতে হবে। সেই বিখ্যাত কথাটা মনে রাখতে হবেঃ

“সুনদর দিন সবার জন্যই অপেক্ষা করে কেউ চেষ্টা করে ডেকে আনে, কেউ আনে না।” আর এই আনা না আনার সাথেই রয়েছে বিশ্বাসের সম্পর্ক। বিশ্বাসকে পুঁজি করে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ হতাশা মানব জীবনের ধর্ম নয়। যাদের আত্মবিশ্বাস আছে তারা কখনও হতাশাগ্রস্ত হয় না। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তারা পরিশ্রমের গুণে জীবনে মহৎ কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। এই সংসার জীবনে জয়ী হতে সমস্ত ভয়-ভাবনা দূর করে কর্মের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। পরাজয়কে ভাবতে হবে অলঙ্কার, প্রেরণাশক্তি। আত্মবিশ্বাস মানুষকে তীক্ষèবুদ্ধি, বিদ্যা, বিচার ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি লাভ করতে সাহায্য করে। আর এভাবে একজকন আত্মবিশ্বাসী মানুষই কেবল পারেন কর্ম ও নিষ্ঠা দিয়ে পৃথিবীর বুকে কীর্তি স্থাপন করে অমরত্ব লাভ করতে।

ব্রেইন কি?

মানুষের ব্রেইন কি– এটাকে এক কথায় সংজ্ঞায়িত করা খুবই কঠিন। কারণ ব্রেইন নিয়ে প্রচুর গবেষণা হলেও এখনও সার্বিকভাবে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য, বোধগম্য সংজ্ঞা হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে এমনটি নেই। তবে ব্রেইন বলতে আমরা সাধারণ মানুষেরা যা বুঝি আর তা হচ্ছে– এমন একটি অঙ্গ (Organ) যা মানুষের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে অবস্থান করে এবং যা মানুষের সমস্ত মানসিক শক্তি, চিন্তা, স্মৃতি, অনুভূতি, উদ্দীপনা, কর্মোদ্যম ইত্যাদিসহ সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার এভাবেও বলা যায় ব্রেইন হচ্ছে মানুষের সমস্ত নার্ভাস সিস্টেমের কেন্দ্র। মানুষের সমস্ত কর্মের চালিকা শক্তি আসে এই ব্রেইন থেকে। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব এই ব্রেইনের জন্যই। এই পৃথিবীতে যত সৃজনশীল, সুন্দর, সুস্থ, বিজ্ঞানসম্মত কাজকর্ম সম্পন্ন হয়েছে তার সমস্ত দিক-নির্দেশনাও এসেছে এই ব্রেইন থেকে। অর্থাৎ ব্রেইনের শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে একজনের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। তবে ব্রেইন সংক্রান্ত গবেষণা সফল বিস্তৃতি লাভ করে ষাট এর দশকে এবং ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ম্যাসাচুসেট ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (M.T.T)। এই ইন্সটিটিউট চালু করে নিউরোসাইন্স রিসার্চ প্রোগ্রাম (N.R.P.)। তাদের সাথে অংশগ্রহণ করে মার্কিন ন্যাশনাল হেলথ্ ইন্সটিটিউট, ইউনিভার্সিটি অব্ ক্যালিফোর্নিয়া, জার্মানীর ম্যাক্স cøাংক ইন্সটিটিউট সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা। বর্তমানে নিউরোসাইন্সও যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে ব্রেইন কি এই সংক্রান্ত গবেষণায়। কিন্তু এত গবেষণার পরও ব্রেইনকে সহজভাবে সহজ কথায় ব্যাখ্যা করা মুশকিল। কারণ ব্রেইন সত্যিই এক জটিল অঙ্গ। ডঃ সিলভিয়া হেলেনা যিনি ব্রেইন এন্ড মাইন্ড ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান সম্পাদক (Editor-in Chief and Founder, Brain and Mind) তিনি ব্রেইনকে সংজ্ঞায়িত করতে যেয়ে বলেছেন- "মানুষের ব্রেইন এই পৃথিবীতে (Earth) সবচেয়ে জটিল গঠন সম্পন্ন একটি বস্তু, কিংবা বলা যায় এই নিখিল বিশ্বে (Universe) সবচেয়ে জটিল গঠন প্রকৃতিসম্পন্ন একটি বস্তু। কিন্তু ব্রেইন এমন একটি বস্তু যার অবস্থান মস্তিষ্কের ভেতরে (মস্তিষ্কের খুলির অভ্যন্তরে) যা দর্শনীয়, ধরা যায়, ছোয়া যায়, স্পর্শও করা সম্ভব। ব্রেইনের রাসায়নিক গঠন প্রকৃতির মধ্য রয়েছে রাসায়নিক পদার্থসমূহ, এনজাইমসমূহ এবং কিছু হরমোনসমূহ- যেগুলো পরিমাণ পরিমাপযোগ্য এবং গবেষণা কার্যাবলীর উপযোগী। আর ব্রেইনের গঠন প্রণালীর বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে রয়েছে স্নায়ুকোষসমূহ (Neuronal cells), পাথওয়েজ (pathways) বা নিউরোনের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সিনাপসেস (Synapses)। একটি নিউরোনের সাথে অপর নিউরোনের সংযুক্তি সার্কিটে একটা ফাঁক থাকে। একেই বলা হয় সিনাপসেস। ব্রেইনের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয় বা ব্রেইনের কার্যাবলী নির্ভর করে স্নায়ুর (Neuron) উপর। আর নিউরণ অক্সিজেন গ্রহণ করে, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থসমূহ আদান-প্রদান করে ঝিjøী (Membrane) দ্বারা। এছাড়া নিউরন ইলেকট্রিক্যাল পোলারাইজেশন (Polarize) দুই বিপরীত মেiæর বা প্রান্তের প্রতি আকৃষ্ট করান অথবা হওয়া) ও মেইনটেইন করে যখন ইলেকট্রিক্যাল পোলারাইজেশন কোন কারণে ব্যাহত হয়।"

ডঃ সিলভিয়ার দেয়া উপরোক্ত সংজ্ঞাটি বর্তমানে খুবই গ্রহণযোগ্য এবং সহজবোধ্য।

ব্রেইন কিভাবে কাজ করে-এ সংক্রান্ত গবেষণা এখন প্রচুর হচ্ছে। ব্রেইন এতটাই সুক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মাতীত কাজ করে যা আমাদের ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। যেমন-রাস্তায় পথ চলতে গেলে যদি বিপদজনক কিছু আমরা দেখি যেমন-ম্যানহোল, ময়লা-অবর্জনা, কলার খোসা ইত্যাদি তখন আমরা সরে যাই। আমাদের মনের অজান্তেই আমরা তেমনটি করে থাকি। আগুনে হাত দেই না, পানিতে ঝাঁপ দেই না সচেতনভাবে। এগুলো সব কিছুই ব্রেইনের দেয়া দিক-নির্দেশনা থেকে হয়। এছাড়া ব্রেইন অনেক সময় নিজেই নিজের ক্ষতির পরিপূরক। আর তাই ব্রেইনের কার্যাবলী নিয়েও গবেষণার অন্তঃ নেই।

পি. হ্যাগারড্ বি. লাইবেট (P.Haggard, B.Libet) ব্রেইনের কার্যাবলী নিয়ে গবেষণা করেছেন। গবেষণার বিষয়বস্তু– "Conscious intention and brain activity" অর্থাৎ সচেতন অভিপ্রায় বা ইচ্ছা এবং ব্রেইনের কার্যকারিতা। লাইবেটের গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, সচেতন ইচ্ছাপ্রবৃত্তিগুলো হচ্ছে বহু পূর্বে থেকে ব্রেইনের

কার্যাবলী বা বিচলন দ্বারা সৃষ্ট প্রস্তুতি পর্বের ধারাবহিক ফলাফল। নিম্নে ব্রেইনের কার্যাবলী সংক্রান্ত একটি ডায়াগ্রাম দেয়া হল যা লাইবেটের গবেষণা থেকে নেয়া–

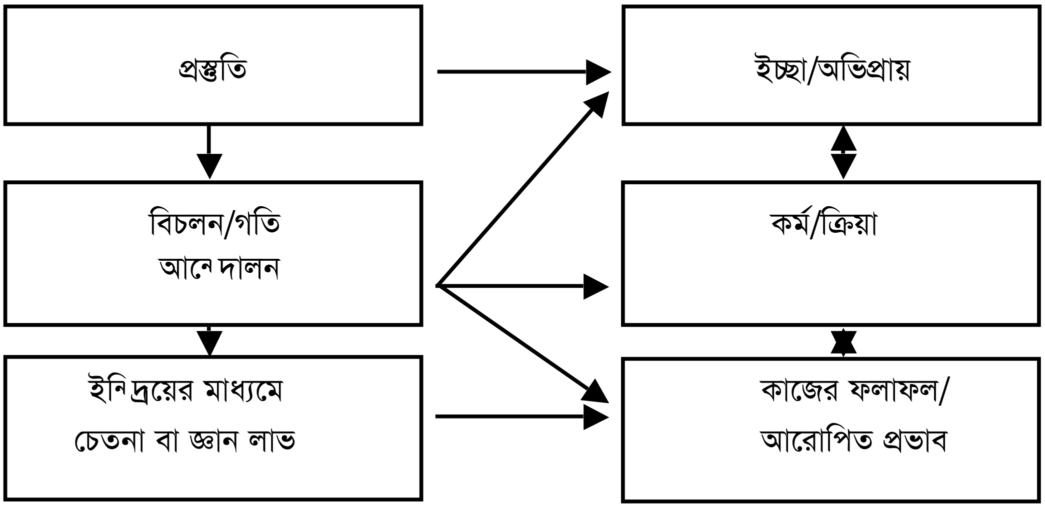

স্নায়ু সংক্রান্ত ঘটনা
বা ফলাফল

জ্ঞাত বা সচেতনতা
সংক্রান্ত ঘটনা বা ফলাফল

বর্তমানে মানুষের ব্রেইনকে কম্পিউটারের সাথে তুলনা করা যায়। মানুষের ব্রেইন যদি হয় কম্পিউটার তাহলে মানুষের মন সেই কম্পিউটারে রান করা একটি প্রোগ্রাম। যদিও উপরোক্ত কথায় কিছুটা কাব্য রয়েছে কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানী, গবেষক, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ, প্রোগ্রামার, দার্শনিক সবাই ব্যাপারটিকে সাপোর্ট করছেন যে মানুষের ব্রেইন কম্পিউটারের সাথে তুলনীয়। এক্ষেত্রে আমরা এখন প্রশ্ন করতে পারি মানুষের ব্রেইনের মেমোরী কত মেগাবাইট (গেগাবাইট অথবা টেরাবাইট ইত্যাদি) সম্পন্ন। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যে কি বিশাল শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী সেটা কল্পনা করা যায় না। বিশ্বের একটি সুপার কম্পিউটার হচ্ছে সাতটন ওজনবিশিষ্ট ক্রে-১ কম্পিউটার। আর মস্তিষ্কের ওজন দেড় কেজি। ক্রে-১ প্রতি সেকেন্ডে ৪ শত মিলিয়ন ক্যালকুলেশন করতে পারে। মস্তিষ্ক পারে ২০ হাজার বিলিয়ন। ক্রে-১ কম্পিউটার প্রতি সেকেন্ডে ৪০০ মিলিয়ন ক্যালকুলেশন হিসেবে একশত বছর কাজ করলে মস্তিষ্কের মাত্র ১ মিনিটের কার্যক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে।

ব্রেনের নিউরোনের যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে তুলনা করলে মস্তিষ্কের সামনে এটির তুলনামূলক অবস্থান হবে একটি চীনা বাদামের সমান। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ব্রেইনকে বলছেন একটি জৈব কম্পিউটার যার অসীম ক্ষমতা এবং সম্ভাবনা এখনও পুরোটাই প্রায় অব্যবহৃত রয়েছে। এছাড়া ব্রেইনের কার্যাবলী সম্পর্কে ধারণা পেতে গেলে ব্রেইনের সিন্যাপসেসে-এর সংখ্যাটাও জাiæরী বিষয়। সিন্যাপসেস-এর সংখ্যার রেঞ্জ ১০ ১৩ থেকে ১০ ১৫। ব্রেনের কাজকর্ম পরিচালিত হয় ইলেকট্রো কেমিক্যাল পদ্ধতিতে। ব্রেইন পরিচালনায় প্রয়োজন হয় ২০ থেকে ২৫ ওয়াট বিদ্যুৎ। প্রতি সেকেন্ডে এক কাজ গভীর মনোযোগ দিয়ে করা হয় তখন প্রচন্ড ভারী ব্যায়ামের সমান ক্যালরি খরচ হয়। আর ব্রেইন কখনই ক্লান্ত হয় না। ২৪ ঘনটায় কাজ করে। গভীর ঘুমের সময়ও ব্রেইন সক্রিয় থাকে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, ব্রেইন কি এবং ব্রেইনের কার্যকারিতা এগুলো এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা অসম্ভব। তবে যে বিষয়টি গুiæত্বপূর্ণ আর তা হচ্ছে ব্রেইনকে কে কতখানি কিভাবে ব্যবহার করল। শুধু তাই নয় কতখানি সাফল্যের সাথে ব্যবহার করল সেটাও গুiæত্বপূর্ণ বিষয়। আরেকটি ব্যাপারও খুব গুiæত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে সাধারণ মানুষ তার ব্রেইন সম্পর্কে, ব্রেইনকে সে কতখানী সাফল্যের সাথে ব্যবহার করতে পারবে এই ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নয় কিংবা জ্ঞাত নয়। বিশেষ করে আমাদের দেশে এই ব্রেইন সংক্রান্ত ধারণাগুলো খুব বেশি প্রচলিতও নয়। কিন্তু মানুষকে তাই ব্রেইন সম্পর্কে সচেতন করতে গেলে প্রথমেই তাকে একটি সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন। আর এ ব্যাপারে মেডিটেশনের বিকল্প নেই। লাইফ শাইনিং মেথডের সাহায্যে মেডিটেশন করার মাধ্যমে মানুষ তার ব্রেইনের ক্ষমতা সম্পর্কে

জানতে সচেষ্ট হতে সক্ষম হবে। আর এভাবে ব্রেইনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে একজন সাধারণ মানুষও হয়ে উঠতে পারেন একজন আলোকিত মানুষ। হয়ে উঠতে পারেন একজন মেধাসর্বস্ব চৌকষ ব্যক্তিত্ব। সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করা তখন আর হয়ত স্বপ্ন থাকবে না বাস্তব হয়ে ধরা দেবে আমাদের চোখের সামনে।

*মানসিক চাপ/*Mental Stress *কি?*

আমাদের জীবনের চলার পথে বিভিন্ন সময়ে আমরা Mental Stress বা মানসিক চাপের শিকার হই। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে মেন্টাল স্ট্রেস বা মানসিক চাপকে একটি শারীরিক কৌশলগত টার্ম বলে বিবেচনা করা হয়। প্রতিটি মানুষই জীবনের বিভিন্ন সময়ে কষ্ট, দুর্দশা, অবসাদ, না পাওয়ার বেদনা, অসুস্থতা, ক্ষোভ প্রভৃতি কারণে স্ট্রেস বা চাপের শিকার হয়।

স্ট্রেসকে বহুভাবেই সংজ্ঞায়িত করা যায়, কিন্তু একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যখন বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং ঘটনাসমূহ আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয় তখন মানসিক চাপ বা স্ট্রেস হয় খুব সাধারণ এবং স্বাভাবিক রেসপন্স। অথবা বলা যায়, যখন বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং ঘটনাসমূহ আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয় তখন আমাদের মন-মানসিকতা যেভাবে সাড়া দেয় তাকেই আমরা Mental Stress বা মানসিক চাপ বলতে পারি। স্ট্রেট বা মানসিক চাপ শুধুমাত্র খারাপ ঘটনাবলী, কষ্ট, দুঃখ-দুর্দশা ইত্যাদির কারণে হতে পারে তা নয়। অনেক সময় অনেক ভাল কোনও কারণেও মানুষ মানসিক চাপের স্বীকার হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একজন মানুষের চাকুরীতে হঠাৎ করে কোনও সমস্যা সৃষ্টি হলে তখন সে মানসিক চাপের শিকার হতে পারে। আবার একজন বেকার মানুষ যদি হঠাৎ চাকুরী পেয়ে বসে তখনও সে মানসিক চাপের শিকার হতে পারে। কারও বাবা-মা কিংবা কোনও প্রিয়জন মারা গেলে মানুষ স্ট্রেসের সম্মুখীন হয়। আবার কারও সন্তান হলে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে স্ট্রেসের শিকার হতে পারে। পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট হওয়ার diæন যেমন স্ট্রেস হতে পারে, তেমনি পরীক্ষায় আশাতীত ভাল রেজাল্ট করার কারণেও কেউ মানসিক চাপের শিকার হতে পারে।

সুতরাং অল্প-বিস্তর যদি কেউ স্ট্রেসের সম্মুখীন হয় তাহলেই সেটা খুব খারপ এটা বলা যাবে না, বরং সামান্য স্ট্রেস বা মানসিক চাপ আমাদের শরীরকে গতিময় করে, সচল করে। জীবনে চলার পথে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে আমাদের চালিকাশক্তি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। কিন্তু সেই স্ট্রেস বা মানসিক চাপ যদি দীর্ঘায়িত হয় কিংবা স্ট্রেসের পরিমাণটাই যদি বেশী হয় সেক্ষেত্রে অনেক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন- মাথা ব্যথা, পেটের পীড়া, উচ্চ রক্ত চাপ, হার্ট অ্যাটাক ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে স্ট্রেস বা মানসিক চাপকে শÎæ না ভেবে স্ট্রেসকে জীবনের অংশ ভাবতে হবে এবং তারপর যেসব কারণে আমরা স্ট্রেসের শিকার হচ্ছি সেগুলো দুর করার জন্য মনোযোগী হতে হবে। আমরা যেহেতু রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। বিভিন্ন কারণে আমাদের স্ট্রেসের সম্মুখীন হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেক্ষেত্রে নিজেদেরকে দোষারোপ না করে, যতটা সম্ভব নেতিবাচক চিন্তা পরিহার করে মেন্টাল স্ট্রেস বা মানসিক চাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করাটাই সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত।

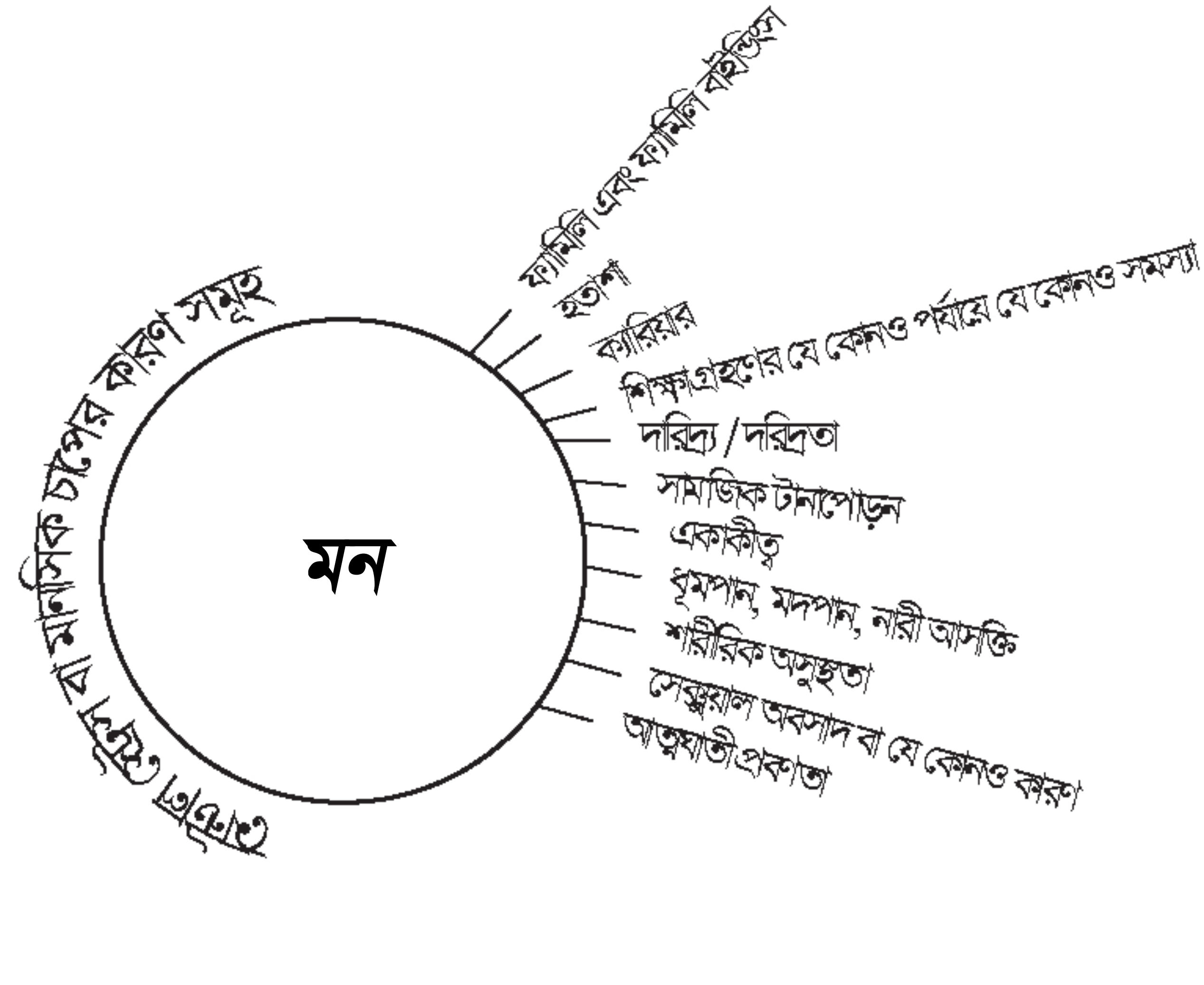
বা মানসিক চাপের কারণ সমূহ
মন
ফ্যামিলি এবং ফ্যামিলি বহির্ভূত
হতাশা
ক্যারিয়ার
শিক্ষাগ্রহণের যে কোনও পর্যায়ে যে কোনও সমস্যা
দারিদ্র্য / দরিদ্রতা
সামাজিক টানাপোড়েন
একাকীত্ব
ধূমপান, মদপান, নারী আসক্তি
শারীরিক অসুস্থতা
সেক্সুয়াল অবসাদ বা যে কোনও কারণ
আত্মঘাতী প্রবণতা

মানসিক চাপের (Mental Stress) কারণসমূহঃ

১। ফ্যামিলি এবং ফ্যামিলি বাইন্ডিংস

২। হতাশা

৩। ক্যারিয়ার

৪। শিÿা গ্রহণের যে কোনও পর্যায়ে যে কোনও ধরনের সমস্যা

৫। দারিদ্র/দরিদ্রতা

৬। সামাজিক টানা-পোড়ন

৭। একাকীত্ব

৮। বিভিন্ন ধরনের নেশা (ধূমাপান মদ্যপান, নারী আসক্তি)

৯। শারীরিক অসুস্থতা

১০। সেক্সুয়াল (Sexual) অবসাদ

১১। আত্মঘাতী প্রবণতা

১। ফ্যামিলি এবং ফ্যামিলি বাইন্ডিংস ঃ

আমরা সবাই কোন না কোনভাবে পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ। একটি পরিবারে একসাথে বসবাস করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তবে যে সমস্ত্ম সমস্যাগুলোর জন্য আমরা মানসিক চাপের সম্মুখীন হই সেগুলো হচ্ছে ডিভোর্স, সেপারেশন, মাতৃবিয়োগ, পিতৃবিয়োগ কিংবা কোনও প্রিয়জন হারানোর বেদনা, শোক ইত্যাদি। এসমস্ত্ম ব্যাপারগুলোর জন্য যদি কেউ আগে থেকে তৈরী না থাকে তাহলে সে প্রচন্ড চাপের সম্মুখীন হয়ে থাকে। একটি পরিবারে একজন আরেকজনকে শ্রদ্ধা করবে। অন্ত্মতঃপক্ষে ছোটরা বড়দেরকে সম্মান করবে। বড়রা ছোটদেরকে স্নেহ করবে। এর ব্যতিক্রম ঘটলেও যে কেউ মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়ে থাকে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, কারো মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে তার পরিবার, পরিবারের মানুষগুলো এবং সর্বোপরি তার পরিবারের পরিবেশ। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, ফ্যামিলি একটি বিশেষ প্রভাবক মানসিক চাপের জন্য।

২। হতাশা ঃ

হতাশা কিংবা বিষণ্নতা একটি রোগ। কেন একজন মানুষ হতাশায় আক্রান্ত্ম হয় কিংবা কেন একজন মানুষ বিষণ্নতায় ভুগছে তার সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে সাধারণত যা হয় একজন মানুষের চাওয়ার সাথে পাওয়ার সামঞ্জস্য না থাকলে সে চরম হতাশাগ্রস্ত্ম হয়ে যেতে পারে। ফলkÖæতিতে সে মানসিক চাপ বা মেনটাল স্ট্রেস-এ পতিত হয়।

৩। ক্যারিয়ার ঃ

ক্যারিয়ার গঠন একটি মানুষের জন্য ভীষণ রকমের গুiæত্বপূর্ণ ব্যাপার। হয়ত একজন মানুষ প্রচন্ড অধ্যবসায়ী এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধিমান। কিন্তু সে যে রকম ক্যারিয়ার আশা করছে সে-রকম ক্যারিয়ার তার হল না, তখন সে ভীষণরকম মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে পারে। এতে তার মারাত্মক শারীরিক অসুস্থতাও এক সময় দেখা দিতে পারে।

আবার কেউ হয়ত খুব একটা চেষ্টা করল না কিন্তু তার ক্যারিয়ার হয়ত অনেক উজ্জ্বল হয়ে গেল। এতেও সে হয়ত প্রচন্ড মানসিক চাপের সম্মুখীন হবে। তবে এটা ততটা ÿতিকারক নয়। কারণ আমাদের জীবনে চলার পথে সম্পূর্ণভাবে আমরা মানসিক চাপকে উপেক্ষা করতে পারি না। তাই অনেক সময় চাওয়ার চেয়ে পাওয়া বেশি হয়ে গেলেও আমরা মানসিক চাপের শিকার হতে পারি। এক্ষেত্রে ক্যারিয়ারের ব্যাপারটি একটি বিশেষ উদাহরণ হতে পারে। কারও হয়ত কর্ম যোগ্যতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা সীমাবদ্ধ কিন্তু তার ক্যারিয়ারের ব্যাপারে আশা আকাংক্ষা আকাশ ছোঁয়া। যদি সে আকাশ ছোঁয়া ক্যারিয়ারকে অতিক্রম করতে না পারে তখনও সে প্রচন্ড মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে পারে।

৪। শিক্ষাগ্রহণের যে কোনও পর্যায়ে যে কোনও ধরনের সমস্যা ঃ

প্রতিটি মানুষ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাগ্রহণ করে। শিক্ষা গ্রহণের যে কোনও পর্যায়ে সমস্যার উদ্ভব হতেই পারে। উদাহরণস্বরূপ, বলা যায় বাচ্চারা যখন স্কুলে পড়াশোনা করে তখন একদিকে থাকে তাদের প্রচন্ড পড়াশোনার চাপ এবং অন্যদিকে থাকে খেলাধুলা করার প্রচন্ড ইচ্ছা কিংবা টি.ভি-তে বিভিন্ন চ্যানেলে অনুষ্ঠান, কার্টুন ছবি দেখার ইচ্ছা। এই দুই টানাপোড়নে শিশুরাও প্রচন্ড মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে পারে। আবার স্কুল জীবন শেষে কেউ পছনেদর কলেজে ভর্তি হতে পারল না, যার দiæন সে মানসিক চাপের শিকার হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কেউ হয়ত প্রবেশ করতে পারল-ই না; আবার কেউ পারল কিন্তু পছনদসই সাবজেক্ট পেল না। এতেও কেউ মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে প্রবশে করে কেউ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার কারণে আশানুরূপ রেজাল্ট করতে পারে না। পরবর্তী জীবনে এটাই তার মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং শিক্ষvজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানসিক চাপের সম্মুখীন হওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়।

৫। দরিদ্রতা ঃ

দরিদ্রতা একটি বিশেষ কারণ সব ধরনের অসুস্থতার জন্য, হোক সেটা মানসিক কিংবা শারীরিক। বিশেষ করে আমরা যারা তৃতীয় বিশ্বের বাসিনদা তাদের ক্ষেত্রে এটি একটি কমন সমস্যা। প্রতিটি মানুষেরই ইচ্ছা থাকে ভালভাবে জীবন- যাপন করার জন্য। বিলাসবহুল জীবন-যাপন না করলেও অন্তত সার্বিক প্রয়োজন তাই দরিদ্রতার কারণে অনেকেই মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়ে থাকে। টাকা-চিকিৎসা করতে পারেন না। কেউ হয়ত জীবন-যাপনের নূন্যতম প্রয়োজনটুকুই মেটাতে সক্ষম হয় না। সেক্ষেত্রে যা হয় বিফল হয়ে মানুষ মানসিক চাপের শিকার হয়ে নানারকম অসুস্থতায় পতিত হয়।

৬। সামাজিক টানাপোড়ন ঃ

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে থাকাটা সৃষ্টির আদিকাল থেকেই প্রচলিত হয়ে এসেছে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককে সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ অবশ্যই ভাবতে হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও সমস্যার অন্ত নেই। কারণ জীবন-যাপনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যারকে মোকাবেলা করে চলতে হয়। বিশেষ করে আমাদের সমাজ এখনও অনেক রক্ষণশীল। নানারকম কুসংস্কার এখনও প্রচলিত। এছাড়াও আছে বিভিন্ন ধরনের প্রচলিত সামাজিক নিয়ম-কানুন। উদাহরণস্বরূপ, বলা যায় বর্তমানে আমাদের দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি মেয়ে এখনও সন্ধ্যার পরে রাস্তাঘাটে নিরাপদ নয়। তার হয়ত কোনও বিশেষ প্রয়োজন থাকতে পারে। কিন্তু সামাজিকতার প্রেক্ষাপটে সে বাইরে সন্ধ্যার পরে বের হলে মানসিকভাবে চাপের সম্মুখীন হয়। এরকম বিভিন্ন ধরণের কারণে মানুষ মানসিক চাপের শিকার হতে পারে।

৭। একাকীত্ব ঃ

একাকীত্ব যে কতবড় মারাত্মক মানসিক চাপের কারণ সেটা বলে শেষ করা যাবে না। মানুষ বিভিন্ন কারণে এক হয়ে যেতে পারে। মাতৃবিয়োগ, পিতৃবিয়োগ কিংবা যে কোন প্রিয়জন হারানো। অথবা যে কোনও কারণে একজন মানুষের চারপাশে তার পছনদনীয় লোকদের অনুপস্থিতি তাকে এক করে তুলতে পারে। আর এরপর বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতার শিকার হতে থাকে। এছাড়া একেবারে বন্ধুহীন হয়ে যাওয়াটাও একাকীত্বের একটা বিশেষ কারণ যার জন্য মানুষ মানসিক চাপের শিকার হতে পারে।

৮। বিভিন্ন ধরনের নেশা (ধূমপান, মদ্যপান, নারী আসক্তি) ঃ

কোনও কারণ ছাড়াই মানুষ বিভিন্ন ধরনের নেশায় আসক্ত হয়ে যেতে পারে। যেমনঃ ধূমপান, মদ্যপান, নারী আসক্তি ইত্যাদি। এ সমস্ত নেশায় মানুষ সঙ্গদোষেও আসক্ত হয়ে যেতে পারে কিংবা কৌতুহলবশত অথবা পরিস্থিতির

কারণেও হতে পারে। কিন্তু যে কারণেই হোক না কেন যে কোনও নেশাগ্রস্থতার ফলাফল মারাত্মক। মানুষের জীবনীশক্তি উদ্যম, উচ্ছ্বাস সবই ফুরাতে থাকে নেশায় আসক্তির কারণে। ফলkÖæতিতে একমসয় মানুষ অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। ফলে মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে থাকে। পত্রিকার পাতা উল্টালেই আমাদের চোখে পড়ে নারী আসক্তির জন্য কত সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে। মদ্যপানের জন্য মানুষ লিভার সেরোসিস সহ নানারকম মারাত্মক অসুস্থতার শিকার হচ্ছে। ধুমপানের জন্য টাকার যোগাড় করতে না পেরে কত অল্পবয়সী ছেলেরা অন্ধকার জগতে পা বাড়াচ্ছে। কিন্তু যাই ঘটুক নেশায় আসক্তি কোনও শুভ ফল বয়ে আনে না। জীবনের একটা পর্যায়ে যেয়ে মানুষ অনুভব করে মারাত্মক মানসিক চাপ।

৯। শারীরিক অসুস্থতা ঃ

শারীরিক সুস্থতা মানুষের জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। একেবারেই অসুস্থতাকে এড়িয়ে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু অসুস্থতার মাত্রা বেশি হয়ে গেলে তখন আমরা মানসিক চাপের সম্মুখীন হই। উদাহরণস্বরূপ, বলা যায় অল্প বয়সে কারও হার্টের অসুখ, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্ত চাপ ইত্যাদি দেখা দিলে তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মানসিক চাপের সম্মুখীন হওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। এছাড়া জীবন হরণকারী রোগ যেমনঃ ক্যান্সার, এইডস্ ইত্যাদিতে আক্রান্থ হলেও মানুষ মানসিক চাপের শিকার হতে পারে। অসুস্থতার কারণে একটি পূর্ণ সক্ষম মানুষ অক্ষম হয়ে যেতে পারে। সুতরাং মানসিক চাপ থেকে মুক্তির জন্য শারীরিক সুস্থতার কোনও বিকল্প নেই একথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি।

১০। সেক্সুয়াল* (Sexual) *অবসাদ ঃ

প্রতিটি মানুষই চায় পরিপূর্ণভাবে যৌনসুখ উপলব্ধি করতে। কিন্তু অনেক সময় পারিবারিক জীবনে অশান্তির জন্য মানুষ সেটা পারে না। পারিবারিক জীবনে কেউ যদি পরিপূর্ণ যৌনসুখ উপভোগ করতে অক্ষম হয় তখন মানুষ বাইরে নিষিদ্ধ জায়গায় গিয়ে যৌনপরিতৃপ্তি খুঁজতে চেষ্টা করে। একসময় ব্যর্থ হয়ে মারাত্মক মনোদৈহিক রোগের শিকার হয়। আবার অনেকে অতিমাত্রায় উৎসাহী থাকে যৌন পরিতৃপ্তি লাভের জন্য। এই অতিরঞ্জনের জন্যও অনেক সময় সেক্সুয়াল অবসাদের ভূগতে থাকে। ফলkÖæতিতে সে মানসিক চাপের সম্মুখীন হয। সুতরাং যৌন অতৃপ্তিকেও আমরা মানসিক চাপের একটি বিশেষ কারণ বলতে পারি।

১১। আত্মঘাতী প্রবণতা ঃ

জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে ব্যর্থ হয়ে মানুরেষর মাঝে হঠাৎ আত্মঘাতী প্রবণতা জেগে উঠা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু আত্মঘাতী প্রবণতা একটি মারাত্মক ধরনের বিকারগ্রস্থতা। এর দ্বারাও মানুষ একসময় মানসিক চাপের শিকার হতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মানসিক চাপের উ<jøখযোগ্য কারণগুলোর উপর আলোকপাত করলাম। কিন্তু এছাড়া আরও অনেক কারণই থাকতে পারে যেগুলো হয়ত আপাত দৃষ্টিতে অর্থহীন মনে হতে পারে কিন্তু সেগুলোর কারণেই একজন মানুষ প্রচন্ড মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে পারে।

মেডিটেশন (আলফা ড্রইং iæমে যাওয়া)

চেয়ারে মেiæদন্ড সোজা করে আগের ভঙ্গীমায় বসুন। হাত দুটি দুই উiæর উপরে আলতো করে ছেড়ে দিন। একদম রিলাক্স। এবার হালকাভাবে চোখ বন্ধ কiæন। নাক দিয়ে ধীরে ধীরে দম নিন। মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। ধীরে দম নিন, ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। দম নিতে নিতে ভাবুন, প্রকৃতি থেকে অফুরন্ত্ম প্রাণশক্তি আমার দেহে প্রবেশ করছে। দম ছাড়তে ছাড়তে ভাবুন শরীরের সকল দুষিত পদার্থ বাতাসের সাথে বিড়িয়ে যাচ্ছে। এভাবে অন্ত্মতঃ ৫-৬ বার দম নিন এবং দম ছাড়ুন। এবার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে দিন। নাক দিয়ে দম নিন। নাক দিয়ে দম ছাড়ুন। এবার অনুধাবন কiæন, আপনার সমস্ত্ম শরীর শিথিল হয়ে আপনি এবার কল্পনায় দেখুন আপনার সামনে মাত্র গজ দূরে একটি সুন্দর চক্চকে ধবধবে অতি পরিস্কার একটি মনের মত ড্রইংiæম। যার দরজাটি আপনার মনের মত নকশা করা। ঠিক যেমনটি আপনি চেয়েছিলেন।

আপনি এবার উঠুন এবং এক হতে দশ বলার সাথে সাথে আপনি ধীরে ধীরে ড্রইংiæমের মাঝখানে গিয়ে উপস্থিত হবেন। এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়-সাত-আট-নয়-দশ। আপনি এখন ড্রইiæমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনি দেখছেন, আপনার ড্রইংiæমের দক্ষিণ দেয়ালে একটি সাদা কাপড়ের পর্দা টানানো। এই পর্দার নাম আলফা পর্দা। আর আপনার এই ড্রইং iæমটির নাম আলফা ড্রইংiæম। এটি একটি দাiæন শক্তিশালী iæম। এর iæমে এসে যাই কল্পনা করাবেন তাই বাস্ত্মবে প্রতিফলিত হবে। কিন্তু অন্যায় বা অন্যের ক্ষতির কিছু চিন্ত্মা করলে তৎক্ষণাৎ আপনার মনের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার দ্বারা আর কোনও কিছু সম্ভব হবে না।

আপনি এবার আপনার ড্রইংiæমের মাঝখানে দক্ষিণ দিকে মুখ করে সুন্দর একটি চেয়ার বসান। আপনার মনঃপুত সোনা, রূপা, কাঠের যে কোনও চেয়ার বসাতে পারেন। এই ড্রইংiæমটি একান্ত্মভাবে আপনার। এটাকে যেমন খুশী তেমন করে, মনের মত করে সাজিয়ে নিন। ঠিক আপনার iæচির সাথে মিলিয়ে যেমনটি আপনি চেয়েছেন।

সময় ঃ এক মিটিন

সাজানো শেষ হলে আপনার সেই পছন্দের চেয়ারটিতে গিয়ে বসুন। এবার অটোসাজেশন দিন। অন্যায় ছাড়া যে কোনও আটোসাজেশন আপনি দিতে পারেন। মনে রাখবেন আপনার এই আলফা ড্রইং iæম, এক বৃহৎ শক্তিশালী iæম। আপনি এখানে বসে যাই কল্পনা করবেন তাই বাস্ত্মবায়িত হবে। এরপর যতবার চোখ বন্ধ করবেন এবং এক থেকে দশ গোনার সাথে সাথে আপনি আপনার স্বয়ংক্রিয় আলফা ড্রইংiæমে এসে উপস্থিত হবেন এবং আপনার নির্ধারিত চেয়ারে বসতে পারেন। আপনার সামনের এই সাদা পর্দায় আপনার মনছবিও দেখতে পারেন এবং অটোসাজেশনও দিতে পারেন। যেমন- এই ড্রইং iæমে বসেই আপনি সব গুiæত্বপূর্ণ কাজ, অটোসাজেশন, পত্যয়ণ, মনছবি ইত্যাদি দেখবেন।

এবার শূন্য থেকে পাঁচ গণনা করে আলফা ড্রইং iæম থেকে বেরিয়ে আসুন।

মেডিটেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি

মেডিটেশন চর্চা সংক্রান্ত্ম ইতিহাস গবেষণা করলে দেখা যায় মেডিটেশন করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যদিও একই ব্যাপার কিন্তু সেটা বিভিন্নভাবে হতে পারে। আর এক্ষেত্রে একজন প্রশিক্ষকের ভূমিক বিশেষ গুiæত্বপূর্ণ। বর্তামানে প্রশিক্ষকগণ অনেক সময় তাদের নিজেদের মত করে মেডিটেশনের পদ্ধতিটি সাজিয়ে দেন। আবার অনেক সময় যারা চর্চা করেন তাদের ব্যাপারটাও বিশেষ গুiæত্বপূর্ণ। কারণ একটি পদ্ধতিতে একজন হয়ত মেডিটেশন চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সফল হল, কিন্তু আরেকজন সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে সফল নাও হতে পারে। তবে যে কোনও পদ্ধতিতেই করা হোক না কেন, সবচেয়ে জাiæরী বিষয় হচ্ছে, প্রতিদিন সকালে অন্ত্মঃত ২০ মিনিট মেডিটেশন চর্চা করা এবং প্রতিদিন বিকালে ২০ মিনিট মেডিটেশন চর্চা করা। তবে মেডিটেশন পদ্ধতিই এই পরামর্শ দেয় যে, মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে মানুষের শারীরিক আত্মিক এবং মানসিক এতটাই উন্নতি সাধিত হোক যেন সে প্রতি মূহূর্তে পৃথিবীর সাথে তার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করতে পারে। সেই সাথে সে যেন তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে তা সে খুব আনন্দ, উত্তেজনা, রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ, ক্রোধ যে কোনও অবস্থানেই থাকুক না কেন। যে কোনও পদ্ধতিতে মেডিটেশন চর্চার জ্ঞান থাকাটা একজন মানুষের জন্য একটি বিশেষ শক্তিশালী হাতিয়ার– যার দ্বারা সে প্রতিনিয়ত ইতিবাচক চিন্ত্মার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে। কারণ যে পদ্ধতিতেই মেডিটেশন চর্চা করা হোক না কেন উদ্দেশ্য একই। অর্থাৎ নিজেকে প্রশান্ত্ম করে সবধরনের মানসিক চাপ বা স্ট্রেস, মানসিক দ্বন্দ্ব, শারীরিক অসুস্থতা বা কোনও ধরনের অসমতাকে জয় করে একটি নির্মল, প্রশান্ত্ম সুন্দর জীবন-যাপন করা।

তবে বিভিন্ন ধরনের মেডিটেশনের পদ্ধতির আরেকটি গুiæত্ব হচ্ছে– ধরা যাক, কোনও একটি গন্ত্মব্যস্থলে যেতে একজন মানুষের একটি রাস্ত্মাই জানা। কোনও কারণে সেই রাস্ত্মা দিয়ে যেতে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হলে তখন যদি তার বিকল্প রাস্ত্মা না জানা থাকে তাহলে তার হয়ত সেই গন্ত্মব্যস্থলে পৌঁছানোই সম্ভব হবে না। কিন্তু তার হয়ত সেই গন্ত্মব্যস্থলে পৌঁছানোটা খুবই জাiæরী। ঠিক তেমনি মেডিটেশনের একটি পদ্ধতিতে কেউ একজন সফল কাম না হতে পারলে তখন আরেকটি পদ্ধতিতে সে চেষ্টা শুiæ করতে পারে। আর এক্ষেত্রে একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুiæত্বপূর্ণ।

বর্তমানে মেডিটেশন নিয়ে গবেষণার সাথে সাথে মেডিরেটশনের চর্চার বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়েও গবেষণা হচ্ছে। নিম্নে মেডিটেশনের ১০৮টি পদ্ধতির নাম উjøখ করা হল। অর্থাৎ এই ১০৮টি পদ্ধতির যে কোনও একটি পদ্ধতিতে মেডিটেশন করা যাবে। যেমন–

১। ভিজুয়ালাইজেশন অফ সেলুলার হিলিং (Visualization of Cellular Healing)

২। ইনার গার্ডেন অফ ইডেন (Inner Garden of Eden)

৩। ভিজুয়ালাইজ পারফেক্ট সেল্ফ (Visualize Perfect self)

৪। ই=এম.সি^{২} ($E=Mc^2$)

৫। বাথিং ইন প্রটেকটিভ লাইন (Bathing in Protective Light)

৬। লিটল বুদ্ধ, বিগ্ বুদ্ধ (Little Buddha, Big Buddha)

৭। হিলিং (Healing)

৮। মানডালাস (Mandalas)

৯। ৪-৪-৮ (4-4-8)

১০। বিল্ডিং এ্যান ইনার টেম্পল (Building an Inner Temple)

১১। ক্লাইম্বিং দ্যা হলি মাউনেটন (Climbing the Holy Mountain)

১২। দ্যা এন্ড অফ গিল্ট (The End of Guilt)

১৩। পাওয়ার স্পট (Power Spot)
১৪। মেডিটেশন ২৪ x ৭ (Meditation 24 x 7)
১৫। অ্যাস্ট্রাল ট্র্যাভেল (Astral Travel)
১৬। শ্যালো ব্রিদিং (Shallow Breathing)
১৭। রিক্যাপচারিং লস্ট অ্যাস্ট্রাল এনার্জি (Recapturing Lost Astral Energy)
১৮। আই অ্যাম (I Am)
১৯। প্রিপেয়ারিং টু রেইনকার্নেট (Preparing to Reincarnate)
২০। অ্যাস্ট্রাল হিলিং (Asteral Healing)
২১। ভিজুয়ালাইজেশন অফ এ ডীউটি (Visualization of a Deity)
২২। ইনার বাথিং ইন আলট্রা ভায়োলেট লাইট (Inner Bathing in Ultra Violet Light)
২৩। হিলিং ইউথ্ ওম্ (Healing with OM)
২৪। হিলিং উইথ্ প্রেয়ার (Healing with prayer)
২৫। ট্রান্সেন্ডিং কার্মা (Transcending Karma)
২৬। হিলিং উইথ্ টাচ্ (Healing with touch)
২৭। ইনার বাথিং ইন হিলিং ওয়াটার (Inner Bathing in Healing Water)
২৮। ভিজুয়ালাইজেশন অফ ইনার হিলার (Visualization of Inner Healer)
২৯। এলিমেন্টস্ (Elements)
৩০। রাইট আই/লেফট আই (Right Eye/Left Eye)
৩১। ফিলিং দ্যা মাইন্ড টু এম্পটি দ্যা মাইন্ড (Filling the mind to empty the mind)
৩২। হ্যাভ নো হেড (Have no Head)
৩৩। থার্ড আই মেডিটেশন (3rd Eye Meditation)
৩৪। সান (Sun)
৩৫। স্পেস বিটুইন অ্যাটমস্ (Space beetween Atoms)
৩৬। ইউনিভার্সাল পার্সপেকটিভ্ (Universal Perspective)
৩৭। নট্ দ্যা বডি, নট ইমোশনস্, নট দ্যা মাইন্ড (Not the Body, Not the Emotions, Not the Mind)
৩৮। দ্যা দালাই লামা মেডিটেশন (The Dalai Lama Meditation)
৩৯। রেইনকার্নেশন (Raincarnation)
৪০। ডেথ্ (Death)
৪১। ব্লেসড্ সাফারিং (Blessed Suffering)
৪২। উইটনেসিং (Witnessing)
৪৩। কস্মিক কনশাস্নেস (Cosmic Consciousness)
৪৪। ওম্ (Om)
৪৫। ওম্ শান্তি (Om Shanti)
৪৬। ডিভাইন ট্রানসেন্ডেন্ট ওয়াইজডম (Divine Transcendent Wisdom)
৪৭। বিয়িং হেয়ার, নাও (Being Here, Now)
৪৮। অ্যাফারমেশনস্ (Affirmations)

৪৯। টাচ্ (Touch)
৫০। টেস্ট (Taste)
৫১। স্মেল (Smell)
৫২। হেয়ারিং (Hearing)
৫৩। সাইট্ (Sight)
৫৪। কোট অভ মেনি কালারস্ (Coat of Many colors)
৫৫। মিরর মেডিটেশন (Mirror Meditation)
৫৬। আনন্যাচারাল পজিশনস্ (Unnatural Positions)
৫৭। উইট্‌নেসিং হেবিচুয়াল বিহ্যাভিয়র (Witnesing Habitual Behaviour)
৫৮। কনসেনট্রেটিং অন স্পট (Concentrating on Spot)
৫৯। কনসেনট্রেটিং অন এ ফ্লেম (Concentrating on a Flame)
৬০। হার্ট ফিল্ড উইথ্ লাভ (Heart Filled with Love)
৬১। রিলাক্সিং দ্যা বডি (Relaxing the Body)
৬২। উইট্‌নেসিং ইমপারমানেন্স (Witnessing Impermanence)
৬৩। মাল্টিপল্ বডি পার্ট এওয়ারনেস্ (Multiple Body Part Awareness)
৬৪। সাইলেন্স (Silence)
৬৫। ইনার সাউন্ডস (Inner Sounds)
৬৬। পালস অফ লাইফ (Pulse of Life)
৬৭। ডুয়াল বডি পার্টস (Dual Body Parts)
৬৮। উইল পাওয়ার (Will Power)
৬৯। লাভ (Love)
৭০। নন্-এক্সপ্রেশন অফ্ নেগেটিভিটি (Non-Expression of Negativity)
৭১। ইনহেলিং পজিটিভিটি, এক্সহেলিং নেগেটিভিটি (Inhaling Positivity, Exhaling Positivity)
৭২। হ্যাপি ইনসাইড, অল, অল অফ দ্যা টাইম। (Happy Inside, All, All of the Time)
৭৩। ফরগিভ্‌নেস্ (Forgiveness)
৭৪। অপোজিট ইমোশন মেডিটেশন (OppositeEmotion Meditation)
৭৫। ইনহেল সাফারিং, এক্সহেল পিস্ (Inhale Suffering, Exhale Peace)
৭৬। ইনার চাইল্ড, ইনার অ্যাডাল্ট (Inner Child, Inner Adult)
৭৭। ফ্রি-উইল (Free Will)
৭৮। কমপ্যাশন (Compassion)
৭৯। গিভিং সাফারিং টু গড্ (Giving Suffering to God)
৮০। মন্ত্রস্ (Mantras)
৮১। ইনকার্নেশন (Incarnation)
৮২। প্রেয়ার (Prayer)
৮৩। ক্রিয়েটিং অ্যান ইনার সেক্রেটারী (Creating an Inner Secreaty)
৮৪। ক্রিয়েটিং অ্যান ইনার গাইড (Creating an Inner Guide)

৮৫। ক্রিয়েটিং অ্যান ইনার ওয়ারিওর (Creating an Inner Warrior)
৮৬। বিকামিং অ্যান অ্যানিমাল (Becoming an Animal)
৮৭। ওয়াল অফ আনসারস্ (Wall of Answers)
৮৮। এ টু জেড্, জেড্ টু এ / ওয়ান টু হ্যানড্রেড, হানড্রেড টু ওয়ান (A To Z, Z to A / 1 to 100, 100 to 1)
৮৯। ক্যানসার মেডিটেশন (Cancer Meditation)
৯০। নেতি, নেতি (Neti, Neti)
৯১। রিভার্স এভিল টু লাভ (Reverse Evil to Love)
৯২। এহিস্মা ঃ দ্যা বেসিস ফর মেডিটেশন (Ahisma: The Basis for Meditation)
৯৩। উইটএনসিং মেনটাল এন্ড ভার্বাস কমেনটারি (Witnessing Mental And Verbal Commentary)
৯৪। মিমিসিং বডিলি পশ্চিউরস্ অফ আদরস্ (Mimicing Bodily Pastures of Others)
৯৫। সিসেশন অফ লাইং (Cessation of Lying)
৯৬। নো-মাইন্ড (No-Mind)
৯৭। ইনফিনিটি, ইমমরটালিটি, ইটারনিটি আই অ্যাম (Infinity, Immortality, Eternity I am)
৯৮। আই অ্যাম দ্যা অল, আই অ্যাম ইন অল (I Am the All, I Am in All)
৯৯। eø্যাংক স্ক্রীন (Blank Screen)
১০০। রিভিউ অফ দ্যা ডে (Review of the Day)
১০১। রিভিউ অফ লাইফ (Review of Life)
১০২। টিভি (TV)
১০৩। ১-৪-২ (1-4-2)
১০৪। ১-১-১ (1-1-1)
১০৫। অলটারনেট নসট্রিল (Alternate Nostril)
১০৬। ১২-১২ (12-12)
১০৭। সোহাম (Soham)
১০৮। ১০৮-অ্যান ইজি হার্ড মেডিটেশন টেকনিক্ (108-An Easy Hard Meditation Technique)

উপরোক্ত ১০৮টি পদ্ধতি ছাড়াও বর্তমানে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে, মেডিটেশন চর্চার জন্য সহজতর, গ্রহনযোগ্য, বিজ্ঞানমনস্ক পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য। তেমনি এক গবেষণালব্ধ ফলাফল হচ্ছে- ***লাইফ শাইনং মেথড***। যা বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে সম্পূর্ণভাবে গ্রহনযোগ্য। যে পদ্ধতিতে মেডিটেশন চর্চা করে সবাই হতে পারেন সুনদর, নির্মল, জটিলতা মুক্ত জীবনের অধিকারী।

মেডিটেশনের প্রকারভেদে

যে কোন পদ্ধতিতেই মেডিটেমন করা হোক না প্রধানত মেডিটেশনকে দুইটি প্রকারভেদে আলোচনা করা যায়।

১। Concentrative (কনসেনট্রেটিভ) মেডিটেশন।

২। Mindfulness (মাইন্ডফুলনেস) মেডিটেশন।

১। Concentrative *(কনসেনট্রেটিভ) মেডিটেশন ঃ*

Concentrative মেডিটেশনে প্রধানত নিঃশ্বাস, ইমেজ বা প্রতিবিম্ব, শব্দ ইত্যাদির উপর বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে স্থির, শাস্ত্ম এবং নিশ্চল করা। সেই সঙ্গে সচেতনতার আধিক্যতা বৃদ্ধি করা, স্পষ্টতা, দৃঢ়তা এগুলোও বিশেষ ব্যাপার। Concentrative মেডিটেশনের ব্যাপারটিকে জুম লেন্সের ক্যামেরার সাথে তুলনা করা যায়। জুম লেন্সের সাহায্যে যে-রকম দূরের ও নিকটের আলোকচিত্র অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে গ্রহণ করা যায় তেমনি Concentrative মেডিটেশনের মাধ্যমে আমরা আমাদের মনোনীত বা নির্বাচিত কোন উদ্দেশ্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ সীমাবদ্ধ করে ফেলতে পারি অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে।

Concentrative মেডিটেশনের জন্য খুব সাধারণ বিন্যাস বা নিয়ম হচ্ছে শান্ত্ম, নীরব হয়ে মেডিটেশনে বসতে হবে। এরপর মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর। যারা যোগব্যায়াম চর্চা করেন এবং যারা মেডিটেশন চর্চা করেন তারা বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যেকটি মানুষের মনের সাথে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন একজন মানুষ খুব উদ্বিগ্ন থাকে, ভীত সন্ত্রস্ত্ম থাকে, উত্তেজিত বা বিক্ষুব্ধ থাকে, তার চিত্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে; তখন দেখা যায় তার শ্বাস-প্রশ্বাস অগভীর থাকে, খুব `aæত থেকে `aæততর হতে থাকে এবং অনেকটা অসম বা অস্বাভাবিক পর্যায়ে থাকে। পক্ষান্ত্মরে, যখন একজন মানুষের মন শান্ত্ম থাকে, বিন্যস্ত্ম থাকে, কিংবা কোন একটা উদ্দেশ্য কেন্দ্রীভূত থাকে, তখন তার শ্বাস-প্রশ্বাসও থাকে ধীর স্থির গতিসম্পন্ন, গভীর এবং নিয়ন্ত্রিত। এ অবস্থায় মনকে অবিরাম শ্বাসগ্রহণ এবং শ্বাসত্যাগের স্বাভাবিক গতি বা ছন্দের উপর কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করলে দেখা যাবে যে প্রকৃতিগতভাবে মেডিটেশনের উদ্দেশ্যই অনেকটা সফল হয়ে গেছে। যদি আমাদের সচেতনতাকে শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করি, তখন আমাদের মন শ্বাস গ্রহণ এবং শ্বাস ত্যাগের স্বাভাবিক গতি বা ছন্দ আত্মভূত হয়ে যায়। ফলkÖæতিতে যেটা হয়, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস আরও ধীর থেকে ধীরস্থির হয়ে গভীর থেকে গভীরতর হয়। তখন সেই সাথে মন হয়ে যায় অধিক থেকে অধিকতর শান্ত্ম, স্থির এবং সচেতন।

২। Mindfulness *(মাইন্ডফুলনেস) মেডিটেশন ঃ*

ড. বরিসেনকো (Dr.Borysenko) মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন সম্পর্কে বলেছেন, "মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন হচ্ছে–অবিরত সংবেদনশক্তির প্রতি সচেতনতার সুবিন্যস্ত্ম সমাবেশ ঘটানোর জন্য মনোযোগ শক্তিকে উন্মোচিত করা। সেই সঙ্গে অনুভূতি, ইমেজ, চিন্ত্মা, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদির প্রতি সচেতনভাবে মনোযোগকে উন্মোচিত করাটাও মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশনের অন্ত্মর্ভূক্ত। সংবেদনশক্তি, অনুভূতি, ইমেজ, চিন্ত্মা, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি নিয়ে চিন্ত্মা করা যাবে না কিন্তু এ সমস্ত্ম বিষয়বস্তুর প্রতি সচেতনভাবে মনোযোগ বৃদ্ধি করতে হবে?

এ ধরনের মেডিটেশনে খুব শান্ত্ম এবং নীরব হয়ে মেডিটেশন করতে বসতে হয়। তারপর খুব সাধারণভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হয় যে, মন কি কি বিষয়বস্তু উপলব্ধি করছে। অর্থাৎ সঠিক মনছবি দেখার চেষ্টা করতে হয়। তবে সেক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া যাবে না অথবা চিন্ত্মা, স্মৃতি, দুশ্চিন্ত্মা ইত্যাদিতে আক্রান্ত্ম হওয়া যাবে না। এভাবে চর্চা করতে থাকলে একসময় একজন মানুষ মেডিটেশনের মাধ্যমে অধিকতর শান্ত্ম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সামান্য কিছুতেই প্রতিক্রিয়াশীল হয় না মনের এরকম একটা অবস্থা অর্জন করতে পারে। Mindfulness মেডিটেশনকে আমরা তুলনা করতে পারি ওয়াইড অ্যাংগল লেন্স (Wide Angle Lens)-এর সাথে। অর্থাৎ আমাদের মনোনীত বা নির্বাচিত

কোনও বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের অন্তর্দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ না করে (যা আমরা Concentrative মেডিটেশনে করি।) আমাদের নির্বাচিত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়বস্তুকেই আমাদের মনোযোগের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

মেডিটেশনের দুটি প্রকারভেদের উপর উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, একজন মানুষ সে যে প্রকারের মেডিটেশনই চর্চা kiæক না কেন, যে কোনও ধরনের মেডিটেশন চর্চাই একজন মানুষের জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে নিয়ে আসতে পারে।

মেডিটেশন সম্পর্কে সাধারণ গাইড লাইন

মেডিটেশন চর্চা যারা করে তারা মেডিটেশন সম্পর্কিত বিভিন্ন নির্দেশনা বা গাইড লাইন সম্পর্কে আগে থেকেই জ্ঞাত থাকে। কিন্তু যারা নতুন মাত্র মেডিটেশন চর্চা শুiæ করেছে তাদের জন্য অবশ্যই কিছু গাইড লাইনের প্রয়োজন হয় যা এভাবে বর্ণনা করা হল।

গাইড লাইন (১)

মেডিটেশন চর্চা শুiæ করার প্রাক্কালে মেডিটেশনের ফলাফল সংক্রান্ত্ম আশা-আকা•ক্ষা একপাশে সরিয়ে রাখতে হয়। মেডিটেশন ঠিকভাবে করা হচ্ছে কিনা তার জন্য দুশ্চিন্ত্মা করাটা ঠিক নয়। কারণ মেডিটেশন করার নানাবিধ প্রক্রিয়া রয়েছে। অনেকভাবেই করা যায়। মেডিটেশন চর্চা শুiæ করার পর সাফল্যের অফুরন্ত্ম সম্ভাবনাও সামনে রয়ে যায়। তবে সঠিকভাবে মেডিটেশন করার কোন নির্দিষ্ট ছক নেই বা সেটা মেনে চলা যায় না। কারণ সুনিপুণতা অর্জিত হয় শুধুমাত্র চর্চার মাধ্যম। তবে কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো প্রথম থেকেই এড়িয়ে চলা উচিত এবং তারপর মেডিটেশন চর্চা শুiæ করা উচিত। যেমন-

(১) কোন কিছু অবশ্যই ঘটতে হবে এরকম জোর করাটা ঠিক নয়। সর্বোপরি জবরদস্তি্ম মেডিটেশনে একেবারেই চলে না।

(২) মেডিটেশন চর্চা করতে বসে মেডিটেশন সম্পর্কে অতিরিক্ত বিচার বিkøষণ করতে বসলে কখনই সাফল্য আসবে না।

(৩) মনকে শুiæতেই খালি করে ফেলা অথবা শুiæতেই কোন উদ্দেশ্যকে মনে মনে ধারণ করে তার পেছনে ধাওয়া করা ছুটে চলা এই দুটো ব্যাপারই অতিরিক্ত যা অবশ্যই বর্জনীয়।

(৪) মেডিটেশন চর্চা শুiæ করার প্রাক্কালে কখনই সঠিকভাবে মেডিটেশন হচ্ছে কিনা এ ব্যাপারে জোর দেয়া যাবে না। এত হয়ত সঠিকভাবে মেডিটেশনের দক্ষতা কখনই গড়ে উঠবে না। সুতরাং উপরোক্ত চারটি বিষয়কে কখনই মনে ঠাই দেয়া যাবে না।

গাইড লাইন (২)

শারীরিক ব্যাপারগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে প্রথমেই যে ব্যাপারটি গুiæত্বপূর্ণ আর তা হচ্ছে সম্পূর্ণ খালি পেটে মেডিটেশন শুiæ করা যাবে না।

ক্ষুধার্ত অবস্থায় মেডিটেশন শুiæ না করে হালকা কিছু খেয়ে নিয়ে মেডিটেশন শুiæ করা উচিত।

গাইড লাইন (৩)

শান্ত্ম, নীরব, আরামদায়ক পরিবেশে মেডিটেশন করা উচিত। হতে পারে তা চেয়ার, বিছানা কিংবা মেঝে। যেখানে একজন ব্যক্তিগতভাবে স্বস্তি্ম অনুভব করবে সেখানেই তার মেডিটেশন করা উচিত।

গাইড লাইন (৪)

যতটা সম্ভব অতিরিক্ত শব্দ এবং চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে এমন কিছু দূরে রাখা উচিত। তবে এসমস্ত্ম ব্যাপারে যা আমাদের কনেট্রালে বাইরে তা নিয়ে কখনই দুশ্চিন্ত্মায় ভোগে ঠিক নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কারও বাড়ি যদি ব্যস্ত্মতম রাস্ত্মার পাশে হয় তবে গাড়ির হর্ণ/আওয়াজ তার পক্ষে কনেট্রাল করা সম্ভব নয়। আবার হয়ত তার পক্ষে বাসস্থান বা মেডিটেশনের স্থান পরিবর্তনও সম্ভব নয়। তখন সেক্ষেত্রে এর মাঝে মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আরও উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, কারও বাসস্থান সমুদ্রের কাছাকাছি। সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন তার পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তখন সে ক্ষেত্রে সমুদ্রের গর্জনকে তার মেডিটেশনের জন্য ইতিবাচক ধরে নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। একসময় সে সফলকাম হবেই।

গাইড লাইন (৫)

যখন কেউ মেডিটেশন করতে বসে তখন যতটা সম্ভব মেiæদন্ড সোজা করে বসা উচিত। এত যেটা হয়, আধ্যাত্মিক শক্তি মেiæদন্ড বরাবর মুক্তভাবে বা অবাধে প্রবাহিত হতে পারে। এটা মেডিটেশনের জন্য বিশেষ গুiæত্বপূর্ণ দিক। অথবা দেয়াল চেয়ারে হেলান দিয়ে মেডিটেশন করাটাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তবে শারীরিক কারণে কারও যদি মেiæদন্ড সোজা করে বসতে অসুবিধা হয়, তখন সে ফ্ল্যাট হয়ে শুiæ করতে পারে।

গাইড লাইন (৬)

হাত দুটোকে সুবিধাজনকে যে কোনও পজিশনে রাখা যেতে পারে।

গাইড লাইন (৭)

মনে মনে ভীষণভাবে আন্তরিক হয়ে যেতে হবে মেডিটেশনের সাথে।

তথাপিও এগুলোর পাশাপাশি একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের সাথে সরাসরি মেডিটেশন সংক্রান্ত সাধারণ গাইড লাইনের ব্যাপারে আলোচনা একজন শিক্ষা নবীশের জন্য খুবই গুiæত্বপূর্ণ। কারণ প্রশিক্ষক হয়ত তাকে দেখে তার অবস্থা বুঝে আরও সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন, যা একজনকে মেডিটেশন চর্চার ব্যাপারে খুবই অগ্রহী করে তুলতে পারে।

মেডিটেশন সম্পর্কিত কিছু প্রচলিত ভুল ধারণা

সারাবিশ্বে মেডিটেশন চর্চার ইতিহাস অনেক পুরনো। তিন দশক আগে থেকে মেডিটেশন সম্পর্কে গবেষণাও শুiæ হয়েছে। কিন্তু মেডিটেশন সম্পর্কে বেশকিছু ভুল ধারণা বর্তমান আধুনিক যুগেও প্রচলিত রয়েছে। যেমন–

ভুল ধারণা (১)

অনেকে ভাবে মেডিটেশন মনকে একেবারে Blank বা খালি করে ফেলে। অনেক এও ভাবে যে মেডিটেশন চর্চা অব্যাহত রাখলে একসময় নিজস্ব চিন্তাশক্তি হারিয়ে যায়।

কিন্তু এ ধারণাটি সত্য নয়। কারণ মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে অভ্যন্তরস্থ স্থিতিশীলতা কিংবা উইলপাওয়ার সচেতন হতে থাকে। তার মানে এই নয় যে, মন একবারে খালি হয়ে যায় কিংবা মনের নিজস্ব চিন্তাশক্তি হারিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে যা হয়, আর তা হচ্ছে আমরা যে পদ্ধতি বেছে নেই মেডিটেশন করার জন্য তার কার্যকারিতার উপরও অনেক কিছু নির্ভর করে। আবার অনেক সময় অনেক কিছুই আমাদের নিয়ন্ত্রনাধীন নয়। সুতরাং মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে মন খালি হয়ে যায় না বরং মনের আধুনিকায়ন ঘটে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে।

ভুল ধারণা (২)

যারা মেডিটেশন চর্চা করেন না এবং যারা মেডিটেশন চর্চা করেন তাদের অনেকের মাঝেই একটি বদ্ধমূল ভুল ধারণা আছে। আর তা হল– মেডিটেশন খুবই কঠিন একটি ব্যাপার, তারা আরও মনে করেন যে মেডিটেশন চর্চা আয়ত্ব করতে গেলে ভয়ংকর, ভীষণ সব নিয়ম কানুন পালন করতে হয়।

কিন্তু মেডিটেশন সহজেই শিক্ষাণীয় বিষয়। আর একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের সহযোগিতা পেলে ব্যাপারটা আরও `ªæত এবং সহজতর হয়। যাদের মেডিটেশন চর্চার অভিজ্ঞতা আছে তারা নিশ্চই একটি ব্যাপারে একমত হবেন সেটা হচ্ছে মেডিটেশন একটি ভীষণ রকমের উপভোগ্য ব্যাপার। তখন সত্যিই মেডিটেশন করাটা একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, যদি কেউ মেডিটেশন চর্চার শুiæতেই ভাবে যে সে পারফেক্ট হবে তাহলে মেডিটেশন আয়ত্ত করা কঠিন হয়ে যাবে। তবে সেটা হয়ত বাস্তবে সম্ভবপর নাও হতে পারে।

ভুল ধারণা (৩)

অনেকেই ভাবে যে, মেডিটেশন চর্চা তখনই সাকসেসফুল কিংবা সুসম্পন্ন হবে যখন আমরা মনছবিতে চমকপ্রদ কিছু দেখতে পারব। অথবা মেডিটেশন চর্চার সময় দ্বৈব ঘটনা জাতীয় কিছু ঘটবে। এইট একটি ভুল ধারণা

যদিও কিছু কিছু মানুষ যারা মেডিটেশন চর্চা করতে করতে একসময় অতিপ্রাকৃত অনেক কিছুই অবলোকন করতে পারেন। কিন্তু এ ব্যাপারটা একেবারেই কারো ব্যক্তিগত। এটা মেডিটেশনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কিছু নয়।

অনেকে আবার মনছবি দেখাকে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বলে মনে করতে থাকেন। এটি ঠিক নয়। মনছবি দেখাটা মেডিটেশনের জন্য জাiæরী।

মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে কারো অন্তর্দৃষ্টি খুলে যেতে পারে। তবে সেটাকে অতিপ্রাকৃত ঘটনার সাথে এক করে ফেলা যাবে না।

সর্বোপরি মেডিটেশন সংক্রান্ত যে কোন ধরনের ভুল ধারণাই দূর হয়ে যেতে পারে একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের দÿতার সাহায্যে। একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের সঠিক দিক-নির্দেশনা একজন মানুষকে মেডিটেশন সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে সাহায্য করে।

মেডিটেশনের উপদেশ ঃ

সাফল্য লাভে মনের শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর জন্য আলফা ড্রইং iæমে যাওয়ার নামই হচ্ছে শিথিলায়ন। সহজ অনুশীলনের মাধ্যমেই আপনি তা আয়ত্ত করতে পারেন। শিথিলায়ন অনুশীলনের জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে একটি নিরিবিলি ঘর বেছে নিন। নিশ্চিত হোন, এ সময় আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না। দরজা ভাল করে বন্ধ করে নিন। ফোন থাকলে অন্য ঘরে রেখে আসুন কিংবা আওয়াজ বন্ধ করে নিন। ফোন থাকলে অন্য ঘরে রেখে আসুন কিংবা আওয়াজ বন্ধ করে দিন। দরজা বন্ধ করেলেও ঘরের ভেতরে যেন পর্যাপ্ত বায়ু প্রবেশ করতে পারে। আর ঘর একেবারে অন্ধকার করে ফেলবেন না। হালকা আলো থাকতে হবে। গায়ের জামা টাইট থাকলে একটু ঢিলে করে নিন। শক্ত বিছানা অথবা মেঝেতে মাদুর– পাতলা কার্পেট বিছিয়ে শুয়ে পড়ুন। অসুবিধা হলে মাথার নীচে পাতলা একটি বালিশও দিতে পারেন। তবে বিছানা যত শক্ত হয় ততই ভাল। শোয়ার পর হাত থাকবে দেহের দু'পাশে, হাতের তালু থাকবে উপরে। পায়ের মাঝখানে অন্তত্মঃত চার আঙ্গুল ফাঁক থাকবে। তবে শরীরের কোনও অসুবিধা না থাকলে আপনি বসেই শিথিলায়ন করতে পারেন। মেiæদন্ড, ঘাড় সোজা করে বসে দুই উiæতে দুই হাত রেখে চোখ বন্ধ করে চর থেকে পাঁচ বার জোরে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে ছেড়ে তারপর শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক গতিতে রেখে আলতো করে চোখ বন্ধ করে আপনি শিথিলায়নের পর্যায়ে যেতে পারেন।

মেডিটেশনে গেলেই প্রথমেই আপনাকে শিথিল হতে হবে। মেডিটেশনের প্রাণ শিথিলায়ন। এছাড়াও প্রথম দিকের মেডিটেশনের আপনার অনুভূতি বিভিন্ন রকম হতে হবে। যেমন–

১। মেডিটেশনের শেষে মনে হতে পারে আপনি শুধুমাত্র চোখ বন্ধ করে শুয়ে বা বসে ছিলেন। আর কিছুই অনুভব করেননি। এমন হলেও চিন্তার কিছুই নেই। নিয়মিত চর্চা করে যান। অনুভূতি আসতে থাকবে।

২। কারো শরীর বেশ ভারী লাগতে পারে। এটা শুভ লক্ষণ। অর্থাৎ আপনার শরীর `ªæত কথা শুনতে শুiæ করেছে।

৩। কারো সামন্য গরম লাগতে পারে অথবা কেউ সামান্য ঘুমিয়ে যেতে পারেন। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কয়েকদিন চর্চা করলেই গরম ও ঘাম স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

৪। কারে মুখো বেশ লালাও আসতে পারে। এটাও শুভ লক্ষণ, ভয়ের কিছু নেই।

৫। বসে বসে শিথিলায়ন করলে প্রথম প্রথম প্রায় সবারই কাঁধ, ঘাড় পিঠ ব্যথা হতে পারে। কয়েকদিন চর্চা করলে দূর হয়ে যায়। কোনও ঔষধের প্রয়োজন নেই।

৬। দু'একজনের মেডিটেশন কালে মাথা ঘোরা ও বমি বমি ভাব হতে পারে। এমন হলে মেডিটেশন অবস্থাতেই লম্বা করে দুই/তিন বার নাক দিয়ে দম নিয়ে ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। দেখবেন মাথা ঘোরা ও বমি বমি ভাব চলে গেছে।

মেডিটেশন (শিথিলায়ন)

হালকাভাবে চোখ বন্ধ কiæন। ধীরে ধীরে দম নিন। ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। ধীরে ধীরে দম নিন, ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। দম নিতে নিতে ভাবুন প্রকৃতি থেকে অফুরন্ত প্রাণশক্তি আমার দেহে প্রবেশ করছে। দম ছাড়তে ছাড়তে ভাবুন, শরীরের সকল দূষিত পদার্থ বাতাসের সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে। এভাবে ৫-৬ বার দম নিন এবং ছাড়ুন। তারপর দম স্বাভাবিক হতে দিন। এবার এক থেকে দশ গণনা কiæণ। দেখুন আপনি আপনার সুসজ্জিত আলফা ড্রইং iæমে চলে এসেছেন। এবার আরাম করে বসুন। আলফা ড্রইংiæম চেতনার এক শক্তিশালী স্তর। এখানে পৌঁছার সাথে সাথে মন, গেহের প্রতিরক্ষা ও নিরাময় ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে রোগমুক্তির কাজে নিয়োজিত করে। এই স্তরে মন যে কোন কল্যাণমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্রেইনকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে পারে। আলফা ড্রই iæমে আপনার যে কোন অটোসাজেশন মস্তিষ্ক সহজেই গ্রহণ করে। এবার ভবিষ্যতে কার্যক্রমের জন্য নিজেকে প্রস্তুত কiæন। মনে মনে বলুন, ভবিষ্যতে শিথিলায়নের উদ্দেশ্যে যখনই আমি চোখ বন্ধ করে আরাম, আরাম, আরাম উচ্চারণ করব, তখনই আমর দেহ মনের সকল অপ্রয়োজনীয় তৎপরতা বন্ধ হয়ে যাবে। এবং আমি পরিপূর্ণ শিথিল হয়ে যাবে। যখনই এরপর এক থেকে দশ গণনা করব তখনই আলফা ড্রইংiæমে পৌঁছে যাব। তারপর আপনার আলফা ড্রইংiæমে গিয়ে আপনার পছন্দের ঐ চেয়ারে বসে আরও কিছু ইতিবাচক অটোসাজেশন দিতে পারেন। যেমনঃ মনে মনে বলতে পারেন এখন থেকে আমার স্মৃতিশক্তি বাড়বে। আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়বে। আমার মনোযোগ বাড়বে। আমার শরীর ও মন সবসময় সুস্থ থাকবে। অমূলক ভয় ভীতি এবং নেতিবাচক চিন্তা থেকে আমার মন ও মস্তিষ্ক পুরোপুরি মুক্ত থাকবে। ইতিবাচক চিন্তা থেকে আমার মন ও মস্তিষ্ক পুরোপুরি মুক্ত থাকবে। ইতিবাচক চিন্তা দিয়ে পাব। প্রতিদিন আমি সবদিক থেকে লাভবান হচ্ছি, সফল হচ্ছি।

অটোসাজেশনের ক্ষেত্রে আপনি আপনার প্রয়োজন অনুসারে যে কোনও ইতিবাচক কথা সংযোজন করতে পারেন। আপনার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দই এখন শক্তিতে পরিণত হবে। তারপর আপনি সময় নিয়ে মনছবি বা অন্যান্য যা করার তা করতে পারেন।

এবার জেগে উঠার পালা। আপনাকে এখন আলফা ড্রইংiæম থেকে বাস্তবে ফিরে আসতে হবে।

এবার লম্বা দম নিন। ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন।

লম্বা দম নিন। ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। মনে মনে বলুন-আমি এক থেকে পাঁচ গুণে যখন চোখ মেলে তাকাব আমি পুরোপুরি জেগে উঠব। আমার মাথা, ঘাড়, কাঁধ, শরীরে কোনও ব্যথা বা অস্বস্তি থাকবে না।

পূর্ণ সচেতন অবস্থায় শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ, সবল ও চাঙ্গা অনুভব করব।

এবার চোখ মেলুন। মাথা ও ঘাড় নাড়ুন। পা টানা টান কiæন। হাত নাড়ুন। জোরে বলুনঃ বেশ ভাল লাগছে।

মেডিটেশন কিভাবে কাজ করে

মেডিটেশন কিভাবে কাজ করে, মেডিটেশনের মাধ্যমে কিভাবে শারীরিক, মানসিক উপকার সাধিত হয় এগুলো ব্যাপার নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে এবং বর্তমানেও প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। যার জন্য মেডিটেশন কিভাবে কাজ করে এর যথাযথ, সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে এটুকু আমরা জানতে পারি যে, মেডিটেশনের মাধ্যমে আমরা শিথিলায়নের চরম পর্যায়ে অবস্থান করতে পারি, যে অবস্থাটা শরীর এবং মনের জন্য খুবই স্বাস্থ্যপ্রদ, চমৎকার এবং সেই সঙ্গে উপভোগ্য। কারণ মেডিটেশনের চরম পর্যায়ে বহুবিধ শারীর বৃত্তীয় এবং প্রাণরাসায়নিক ব্যাপারগুলোর প্রশমন ঘটতে থাকে।

যেমন–

(১) হৃৎস্পন দনের হারহ্রাস পায়, শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া এবং ফেলার হারহ্রাস পায়।

(২) বিশেষ গুiæত্বপূর্ণ ব্যাপার যেটা তা হচ্ছে, স্ট্রেস বা মানসিক চাপের জন্য যে হরমোনটি বিশেষভাবে দায়ী সেটা হচ্ছে cøাজমা কর্টিসোল (Plasma Cortisol)- এটাও কমতে থাকে।

(৩) নাড়ী স্পন দন (Pulse Rate) কমতে থাকে।

(৪) একটি মস্তিস্কষ্ক তরঙ্গ যার নাম **EEG (ELECTROEN CEPHA LOGRAM ALPHA)**-এর বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এই মস্তিস্কষ্ক তরঙ্গটি শিথিলায়নের সাথে বিশেষভাবে জড়িত।

মেডিটেশন নিয়ে গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে এটাও বেরিয়ে এসেছে যে, মেডিটেশনের সময়ে আমাদের দেহ অত্যন্স্ত তাৎপর্যপূর্ণ, প্রসারিত-অধিক সময়ের বিশ্রাম লাভ করে যেটা খুবই গুiæত্বপূর্ণ। সেই একই সময়ে আমাদের মস্তিস্কষ্ক (BRAIN) এবং মন অধিকতর সচেতন হয়ে যায়। সুতরাং একদিকে যেমন শরীর প্রচন্ড বিশ্রাম পাচ্ছে আবার অন্যদিকে ব্রেইন এবং মন অধিকতর সচেতন হচ্ছে। এই দুটি ব্যাপারের সমন্বয় ঘটার দাiæন যেটা হয় আর তা হচ্ছে মানুষের ক্রিয়েটিভিটি বা সৃষ্টিশীলতা প্রশস্স্ত হয়, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার অনুভূতি বাড়তে থাকে, উপলব্ধি করার অনুভূতিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এছাড়াও আরও বহুমুখী ইতিবাচক ফলাফল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে মেডিটেশনের চর্চার মাধ্যম। হার্ভাড মেডিকেল স্কুলের দুজন প্রফেসর বেনসন এবং ওয়ালেস ১৯৬০ সালের শেষের দিকে সর্বপ্রথম মেডিটেশন চর্চার ফলে শারীরবৃত্তীয় কি ধরনের পরিবর্তন ঘটে সে সম্পর্কে তথ্যাবলী প্রদান করেন। (১) তাদের গবেষণার অন্স্তর্ভুক্ত ছিল বেশ কিছু সংখ্যক মেডিটেটরস (Meditators) অর্থাৎ যারা মেডিটেশন চর্চা করে। তাদের বয়সসীমা ছিল ১৭ বৎসর থেকে ৪১ বৎসর পর্যন্স্ত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অল্প কিছুদিন ধরে মেডিটেশন চর্চা করছিল। আবার কেউ কেউ বহু বৎসর ধরে মেডিটেশন চর্চা করছিল। তাদের উপর গবেষণা করে বেনসন এবং ওয়ালেস যা তথ্যাদি বা ফলাফল পেয়েছিলেন সেগুলোও আমাদের নিম্লোক্ত আলোচনায় এসেছে। এছাড়াও মেডিটেশনের চর্চার দাiæন শারীরবৃত্তীয় এবং মানসিক কাজ করে তার উপর এভাবে আলোকপাত করতে পারি। যেমন–

(১) বিপাকীয় প্রক্রিয়ার হারহ্রাস ঃ

মেডিটেশন চর্চার সময় দেখা যায় শরীরের বিপাকীয় ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার হার হ্রাস পেয়েছে। অক্সিজেনের ব্যবহার নাটকীয়ভাবে কমে যায় মেডিটেশন শুiæ করার কয়েক মিনিটের মধ্যে। স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অক্সিজেনের ব্যবহার শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস পায়। এমনকি গভীর ঘুমন্স্ত থাকা অবস্থায় যতটুকু অক্সিজেন ব্যবহার করা হয় মেডিটেশন করা অবস্থায় অক্সিজেনের ব্যবহার তার চেয়েও কম হয়ে যায়।

(২) রক্তচাপহ্রাস ঃ

মেডিটেশনের সময় রক্ত চাপ কমে যায়। মেডিটেশনের শুiæতে যদিও রক্ত চাপ বেশিও থাকে কিন্তু মেডিটেশন চর্চার সময় সেটা কমে যেতে থাকে।

(৩) মাস্‌ল রিলাক্সেশন ঃ

যারা মেডিটেশন সঠিকভাবে চর্চা করে চলে তাদের শরীরের চামড়া বৈদ্যুতিক শক্‌কে এক পর্যন্ত্ম প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়ে যায়। অর্থাৎ– মেডিটেশনের চামড়া এতটাই প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে যায় মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে। যদি চামড়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে তাহলে বুঝতে যে, সেই ব্যক্তি টেনশন এবং দুশ্চিন্ত্মা দ্বারা আক্রান্ত্ম হচ্ছে। আর যদি চামড়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়তে থাকে তাহলে বুজতে হবে সেই ব্যক্তির মাস্‌ল রিলাক্সেশন ঠিকমত হয়েছে। অর্থাৎ সে এখন অনেক কিছুকেই প্রতিরোধ করতে সড়্গাম। বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে এটাও দেখা যায় যে, মেডিটেশন সম্পূর্ণ একটি মানসিক প্রক্রিয়া। তবে এর দ্বারা শারীরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বা মাস্‌ল রিলাক্সেশন ঘটে খুবই সঠিকভাবে, পরিমতিভাবে।

(৪) স্নায়ুতন্ত্রের উপর কার্যকারিতা ঃ

বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, মেডিটেশন চর্চা স্নায়ুতন্ত্রের কাজকে কমিয়ে আনে। অর্ধসংবেদী স্নায়ুতন্ত্রের শাখাটি যেটা অন্লৈচ্ছিক এবং স্বশাসিত সেটি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। আর এই শাখাটির কার্যকারিতাই আমাদেরকে স্থির করে, প্রশান্ত্ম করে যা একমাত্র সঠিক মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমেই সম্ভবপর।

(৫) রক্তে ল্যাকটেটের (Lactate) পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

মানুষ যখন খুব উদ্বেগ, দুশ্চিন্ত্মা, টেনশনে ভুগতে থাকে তখন তার রক্তে ল্যাকটেট নামক একটি পদার্থের পরিমাণ বাড়াতে থাকে। ল্যাকটেট হচ্ছে এমন একটি পদার্থ যা কঙ্কাল সম্বন্ধীয় মাস্‌লের বিপাকীয় প্রক্রিয়া থেকে সৃষ্টি হয়। এমনি স্বাভাবিক বিশ্রাম নিতে থাকলে রক্তে ল্যাকটেটের পরিমাণ যে হারে কমে যেত, মেডিটেশন করা অবস্থায় রক্তে ল্যাকটেটের পরিমাণ চরগুণ `ªæত গতিতে কমে যায়। তবে মেডিটেশন সংক্রান্ত্ম অন্যান্য গবেষণায় দেখা গেছে রক্ত প্রবাহ বেড়ে যায় মেডিটেশন চর্চার সময়। তবে বেনসন এবং ওয়ালেস এই দুই জন প্রফেসরের গবেষণায় তারাও পেয়েছেন যে, মেডিটেশন চর্চার সময় কনুই থেকে হাতের কব্জি পর্যন্ত্ম রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি পায় শতকরা ৩২ ভাগ। প্রধানত মস্তিত্মষ্ক সংক্রান্ত্ম টিস্যু থেকে ল্যাকটেট উৎপন্ন হয় শরীরে। কিন্তু মেডিটেমন চর্চার সময় রক্তপ্রবাহ প্রচন্ড বৃদ্ধি পায় যা শরীরের বিভিন্ন টিস্যুসমূহে অক্সিজেন সরবরাহ ত্বরান্বিত করে এবং এই `ªæত অক্সিজেন সরবরাহের দiæন ল্যাকটেট কম উৎপন্ন হয়।

তখন মানুষের উদ্বেগ, দুশ্চিন্ত্মা, টেনশন কমতে থাকে। আর এ অবস্থাটি অত্যন্ত্ম স্বাস্থ্যপ্রদ এবং উপযোগী যা মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনগুলো যা মেডিটেশনের মাধ্যমে হয় এগুলো একজন মানুষ ঘুমন্ত্ম অবস্থায় থাকলে যেমন হয় তা থেকে ভিন্ন। আবার একজন মানুষ সম্মোহিত অবস্থায় থাকলে যেমন হয় তার থেকেও ভিন্ন। সেজন্য বেনসন এবং ওয়ালেস মেডিটেশনকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে মেডিটেশন এমন একটি প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন জটিল অবস্থাকে সরলীকরণের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ উচ্চতর শিথিলায়ন বা রিলাক্সড স্টেট বা অবস্থা প্রদান করে।

উপরন্তু, বেনসন এবং ওয়ালেস এই দুইজন প্রফেসর আরও বলেছেন তাদের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের এবং গবেষণার মধ্যে আরও একটা বিষয় অন্ত্মর্ভূক্ত ছিল আর তা হচ্ছে, মেডিটেশন একটি ইনি টগ্রেটেড (Integrated) বা সম্পূর্ণ পদ্ধতি– যা সাধিত হয় কেন দ্রী নার্ভাস সিস্টেম বা কেন দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা।

মেডিটেশন সংক্রান্ত্ম একটি বিখ্যাত বই নাম "MINDING THE BODY, MENDING THE MIND" যার লেখক (AUTHOR) ডঃ রবিসেনকো (Dr. BORYSENKO) বলেছেন, "মেডিটেশনের মাধ্যমে আমরা রিলাক্সেশন পদ্ধতিটি শিখি এবং সেই সাথে রিলাক্সেশন বা শিথিলায়নের সাথে সাথে কি কি শারীরবৃত্তীয় অনভূতি প্রকাশিত হয় সেটিও আমরা জানতে পারি। আমরা মন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারি এই মেডিটেশনের মাধ্যমেই। এছাড়া যে সমস্ত্ম কারণে আমাদের স্ট্রেস বা মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলো সম্পর্কেও আমরা সচেতন হতে পারি মেডিটেশনের মাধ্যমে।

মেডিটেশন সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন, "মনকে নীরকে নীরব করার মাধ্যমে, প্রকৃতপক্ষে মেডিটেশন একজনকে অভ্যন্তরস্থ চিকিৎসকের সংস্পর্শে নিয়ে আসে। মেডিটেশনের মাধ্যমে শরীরের অভ্যন্তরস্থ জ্ঞানের সাহচর্য নিয়ে আসে। মেডিটেশনের মাধ্যমে শরীরের অভ্যন্তরস্থ জ্ঞানের সাহচর্য লাভ সম্ভব হয়। অভ্যন্তরস্থ জ্ঞান বিকশিত হয়।"

মেডিটেশন কিভাবে কাজ করে এ সম্পর্কে আরও বলা যেতে পারে। মেডিটেশনের মাধ্যমে আমাদের অন্তরের অগ্নিশক্তি যা আমাদের মনের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে। যখন আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে থাকে না তখন আমাদের এনার্জি কিংবা অন্তরের অগ্নিশক্তি অপচয়জনিত ক্ষতি হিসাবে পুড়তে থাকে বা অপব্যয় হতে থাকে। আমাদের মনও তখন মেঘাচ্ছন্ন হতে থাকে।

আমাদের মনের দৃঢ়সঙ্কল্প বা উইল পাওয়ার বলতে আমরা যা বুঝি সেটা কিড্নীর পানিশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যখন আমরা অমনোযোগী থাকি কিংবা যত্নবান হই না তখন কিড্নীর পানিশক্তি শরীরের সেক্সুয়াল (Sexual) অঙ্গ দ্বারা বাইরে চলে যায়। এত যেটা হয় আমাদের অস্তিত্ব বা সারসত্তা নিঃশেষিত হতে থাকে। আমাদের স্পিরিট বা উদ্যম দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। যখন আমরা মেডিটেশন করি তখন কিড্নীর পানিশক্তি এবং শরীরের নিম্নাঙ্গস্থল (নিতম্বের ত্রিকোণাকার অস্থি বিশেষ) থেকে শক্তি আমাদের ব্রেইনে পৌঁছাতে থাকে। পক্ষান্তরে আমাদের আবেগ সংক্রান্ত অন্তরের অগ্নিশক্তি বা এনার্জি নিম্নমুখী হতে থাকে। উপরোক্ত দুটি ব্যাপারই বিপরীতমুখী। যখন অন্তরের অগ্নিশক্তি নিম্নমুখী হতে থাকে তখন এটি পরিশোধিত হয়, বিশোধিত হয়, পরিবর্তিত হয় এবং পরিপূর্ণ মানসিক শক্তির পরিপূর্ণ সঞ্চালন বা আবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। আধ্যাত্মিক বা মানসিক দিক থেকে এই শক্তিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, এই অভ্যন্তরস্থ শক্তি আমাদের মনকে দৃঢ় করে, মনকে প্রশান্ত করে, আবেগের অতিরিক্ত প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে।

তবে আলোচনার পরিশেষে এ কথা বলা যায়, মেডিটেশন কিভাবে কাজ করে একজন মানুষের মনের উপর এবং শরীরের উপর এটি এখনও অনেক অনেক গবেষণার বিষয়। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আমরা আরও অধিকতর গ্রহণযোগ্য, সুস্পষ্ট যথাযথ ব্যাখ্যা খুঁজে পাব– যা জেনে মানুষ হয়ত আরও আগ্রহী হয়ে উঠবে মেডিটেশনের প্রতি। সেই সঙ্গে একজন প্রশিক্ষক সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতেও সক্ষম হবেন।

মেডিটেশনের উদ্দেশ্য কি?

প্রচলিত রীতিনীতি এবং ধারণা অনুযায়ী পূর্বে এবং অনেকটা বর্তমানেও মেডিটেশন আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য চর্চা করা হত এবং এখনও হয়। অর্থাৎ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য, আত্মার অভ্যন্তরস্থ আলোক শক্তির উন্মোচন, ভালবাসা, জ্ঞানচর্চার উৎসাহ বৃদ্ধি, জীবন যাপনের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি, সত্য জীবন পথের দিকে আমাদের যাত্রা ত্বরান্বিত করার জন্য আমাদের স্পিরিট বা উদ্যম বৃদ্ধির জন্য মেডিটেশন চর্চা অতীব প্রয়োজন।

কিন্তু বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে মেডিটেশনকে নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে। আলোচনা হচ্ছে, চর্চা হচ্ছে এর পরিপ্রেক্ষিতে এটাই বেরিয়ে এসেছে যে, মেডিটেশন একটি মূল্যবান হাতিয়ার বা কৌশল– যার দ্বারা আমরা শিথিলায়নের চরম পর্যায়ে পোঁছাতে পারি। ব্যাপারটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, ঊষর মiæ প্রান্তরে যেন কোন মনোরম স্থান, নিরানন্দ জীবনে যেন কোনও আনন্দের স্মৃতি ইত্যাদি।

বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলার জন্য, স্ট্রেস বা মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মেডিটেশন করাটা অত্যন্ত জiæরি।

মেডিটেশনের উদ্দেশ্য আমরা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করতে পারি ঃ

১) নিরাময়ের জন্য যে কোন ক্লান্তি, অবসাদ, দুঃখ দুর্দশা, কষ্ট, চাপ, অসুস্থাতার ক্ষেত্রে)।

২) আবেগের সমতা বজায় রাখার জন্য অতিরিক্ত আবেগকে প্রশমিত করার জন্য, আবেগকে বিশোধিত করার জন্য।

৩) কোনও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য গভীর থেকে গভীরতর করার জন্য।

৪) অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করার জন্য।

৫) পরিবর্তনশীলতা আনয়নের জন্য যেন পরিবর্তন প্রক্রিয়া সুষ্ঠ এবং সুস্পষ্ট হয়)।

৬) কল্পনাশক্তির উন্নয়নের জন্য।

৭) সৃষ্টিশীল প্রতিভাসসূহের সঠিক উন্মোচনের জন্য

৮) বাস্তবতা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভের জন্য।

৯) অন্তঃস্থল থেকে সঠিক দিক-নির্দেশনা পাওয়ার জন্য।

হাসির নিরাময় শক্তি

হাসির নিরাময় শক্তি নিয়ে গবেষকরা, ডাক্তাররা প্রচুর গবেষণা ইতিপূর্বে করেছেন এবং বর্তমানেও করছেন। গবেষণাকার্য যতই দীর্ঘায়িত হচ্ছে ততই নতুন নতুন তথ্য বেরিয়ে আসছে।

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ড. উইলিয়াম ফ্রাই যিনি পেশায় একজন সাইকিয়াট্রিস্টও তিনি হাসির নিরাময় শক্তি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। তার গবেষণার আলোকে হাসির নিরাময় শক্তি সংক্রান্ত নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ বেরিয়ে এসেছে। যেমন–

(১) শরীরের নিরাময় শক্তি বৃদ্ধি ঃ

ড. উইলিয়াম ফ্রাই তার গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন যে, শরীরের নিরাময়করণ প্রক্রিয়া হাসির কারণে দুভাবে প্রভাবিত হয়।

I) শরীরের রক্ত প্রবাহ বিভিন্ন এনিট্বডিসমূহের সার্কুলেশন বৃদ্ধি পায় হাসির কারণে।

II) রক্ত প্রবাহ শ্বেত রক্ত কণিকার প্রবাহ বৃদ্ধি পায় হাসির কারণে। আর শ্বেত রক্ত কণিকা নিরাময়ের বিভিন্ন পর্যায়ে বাইরের বিভিন্ন প্রোটিন কণাসমূহের সাথে প্রতিদ্বন্দিতা করে।

উপরোক্ত দুটি কারণেই শরীরের রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার বৃদ্ধি পেতে থাকে। যে কোন ধররে ইনফেকশন প্রতিরোধ করতে থাকে। তবে তার মানে এই নয় যে, হাসির কারণে আমরা কখনও কোনও ইনফেকশনে আক্রান্ত হব না। আমাদের রেজিস্ট্যোন্স পাওয়ার বা রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বেড়ে যাবে।

(২) হাসি এক ধরনের ব্যায়াম এবং তার বিভিন্ন ধরনের উপকারিতা ঃ

অন্যান্য আবেগের চেয়ে হাসি একটি ভিন্নতর আবেগ। হাসি একধরনের ব্যায়ামের কাজ করে। হাসিতে পেশী সক্রিয় হয়ে উঠে। হার্টরেট বেড়ে যায়। দম `ªæত থেকে `ªæততর হয়। রক্তের অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে বিষাক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগের পরিমাণ বাড়ে। কারও যদি হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে তখন পেটের পেশীতে নিশ্চই ব্যাথা ধরে যায়। অর্থাৎ হাত, মুখ, পা ও পেটের পেশীর একটার "মিনি ওয়ার্ক আইট" হয় হাসির ফলে। আমরা ব্যাপারটাকে তুলনা করতে পারি, ক্রীড়বিদদের ব্যায়ামের সাথে, যারা অনুরূপ ফল পাওয়া যায় হাসিতে। শরীরের অভ্যন্তরীণ বিপাকীয় প্রক্রিয়া ও ত্বরান্বিত হয়। হাসির ডায়াফ্রাম, থোরেক্স, সার্কুলেটরি ও এন্ডোক্রাইন সিস্টেমেরও ব্যায়াম হয়। হাসি মস্তিষ্ককে ক্যাটকোলামাইন হরমোন নিঃসরণে উদ্বুদ্ধ করে। আর এটা ক্যাটাকোলমাইনই শরীরের নিজস্ব ব্যাথানাশক এনডোরফিন নিঃসরণ করে রক্তপ্রবাহে। একটি উদাহরণ এখানে উÌjøখ করা যায়। গাড়ির এক্সিলেটরে পা দিয়ে চাপ দেয়ার মত। আর হাসির কারণে উপরোক্ত শারীরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলোকে গাড়ি চলার সাথে তুলনা করা যায়।

(৩) অ্যাজমা নিরাময়ের ক্ষেত্রে হাসির ভূমিকা ঃ

শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত বিভিন্ন রোগ যেমন– অ্যাজমা, ব্রংকাইটিস্ ইত্যাদি; কারও ক্রনিক ঠান্ডাও থাকতে পারে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, যে সমস্ত রোগীদের ফুসফুস্ রোগাক্রান্ত তারা প্রচন্ড দুর্বল এবং খুব একটা উদ্যামীও থাকে না শ্বাস-প্রশ্বাস এর সমস্যাজনিত কোন একটা ট্রিটমেন্ট গ্রহণের ক্ষেত্রে। এ সমস্ত সমস্যার ক্ষেত্রে হাসি একটা চমৎকার নিরাময়কারক হতে পারে। এ ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে তাদের সামনে কোনও হাসির জোকস্ বলে হাসানোর চেষ্টা করলে দেখা যাবে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সমস্যা কিছুটা হলেও দূরীভূত হচ্ছে। ফুসফুসে কোনও বাধা বা eøক থাকলে হাসির মাধ্যমে সেই eøক পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে।

(৪) এছাড়াও ডঃ উইলিযাম ফ্রাই বলেছেন যে, রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে হাসির ভূমিকা গুiæত্বপূর্ণ।

(৫) আমাদের ব্রেইনের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য হাসি একটি ভীষণ রকমের প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

ড. উইলিয়াম ফ্যাই-আরও উপদেশ দিয়েছেন এই বলে যে, কারও কোন একটি দিন যদি খুব কাজের প্রেশারে যায় কিংবা কোনও কারণে কেউ মানসিক চাপের শিকার হলে তখন সে ব্রেইনকে প্রশান্ত করার জন্য কোনও হাসির সিনেমা দেখতে পারে; জোক্‌সের বই পড়তে পারে। অর্থাৎ তখন হাসির উদ্রেক করে এমন কিছু সে করতে পারে। এতে একজন শুধু মানসিকভাবে প্রশান্তি লাভ করবে তা নয়, শারীরিকভাবেও অনেক উপকৃত হবে।

এরপর আমরা ড. উইলিয়াম ফ্রাই-এর অভিজ্ঞাতা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে স্যাটারডে রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক রনমান কান্সি এর উপর আলোকপাত করতে পারি। ১৯৭০-এর দিকে মেiæদন্ডের এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন তিনি।

চিকিৎসকগণও তার রোগমুক্তির ব্যাপারে আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলেন না। কয়েক বছর প্রচন্ড ব্যথায় কষ্ট পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি আর শুধু ঔষধ খাবেন না। তার পরির্বতে তিনি নিজেরে চিকিৎসার জন্য এক অভিনব প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করলেন। যখনই ব্যথায় অস্থির হয়ে উঠতেন তখনই তিনি তার প্রিয় হাসির ছবি লারেল/এন্ড হার্ডি, ম্যাক্স ব্যাদার্স ইত্যাদি ছবির ভিডিও ছেড়ে দিতেন। তিনি হাসির বেদনানাশক গুণ উপলব্ধি করলেন। তিনি দেখলেন যে ৫ মিনিটের দম ফাঁটানো হাসি ২ ঘনটা পর্যন্ত ব্যথা-বেদনা থেকে তাকে মুক্ত রাখে। আর এভাবে হাসতে হাসতেই কোন ঔষধ ছাড়া তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেন। তাঁর এই রোগমুক্তির বিবিরণ সম্বলিত বই। “এনাটমি অভ এন ইলনেস” বেস্ট সেলার-এর তালিকায় উঠেছিল। নরমান ক্যান্সি ৭৫ বছর বয়েসে ১৯৯০ সালে মারা যান।

লস. অ্যাঞ্জেলেসের ব্যথা বিশেষজ্ঞ ডা. ডেভিড ব্রেসলার হাসিমুখী ও ইতিবাচক মানুষের সাহচর্যে থাকবার উপর গুiæত্ব আরোপ করেছেন।

তার দীর্ঘদিনের গবেষণায় তিনি দেখেছেন হাসিখুশী ও ইতিবাচক মনের মানুষ অন্যদের হাসিখুশী ও ইতিবাচক করে তোলে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হাসিমুখে কথা বলার প্রতি অত্যন্ত গুiæত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন কারও সাথে হাসিমুখে কথা বলাও একটি সদ্‌কা অর্থাৎ দান। তবে সব ধরনের হাসিই নিরাময় করে না। একমাত্র প্রাণ খোলা নির্মল হাসি এবং কোনও হাসির কথা শুনে হাসা এগুলোর মাধ্যমে কেবল নিরাময় সম্ভব।

আলোচনার শেষে আমরা আবার সাইকিয়াট্রিস্বট গবেষক ড. উইলিয়াম ফ্রাই-এর কথায় ফিরে যেতে পারি। তিনি বলেছেন, প্রত্যেকটি মানুষ যেন তার সেন্স অফ হিউমার সম্পর্কে অর্থাৎ তার হাস্য-রস জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হয়। এতে একজনের পক্ষে হাসির উপাদান প্রকৃতি থেকে, মানুষ থেকে, অভিজ্ঞতা থেকে খুঁজে নেয়া সহজতর হবে। এছাড়া প্রত্যেকটি মানুষ তার বাড়িতে একটি ছোট খাট লাইব্রেরী গঠন করতে পারে। সে লাইব্রেরীতে হাস্যরসাত্মক বই, কমিক্স, কার্টুনগুলো সংগ্রহে রাখতে পারে, যেন- প্রয়োজনের সময় সেগুলো পড়া যায়।

যাদের পক্ষে সম্ভব তারা নিজস্ব ভিডিও সিডি লাইব্রেরী তৈরি করতে পারে, যাতে হাস্যরসাত্মক সিনেমা সংগ্রহে রাখা যেতে পারে।

এছাড়া কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব কিংবা আত্মীয়স্বজন মিলে একসঙ্গে হাসির চর্চা করতে পারে। সবার যদি উদ্দেশ্য থাকে যে প্রতিদিন তারা কিছুটা সময় একত্রিত হবেন শুধু হাসার জন্য। এক সময় ব্যাপারটা তখন অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। এতে উপকারিতা আরও `ªæত গতিতে হতে থাকবে।

পরিশেষে বলা যায়, হাসি হতে পারে রোগ নিরাময়ের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

কান্নারা সাহায্যে নিরাময়

প্রকৃতপক্ষে কান্না কিংবা চোখের পানি মনের আবেগ প্রকাশের একটি উপায়। জীবনে চলার পথে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, ক্ষোভ এগুলো মনের উপর চাপ সৃষ্টি করে। অনেক সময় অন্যের ব্যবহারে দুঃখ পেয়ে আমরা মানসিক চাপের সম্মুখীন হই। এছাড়া পেশাগত, পারিবারিক, সামাজিক নানারকম টানাপোড়নেরও মনের উপর প্রচন্ড চাপের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই চাপগুলোকে যদি কোনভাবে বের করে দেয়া যায় তাহলে অবশ্যই শরীর ও মন পারস্পরিকভাবে উপকৃত হয়। তাই মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, মানসিক চাপের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মন, শরীর এবং মনোদৈহিক সিস্টেমকে রক্ষা করার এক প্রাকৃতিক নিরাপত্তা প্রক্রিয়াই হচ্ছে কান্না।

তবে কান্না ব্যাপারটি যত সহজ মনে করেন অনেকে, আসলে ব্যাপারটি তত সহজ নয়। কারণ ইচ্ছা করলেই কাঁদা যায় না। একমাত্র দুঃখ-কষ্ট-বেদনার অনুভূতি প্রখর হলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চোখ দিয়ে পানির ধারা প্রবাহিত হতে শুiæ করে।

আবার অনেকে মনে করেন যে, কান্না ব্যাপারিটি মেয়েলী। কিংবা মনে করেন অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু সুস্থ মমতাময় জীবনের জন্য, মানসিক নিরাময়ের জন্য কান্নার ভূমিকা অপরিসীম।

মনোবিজ্ঞানী প্রফেসর ফ্রেডরিক ফ্লেচ বলেন যে, মানসিক চাপ ভারসাম্য নষ্ট করে আর কান্না ভারসাম্য পুনiæদ্ধার করে। কান্না প্রকৃতপক্ষে সেনট্রাল নার্ভাস সিস্টেমকে মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দেয়। না কাঁদলে সেই মানসিক চাপ বা স্ট্রেস শরীরে থেকেই যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটার পল রামসে মেডিকেল সেনটারের সাইকিয়াট্রি বিভাগের বায়োকেমিস্ট ডঃ উইলিয়াম ফ্রাই বলেন যে, দুঃখ, বেদনা, মানসিক আঘাত দেহে টক্সিন বা বিষাক্ত অনু সৃষ্টি করে আর কান্না এই বিষাক্ত অনুগুলোকে শরীর থেকে বের করে দেয়। যে কারণে দুঃখ ভারক্রান্ত ব্যক্তি ভালোভাবে কাঁদতে পারলে নিজেকে অনেক হালকা মনে করে।

বেশকিছু বছর আগে ***"প্রাপ্ত বয়স্ক দের কান্নার আচারণ"*** সংক্রান্ত একটি গবেষণা সম্পন্ন হয়। গবেষণাটি সম্পাদিত করেন, ডঃ উইলিয়াম ফ্রাই, ক্যারি হফম্যান আহরণে, রোজার এ জনসন, ডঃ ডেভিড্ টি. লিক্কেন এবং আরো অনেকে। কান্নার আচরণ গবেষণা করার জন্য ২৮৬ জন মহিলা এবং ৪৫ জন পুiæষ বেছে নেয়া হয়।

গবেষণালব্ধ ফলাফলকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যায়-

১. পুiæষদের চেয়ে মহিলারা ৫ গুণ বেশি কাঁদে।

২. কোনও টিপিক্যাল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কান্না পুiæষ এবং মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই ৬ মিনিটকাল স্থায়ী হয়।

৩. রাত ৭টা থেকে ১০টার মধ্যেই কান্নার উদ্রেক হয় বেশি।

৪. বয়সের সাথে কান্নার উদ্রেক হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই।

৫. গবেষণা কার্য সম্পাদিত হওয়ার পর শতকরা ৮৫ ভাগ মহিলা এবং শতকরা ৭৩ ভাগ পুiæষ রিপোর্ট করেন যে, তারা কান্নার পর ভীষন ভাল বোধ করছেন।

এই গবেষণালব্ধ ফলাফল আমাদের কান্না সম্পর্কে অনেক উপসংহার টানতেই সহায়তা করে। যেমন– কান্নার ব্যাপারটি বেশি ঘটছে মহিলাদের মাঝে পুiæষদের অপেক্ষা। আমরা আমাদের ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন পর্যালোচনা করলেও দেখতে পাব যে, মহিলার কান্নার মাধ্যমে আবেগকে বেশি প্রশমিত করেন। এছাড়া কান্নার পর ভাল লাগছে– এধরনের অনুভূতি প্রকাশ করছে এরকম সংখ্যা মহিলাদেরই বেশি।

তবে চমকপ্রদ ব্যাপাার হল দুঃখ, আবেগ, কষ্ট ইত্যাদির কারণে আসা চোখের পানি আর এমনি ধূয়া, ধূলা, যে কোন জ্বালা-পোড়ার কারণে আসা চোখের পানির মধ্যে রাসায়নিক পার্থক্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা আবার ডঃ উইলিয়াম ফ্রাই-এর গবেষণার কথা উ‡jøখ করতে পারি। তিনি একদল মানুষের উপর এ নিয়ে একবার একটি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি তাঁর গবেষণার অধীনে যাদেরকে রেখেছিলেন তাদেরকে দুঃখেভরা ছায়াছবি দেখতে দিলেন। তাদেরকে বলা হয়, ছবি দেখে কান্না পেলে সেই পানি টেস্টটিউবে ভরে রাখতে। আবার তাদেরকেই কয়েকদিন পর পেয়াঁজের ঝাঁঝের

সামনে বসিয়ে দেয়া হয়। তারপর টেস্টটিউবে সেই চোখের পানি টিউবে সংগ্রহ করা হয়। এরপর পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, দুঃখজনিত চোখের পানি আর পেয়াঁজের ঝাঁঝের কারণে আসা চোখের পানির রাসায়িনিক গঠন সম্পূর্ণ আলাদা।

তবে কান্নার ক্ষেত্রে একটি কমন সমস্যা হয়ত পরিলক্ষিত হয়, আর তা হচ্ছে কান্না অনেকেরই আসেনা। বিশেষ করে দায়িত্বশীল পুiæষরা কাঁদতে পারেন না। এক্ষেত্রে প্রথমেই করণীয় হচ্ছে নিজে থেকে সচেতন হতে হবে যে, আমার কাঁদার প্রয়োজন। অর্থাৎ নিজের আত্মউপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন যে, না কাঁদলে আবেগ প্রকাশের সহজ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হতে হবে। আর এই আত্মউপলব্ধি সৃষ্টি হলে তখন অবশ্যই একটি ইতিবাচক ফলাফল আসতে থাকবে।

তবে অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, মানুষ বিষণ্নতায় আক্রান্ত্ম হলে সহজে কাঁদতে পারে না। আর বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে মানুষ বিষণ্নতায় আক্রান্ত্ম হলে, তার বিষণ্নতা কাঁটিয়ে ওঠার প্রথম এবং প্রধান হাতিয়ারই হচ্ছে কান্না।

মনোবিজ্ঞানী ডাঃ স্যাভারি বলেছেন যে, সচেতনভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদাটাও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। মনোবিজ্ঞানী ডঃ গে গায়েরলুম বলেছেন যে, সমাজ যাদেরকে না কাঁদতে শিখিয়েছে, তাদের প্রথম কাজই প্রাণ খুলে কাঁদতে শেখা।

কারণ বর্তমানে নাগরিক সভ্যতা কান্নার ব্যাপারটিকে নিiæৎসাহিত করে। তাই আমরা সবাই চাই যেন আমাদের কান্না প্রশমিত হয়। শুধু তাই নয় আমরা কান্না চেপে রাখি, ক্রোধ, রাগ, ঘৃণা, উৎকণ্ঠা সবকিছুই চেপে রাখতে চাই। এত অনবরত আমাদের শরীরের টক্সিন বা বিষ সৃষ্টি হতে থাকে। আমরা ভুলে যাই যে, কান্না একটি সম্পূর্ণ মানবিক ব্যাপার। কান্না একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার। কান্না শরীরকে সুস্থ করে। মানসিক নিরাময়ের প্রাকৃতিক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। কান্নার ব্যাপারটি একজন মানুষকে মানবীয় গুণাবলী অর্জন করতে সাহায্য করে। আর আমরা জানি মানবীয় গুণাবলী ছাড়া প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না।

কান্নার ব্যাপারটি প্রাকৃতিক, স্বাস্থ্যকর এবং নিরাময় ক্ষমতাসম্পন্ন– এ উপলব্ধি সবার মাঝে জাগ্রত করার জন্য প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন এবং সেই সাথে প্রচুর প্রচারের প্রয়োজন। একজন মানুষের মাঝেই যে, প্রাকৃতিক নিরাময় ক্ষমতা রয়েছে এ উপলব্ধি তার মাঝেই জাগ্রত করে দিতে হবে। আর প্রাকৃতিক নিরময় প্রক্রিয়া কান্নার মাধ্যেমে যে খুব সুন্দর ভাবে সম্পাদিত হয় এ ব্যাপারটিও আমাদের সচেতনভাবে বুঝতে হবে।

সাধারণত আমরা ভাবি যে, বাচ্চারা যখন কাঁদে তখন শুধু প্রয়োজনে তাগিদেই কাঁদে। অর্থাৎ তার ক্ষzধা বা কোনও সমস্যা সেজন্য সে কাঁদছে। আবার কোনও প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ যখন কাঁদে তখন আমরা ভাবি যে হয়ত সে তার আবেগকে প্রশমিত করতে পারেনি কিংবা ব্যাপারটি মেয়েলী বা অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করি। কিন্তু কান্না মনের দুঃখ, কষ্ট, আবেগ, ক্রোধ ইত্যাদিকে বাস্ত্মবে প্রকাশ করতে এক ধরনের প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, আমাদের সামাজিক, পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপটে আমরা দেখি যে এখনও কান্নার মাধ্যমে নিরাময় ব্যাপারটি ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেনি। এর জন্য একজন আরেক জনকে যতটা না প্রভাবিত করতে পারে তার চেয়ে আত্মউপলব্ধিটাই বেশি জাiæরী। সচেতনতা আসতে হবে যে, কান্না কখনও চেপে রাখা যাবে না।

প্রথমত ঃ যে ব্যাপারটি জাiæরী আর তা হচ্ছে জোর করে কাঁদার চেষ্টা না করে স্বাভাবিকভাবে যে কান্না পায় সেটি জোর করে চেপে না রাখা, এতে ভীষণভাবে ইতিবাচক ফলাফল আসতে থাকে। এরপর আস্ত্মে আস্ত্মে কাঁদার চেষ্টা করতে থাকলে অর্থাৎ কান্নার চর্চা করে যেতে থাকলে একসময় দেখা যাবে যে আমরা আমাদের মনের দুঃখ, বেদনা, ব্যথা, অনুশোচনা ক্ষোভকে কান্নারূপে বের করে দিতে পারছি। এতে শারীরিক, মানসিক সুস্থতার চরম পর্যায়ে অবস্থান করতে না পারলেও মানসিক চাপ থেকে কিছুটাপ স্বস্তি্ম মিলবে। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কান্না মানসিক নিরাময়োর জন্য একটি বিশেষ ধরনের প্রভাবক।

চুম্বকের সাহায্যে নিরাময়

গত কয়েক দশকে স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিকল্প কোনও চিকিৎসা পদ্ধতির উপর প্রচুর গবেষণা হয়ে আসছে। গবেষণা এখনও হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে নিরাময় প্রক্রিয়ার উপর চুম্বক ক্ষেত্রের ব্যবহার নিয়ে বিগত প্রায় একশত বছরের পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্র ছাড়া বাঁচতে পারি না। আর চুম্বকক্ষেত্র একটি নিরাময় শক্তি যা সৃষ্টি হয় আমাদের শরীর থেকে এবং পৃথিবী থেকে। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে দেখা যায় যে, মানুষের সৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার জন্য পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্র ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সঠিক চিকিৎসাগত বিদ্রার প্রয়োগ সেই চুম্বকক্ষেত্রের নিরাময় শক্তিকে প্রকৃতিগতভাবে আমাদের শরীরে পুনরায় সঞ্চয় করা সম্ভব।

প্রতিটি মানুষের জীবনে ভালবাসা এক অনাবিল শান্তি এবং প্রেরণার উৎস। ভালবাসার শক্তির কারণে মানুষ কি-না জয় করতে পারে। দুটি নারীর মধ্যে ভালভাসার বহিঃ প্রকাশ ঘটে চুম্বনের দ্বারা। চুম্বনের প্রাণশক্তি ভালবাস। চুম্বন থেকেই উৎপত্তি ঘটেছে চুম্বক শব্দটির। চুম্বক জড়, নির্জীব পদার্থ হলেও চুম্বকের মধ্যে ভালবাসার শক্তি সুপ্তাবস্থায় রয়েছে। প্রতিটি চুম্বকের চুম্বক ক্ষেত্রে প্রবাহিত চুম্বক তরঙ্গ মানব দেহের অনেক জটিল রোগ নিরাময়ে সক্ষম। তাই বর্তমানে আধুনিক বায়োম্যাগনেটিক (Biomagnetic) তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে আর্থারাইটিস, বাত-ব্যথা, অনিদ্রা, গ্রাস্ট্রিক, আলসার, হাইপারটেনশন, উচ্চরক্তচাপ, অন্ত্র ও পাকস্থলীর রোগ, প্যারালাইসিস, গলeøvডার, কিড্নীর রোগ, লিভারের রোগ ইত্যাদির নিরাময়ে চুম্বকের ব্যবহার ক্রমশ-ই সাফল্যের মুখ দেখছে। এছাড়াও বায়োম্যাগনেটিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে চুম্বকের সঠিক ব্যবহার শরীরের রক্ত পরিশোধন, রক্ত প্রবাহের (Blood Circulation) সমতা বজায় রাখা, হাড় ভেঙ্গে গেলে হাড় জোড়া লাগা, হাড়ের `ªæত বৃদ্ধি, হরমোনের সমতা বজায় রাখা, যে কোন ধরনের ক্ষত নিরাময় এমনকি হতাশা থেকে মুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া বিভিন্ন গবেষণা দ্বারা দেখা গেছে যে চুম্বকের সঠিক ব্যবহারে ব্রঙ্কাইটিস, মাইগ্রেন, কোষ্ঠকাঠিন্য, Møকোমা ইত্যাদি রোগ নিরাময়েও বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। চুম্বকের প্রচন্ড ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করেই নিউইয়র্কের একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ই.কে. ম্যাকলিন বলেছেন, ***"শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্রে ক্যান্সার বিরাজ করতে পারে না।"***

চিকিৎসা ক্ষেত্রে চুম্বকের ভূমিকার ইতিহাস ঃ

ইংল্যান্ডের একজন বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী ডঃ উইরিয়ারম গিলবার্ট (১৫৪০-১৬০৩) (WHO WAS THE PRESIDENT OF THE COLLEGE OF PHYSICIAN AND THE COURT PHYSICIAN TO THE QUEEN ELIZABETH I.) যিনি প্রথম চুম্বকত্ব সম্পর্কে সাইনিটফিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। তিনি পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রদান করেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, পৃথিবী নিজেই একটি বিশাল চুম্বক। তিনি আরও সিদ্ধান্ত উপনীত হন যে, এই পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফোর্স অর্থাৎ চুম্বক শক্তি দ্বারা আক্রান্ত।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিদগণ বিভিন্ন গবেষনার দ্বারা প্রামাণ করেছেন যে, মানব শরীর চুম্বক ক্ষেত্রের একটি উৎস।

এছাড়া সুইস পদার্থ বিজ্ঞানী পার্সেলসাস চুম্বক সম্পর্কে যুগান্তকারী গবেষণার সুত্রপাত করেন এবং এর রোগমুক্তির ক্ষমতা আবিষ্কার করেন। তিনি আরও বলেন যে, চুম্বক প্রদাহ, ক্ষত এবং পাকস্থলীর রোগ সারাতে পারে। তিনি প্রকাশ করেন যে, শরীরের রোগাক্রান্ত অংশ চুম্বকের সান্নিধ্যে আনলে ওষুধের চেয়ে তাড়াতাড়ি রোগমুক্তি ঘটে। অস্ট্রীয় জ্যোতির্বিদ ফাদার হল পার্সেলসারেসর গবেষণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নার্ভাস নারী পুiæষের দেহে চুম্বক ধারণ করিয়ে নার্ভাসনেসের সফল চিকিৎসা করেন। সম্মোহনের অবিষ্কারক ডাঃ মেসমার চুম্বক শক্তি প্রয়োগ করে বহু জটিল রোগীকে সুস্থ করে তোলেন। ডাঃ মেসমার প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন চুম্বক দিয়ে নিরাময় করার ক্ষেত্রে। তিনি প্যারিসে চুম্বকের চিকিৎসা দেয়ার জন্য একটি নিরাময় কেন্দ্র খোলেন। সেখানে রোগীরা লৌহের রড সমন্বিত বড় পানিভর্তি চৌবাচ্চায় বসে থাকত।

রোগীরা তাদের শরীরের রোগক্রান্ত অংশে চুম্বক পানি ঢালত। অনেক সময় তারা হাতও ব্যবহার করত চুম্বক তরঙ্গ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সবকিছুই সম্পাদিত হয়েছিল ডাঃ মেসমারের চিকিৎসা পদ্ধতি অনুযায়ী সঙ্গীত এবং রঙ্গীন বাতির উপস্থিতিতে। অনেক সময় রোগীরা অজ্ঞান হয়ে যেত অথবা প্রচন্ড আলোড়িত হত। পরবর্তীতে এ অবস্থাকে বলা হত যে রোগীরা "মেসমারাইজড" হয়ে গেছে।

ঊনিশ শতকের শেষের দিকে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন তার থিওরী অফ রিলেটিভিটি (আপেক্ষিক তত্ত্ববাদ) যখন প্রকাশ করেন তখন দেখিয়েছেন যে ইলেকিট্রিসিটি এবং চুম্বকত্ব দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন বিষয় নয়, বরং একই জিনিসের দুটি ভিন্ন প্রকাশমাত্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চুম্বক চিকিৎসা বা ম্যাগনেট থেরাপী কিছুটা বিরাগ ভাজনের সম্মুখীন হয়েছিল, বিশেষ করে এনিটওবায়োটিকস (Antiobiotics) এবং বায়োকেমিস্ট্রি (Biochemistry) সংক্রান্ত ওষুধপত্রের ডেভেলপমেনট এবং গবেষণায়। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৪৫টি দেশে ম্যাগনোথেরাপী বা চুম্বক চিকিৎসা পদ্ধতি অফিসিয়ালী অনুমোদিত চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে চুম্বক চিকিৎসা পদ্ধতি চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেকটা পুনর্জাগরণ ঘটিয়ে দিচ্ছে।

বর্তমান বিশ্বে চুম্বক ব্যবহারের কিছু পরিসংখ্যান তথ্য ঃ

১. আমেরিকাতে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন এবং একহাজার জনের মধ্যে একশত জন চিকিৎসার বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে ম্যাগনেটিক থেরাপী ব্যবহার করে আসছে।

২. সারা বিশ্বে প্রায় ১০০ মিলিয়ন মানুষ চুম্বক চিকিৎসা পদ্ধতি বা ম্যাগনেটিক থেরাপী ব্যবহার করছে।

৩. জাপানে প্রায় ৩০ মিলিয়ন লোক (এই ৩০ মিলিয়ন সারা বিশ্বের ১০০ মিলিয়নের অন্তর্ভূক্ত) চুম্বক চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করে। তার মধ্যে ১০ মিলিয়ন লোক ম্যাগনেটিক বেড অর্থাৎ চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হয় এমন বিছানায় ঘুমায়, মানসিক চাপ, ব্যথা, ক্ষত প্রদাহ সহ নানা ধরনের অসুস্থতার নিরাময়ের জন্য।

Source: "Study Confirms the Healing Power of Magnets"

তথ্য ঃ NBC Night. News Report Jan. 6, 1999)

উপরোক্ত তথ্যগুলোর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি বর্তমান বিশ্বে চুম্বক চিকিৎসা পদ্ধতি কি পরিমাণ বিস্তৃত। বর্তমানে বাংলাদেশে আধ্যাত্মিক লাইনে যারা মানুষের রোগ নিরাময়ের জন্য নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন তারাও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য রোগীদের চুম্বক চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছেন। বিশেষ করে লাইফ শাইনিং মেথডের সফল উদ্ভাবক এবং প্রশিক্ষক হিসাবে আমি জীবন চৌধুরী, আমার বহু রোগীদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে চুম্বক চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করে অভাবনীয় সফলতা অর্জন করেছি।

কিভাবে চুম্বক নিরাময়ের জন্য কাজ করে ঃ

কিভাবে চুম্বক নিরাময়ের ক্ষেত্রে কাজ করে ব্যাপারটি সম্পূর্ণই রহস্যাবৃত। কিন্তু এ ব্যাপারে দুটি গ্রহণযোগ্য থিউরী আমরা আলোচনা করতে পারি।

প্রথমত ঃ ম্যাগনেট বা চুম্বক ক্ষত বা প্রদাহের স্থানে রক্ত প্রবাহ প্রচুর মাত্রায় বৃদ্ধি করে, যার diæন যে কোন ধরনের ইনফেকশন কিংবা প্রদাহ, ক্ষত কমতে থাকে এবং নিরাময়ের গতি `ªæত থেকে `ªæততর হতে থাকে।

দ্বিতীয়ত ঃ অন্য থিউরীর সাপেক্ষে বলা যায় চুম্বক শরীরের ইলেকট্রিক্যাল কারেনটকে কার্যকর করে। সেই সাথে ব্যথা নিরাময়কারী নিউরোট্রান্সমিটারস (Neurotransmitters) বিমুক্ত করে। ফলkÖæতিতে ব্রেইন এবং কেনদ্রীয় নার্ভাস সিস্টেম সরাসরি উজ্জীবিত হয়ে নিরাময় প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে থাকে।

চুম্বক চিকিৎসা পদ্ধতির স্বীকৃতি ঃ

১৯৭৮ সালে ফুড এন্ড ড্রাগ অ্যাডমিনেস্ট্রেশন (The Food and Drug Administration (FDA) চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ১৯৭৮ সালে ইলেকট্রোম্যাগনেটিকস (Electromagnetics)- এর ব্যবহারে স্বীকৃতি দিয়েছে। শুধু তাই নয় FDA পার্মানেনটলি চুম্বক ব্যবহারকে বেশি অনুকূল বলে মনে করছে। লাইসেন্স ধারণকারী অর্থোপেডিক সার্জনরা বছরে ১০০,০০০ অপারেশন সফলতর সাথে সম্পন্ন করেছেন হাড়ের বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে, মাসলের বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ক্ষত, প্রদাহ সহ নানারকম শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে ইলেকট্রোম্যাগনেট ব্যবহর করে। তবে প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত চুম্বক ঠিক একই ভাবে নিরাময় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে যেমনটি করে ইলেকট্রোম্যাগনেট।

চুম্বকের স্বাস্থ্যকর উপকারীতা ঃ

বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন যে, চুম্বক ক্ষেত্রের চুম্বক তরঙ্গ শরীরের রক্তে প্রবাহিত হয়, যার দুiæb কিছুটা আলোড়ন এবং তাপ উৎপন্ন হয়। ফলkÖæতিতে রক্ত জমাট বাঁধার পরিবর্তে তরলাবস্থা বজায় রেখে রক্তের স্বাভাবিক সমতা বজায় রাখে। শুধু তাই নয়, চুম্বক তরঙ্গ রক্তের প্রবাহেও সমতা বজায় রাখে। ব্যথা নাশক হিসেবে চুম্বকের নিরাময় ক্ষমতা নিয়ে প্রচুর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে পেশাদার অ্যাথলেট, টেনিস cøয়ার, গলফ্ cøয়ার, বেসবল cøয়ার, ফুটবল পেøয়ার সহ অনেকেই চুম্বকের স্বাস্থ্যকর উপকারিতায় চমৎকৃত হয়ে চুম্বকের চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করছেন। ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে রিডার্স ডাইজেস্ট (Readers Digest) চুম্বকের ব্যথা নিরাময় সংক্রান্ত একটি গবেষণার উপর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। ২৯ জন রোগীর উপর চুম্বকের চিকিৎসা পদ্ধতি চালিয়ে দেখা গেছে যে ২২ জনের ব্যথা নিরাময় হয়েছে মাত্র ৪৫ মিনিটে। BBC TV, ABC TV চুম্বকের স্বাস্থ্যকর উপকারিতা সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচর করেছে। ১৯৯৭ সালে ডিসেম্বর মাসে নিউইর্য়ক টাইমস্ (New ourk Times) সাফল্যজনক ফলাফল প্রকাশিত করেছে (চুম্বকের সাহায্যে নিরাময়ের জন্য একটি ক্লিনিক্যাল স্টাডির ফলাফল)। চীন, ভারত এবং মিশরে প্রাকৃতিক চুম্বক ব্যবহার বিভিন্ন নিরাময় প্রক্রিয়ার জন্য বহু বছর ধরে প্রচলিত। সৌনদর্যের রাণী ক্লিওপেট্রা কপালে একটি চুম্বক ধারণ করতেন রূপ যৌবন অটুট রাখার জন্য। আমাদের দেশে সাধারণভাবে প্রচলিত অশ্বক্ষzরে ব্যবহৃত লোহার আংটিতেও সুপ্ত থাকে এই চুম্বক শক্তি।

হোমিওপ্যাথির জনক ডাঃ হানিম্যান চুম্বকের রোগ মুক্তির ক্ষমতা ব্যাখ্যা করে বলেছেন, চুম্বক শক্তি দ্বারা নিরাময় সম্ভব এমন যে কোন রোগ একটি চুম্বক দন্ড কিছু সময়ের জন্যে শরীরের সঙ্গে লাগালে তা `ªæত ও স্থায়ী ভাবে রোগ নিরাময়ে সক্ষম। তিনি পুরো চুম্বক, শুধু উত্তর মেiæ ও দক্ষিণ মেiæ থেকে তিনটি পৃথক ওষুধ তৈরী করেন।

বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে জৈব চুম্বক তত্ত্ব এবং চুম্বক রসায়নের আবিষ্কার করেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে, প্রতিটি বস্তুই কোন না কোনভাবে চুম্বক শক্তিসম্পন্ন। হয় তা চুম্বক শক্তি দ্বারা আকর্ষিত বা বিকর্ষিত হয়। বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর আবিষ্কার করেন যে, গাছের প্রবৃদ্ধির সঙ্গে পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে।

লেলিন গ্রাদের একটি ক্লিনিকে কিডনী ও গলeøাডার স্টোন বিনষ্ট করার জন্যে নিয়মিত চুম্বকায়িত পানি ব্যবহার করে আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের ম্যাগনেটিক কোট, ব্যান্ড ও চেয়ার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রিক রিসার্চ, ২০০১-এ প্রকশিত হয়েছে যে বার বার চুম্বকের ব্যবহার সাইকিয়াট্রিক ডিস অর্ডার (মানসিক অসমতা)-কে নিরাময় করতে সাহায্য করে। এমনকি হতাশা, শুঁচিবাই পর্যন্ত চুম্বক ক্ষেত্রের প্রবাহিত চুম্বক তরঙ্গ দ্বারা প্রবাহিত হয়।

১৯৯৮ সালে, ইনস্টিটিউট অফ এনভায়রনমেনটাল হেলথ্ এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং চাইনীজ একাডেমী অফ প্রিভেনিটজ মেডিসিন, বেইজিং চায়না- মানবদেহের বিপাকীয় প্রক্রিয়ার উপর চুম্বকের স্থির ব্যবহারের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করে। গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে দেখা যায় যে অপরিবর্তনীয়ভাবে চুম্বকের ব্যবহার মানবদেহের বিপাকীয় প্রক্রিয়াকে উন্নত করে।

১৯৯৭ সালে বেইলর কলেজে অফ মেডিসিন পোলিও আক্রান্ত্ম রোগীদের নিয়ে গবেষণা করে। অর্থাৎ তাদের উপর চুম্বকের প্রভাব কেমন। দেখা গেছে যে, অপরিবর্তনীয় ভাবে চুম্বকের ব্যবহার পোলিও আক্রান্ত্ম রোগীদের ব্যথা উপশম করে। এই গবেষণার ফলাফল নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয়েছিল।

সুতরাং চুম্বকের চিকিৎসা পদ্ধতি এবং চুম্বকের স্বাস্থ্যকর উপকারিতা সম্পর্কে পাঠকের ধারণা আরও প্রসারিত করার জন্য উপরোক্ত আলোচনা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

চুম্বক চিকিৎসা অত্যন্ত্ম সহজ, সরল ও নিরাপদ চিকিৎসা। এতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না, ক্যাপসুল, ভিটামিন বা টনিক গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। চুম্বক তরঙ্গের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই, আর এতে ব্যয়ও কম। একবার একজোড়া চুম্বক কিনে নিলে শুধু নিজের নয় তা দিয়ে শত শত লোকের চিকিৎসা বছরের পর বছর ধরে চলতে পারে। চুম্বক কখনও তার শক্তি হারিয়ে ফেললে তা আবার চার্জ করে নেয়া যায়। একই চুম্বক ব্যবহার করা যায় সকল রোগে তা সে দাঁত ব্যথা হোক বা বাত ব্যথা, এ্যাজমা বা আর্থারাইটিস, অনিদ্রা বা প্যারালাইসিস, একজিমা বা আলসার। একই চুম্বক সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে কাজ করে।

সুতরাং চুম্বকের স্বাস্থ্যকর উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে চুম্বকের চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহারযোগ্য ঃ

প্রাণীদেহ চুম্বকের ব্যাপারে ভীষণ সংবেদশীল। অনেক গবেষণালব্ধ ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিম্নোক্ত অবস্থাগুলোকে চুম্বকের চিকিৎসার জন্য উjøখ করতে পারি–

১. চুম্বক স্নায়ুর কাজকে স্বাভাবিক ও শক্তিশালী রাখে। কারণ চুম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে শরীরের কেন্দ্রীয় স্নায়ুবিক পদ্ধতির কার্যক্রমের একটা সংযোগ রয়েছে।

২. ব্যথা নিরাময়ে।

৩. ইনফেকশন প্রশমনে।

৪. মেরাটনিন নামক হরমোনের উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং হরমোনের সমতা বজায় রাখে।

৫. এনার্জিকে পুনঃ সঞ্চয় করে।

৬. eøাড সার্কুলেশনে এবং রক্তে অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি করে।

৭. বিপাকীয় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে।

৮. আর্থারাইটস, অ্যাজমা, মাইগ্রেনসহ বিভিন্ন ধরনের ক্রনিক রোগে নিরাময় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে।

৯. খেলাধুলা সহ যে কোন ধরনের ইনজুরিতে ব্যথানাশক হিসেবে নিরাময় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।

১০. ক্রনিক পিঠের ব্যথা, ক্রনিক কাঁধের ব্যথা ইত্যাদিতেও বিশেষ নিরাময় কারক হিসেবে কাজ করে।

১১. চুম্বক তরঙ্গ বংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক কোষ সঞ্চালন রীতিকে অর্থাৎ জেনেটিক কোষকে স্থিতিশীল করে। এছাড়াও আরও কোন কোন ক্ষেত্রে চুম্বকের নিরাময় শক্তি রয়েছে সেগুলো নিয়ে বর্তমানে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে।

মানবদেহে চুম্বকের নিরাময় প্রক্রিয়া ঃ

যখন মানবদেহে চুম্বক ব্যবহার করা হয তখন চুম্বক তরঙ্গ দেহের কোষে কোষে পৌঁছে যায়। আর মানবদেহে লোহা রয়েছে রক্তে হিমোMøাবিন হিসেবে। সুতরাং এই লোহার উপস্থিতির জন্য চুম্বক তরঙ্গ রক্ত প্রবাহকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। রক্ত প্রবাহ শরীরের প্রতিটি অঙ্গে প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং দেহাব্যন্ত্মরের শ্বসন, রেচন, রক্তঞ্চালন, স্নায়ুবিক ও বিপাক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। আমাদের ব্রেইন এবং হৃদপিন্ড নতুন শক্তি লাভ করে। এতে দেহাভ্যন্ত্মরে যে তাপ সৃষ্টি হয় তা Mø্যান্ডসমূহকে সক্রিয় করে তোলে এবং হরমোনের স্বাভাবিক ক্ষরণমাত্রা বজায় রাখে। এছাড়া চুম্বক তরঙ্গ শিরা, উপশিরা, ধমনীতে চর্বি, কোলেস্টোরেল ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ জমতে বাঁধা প্রদান করে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শরীরের সবধরনের সমতাই সুস্থভাবে সম্পন্ন হয়। এমনকি কোষ্ঠ পরিষ্কার, খাওয়ার ইচ্ছা বৃদ্ধি এগুলোও বৃদ্ধি পায়। আর একটা সুস্থ শরীরের জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য এগুলোই হচ্ছে প্রধান শর্তাবলী।

চুম্বক পানি এবং তার উপকারিতা ঃ

দুটো শক্তিশালী চুম্বকের (একটির উত্তর মেiæ এবং অন্যটির দক্ষিণ মেiæ) ওপর দুটি বোতলে পানি ভরে বারো থেকে চব্বিশ ঘনটা পর্যন্ত্ম রাখলে দুটো বোতলের পানিই চুম্বকায়িত হয়ে যাবে। এই দুটো বোতলের পানিই তখন পানের উপযোগী হয়ে গেল। চুম্বক পানির কেনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। পানির মত দুধ এবং ফলের রসকেও চুম্বাকায়িত করা যায়।

তবে সেক্ষেত্রে চুম্বকের দক্ষিণ মেiæ ২/৩ ঘনটা ব্যবহার করতে হবে। চুম্বক পানি প্রাপ্তবয়স্ক রা ৫০-৫৭ মিলিলিটার এবং শিশুরা ২৫-৩০ মিলিলিটার করে প্রতিদিন ৩/৪ বার পান করতে পারে।

নিয়মিত চুম্বক পানি ব্যবহারে পাকস্থলীর হজম শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, প্রস্রাব এবং কোষ্ঠ পরিষ্ক ার হয়, গ্রাস্ট্রিক প্রশমনে ভূমিকা রাখে, গলeøাডার ও কিডনীর পাথর ধ্বংষ করে এবং দেহের ভেতর অপ্রয়োজনীয় কিছু জমাট বাঁধতে বাঁধা প্রদান করে। চুম্বকায়িত দুধ ও ফলের রস শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে গবেষকরা চুম্বকায়িত পানি গাছে দিয়ে দেখেছেন যে গাছের প্রবৃদ্ধি ২০-৪০ ভাগ `ªæততর হয়। এমনকি মৃত-প্রায় গাছকেও চুম্বক পানি দিয়ে সজীব করা সম্ভব।

চুম্বকের অন্যান্য ব্যবহার ঃ

১. জাপানী ডাঃ শিরো সাইতো চুম্বক ব্যবহার করে ইঁদুরের ক্যান্সারের চিকিৎসা সফলভাবে করেছেন।

২. নিউইয়র্কের ডাঃ ই. কে. ম্যাকলিশ চুম্বক দ্বারা ক্যান্সারের চিকিৎসা করেছেন।

৩. ক্রমাগত চুম্বক ব্যবহার করে সাদা চুল কালো করা সম্ভব।

৪. সেভিয়েত ডাঃ আই. এন কোমরভ চুম্বকায়িত চিনি খাইয়ে মাছির আয়ু দ্বিগুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, ইঁদুরের আয়ু প্রায় দেড়গুণ বাড়তে সক্ষম হয়েছেন।

৫. পশ্চিম বাংলা নৈহাটির ডাঃ ভট্রাচার্য ইঁদুর ও খরগোশের শরীরের ক্যান্সারের প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থেমে যায়।

চুম্বক ব্যবহারে কিছু নিষেধ ঃ

১. চুম্বক ব্যবহারের সময় মেঝে বা দেয়াল স্পর্শ করা যাবে না। চুম্বক ব্যবহারের সময় কাঠের চেয়ারে বসে কাঠের তক্তা বা পিড়ির ওপর পা রাখতে হবে।

২. এনিট ম্যাগনেটিক না হলে ব্যবহার্য ঘড়ি চুম্বক থেকে সব সময় দূরে রাখতে হবে।

৩. দুটো শক্তিশালী চুম্বক কখনই মুখোমুখি ধরা যাবে না।

৪. মস্ত্মিষ্কে এবং হৃদপিন্ডের ওপর কখনই শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার করা উচিত নয়।

৫. গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে কখনই শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার করা যাবে না। স্বাভাবিক কম শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার করতে গেলেও সঠিক দিক নির্দেশনা মোতাবেক করতে হবে।

৬. ভরপেটে শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার করা উচিত নয়। কমপক্ষে ১- ঘনটা অপেক্ষা করতে হবে। তবে হালকা নাস্ত্মার পর চুম্বক ব্যবহার করা যাবে।

৭. শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহারের এক ঘনটার মধ্যে ঠান্ডা খাবার ও ঠান্ডা পানীয় গ্রহণ করা যাবে না। হালকা গরম খাবার, পানীয়, চা ইত্যাদি গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮. শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহারের এক ঘনটার মধ্যে গোসলও করা যাবে না।

সর্বোপরি একজন রোগী যখন কোনও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কোনরকম অসুস্থতার জন্য চুম্বক ব্যবহার করবে তখন অবশ্যই একজন দক্ষ নির্দেশক, প্রশিক্ষক, চিকিৎসক-এর পরামর্শ মত, নির্দেশমত চুম্বক ব্যবহার করবেন।

উপসংহারে বলা যায়, আমাদের দেশে এখনও চুম্বক শক্তি ব্যবহার করে চিকিৎসা পদ্ধতি উন্নত দেশে যেভাবে প্রসার লাভ করেছে সেভাবে করেনি। এর মূলে রয়েছে কিছুটা সঠিক ধারণার অভাব, ব্যাপক গবেষণার অভাব এবং সীমিত ক্ষেত্রে চুম্বকের ব্যবহার। চুম্বক ব্যবহারের জন্য যারা পরামর্শ দেবেন তাদের যেমন চুম্বক সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন তেমনি যারা ব্যবহর করবেন তাদেরও চুম্বক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকাটা জাiæরী। সুতরাং তার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক গবেষণার এবং চর্চার। এই ক্ষুদ্র আলোচনা হয়ত পাঠককে কিছুটা হলেও চুম্বক সম্পর্কে এবং চুম্বকের নিরাময় সম্পর্কে উৎসাহী করবে।

মেডিটেশন (অটোসাজেশন)

আপনি আরাম করে বসুন। হালকা ভাবে চোখ বন্ধ কাiæন। নাক দিয়ে লম্বা দম নিন। আস্তে আস্তে মুখ দিয়ে দম ছাড়ুন। ধীরে ধীরে দম নিন। ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। দম নিতে নিতে ভাবুন। প্রকৃতি থেকে অফুরন্ত প্রাণ শক্তি আপনার দেহে প্রবেশ করছে। আর মুখ দিয়ে দম ছাড়তে ছাড়তে ভাবুন শরীরের সমস্ত দূষিত পদার্থ বাতাসের সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে। এভাবে চার/পাঁচবার দম নেয়ার পর, দম স্বাভাবিক হতে দিন। অর্থাৎ দম নাক দিয়ে নিয়ে, নাক দিয়েই ছাড়তে থাকুন। আপনার শরীর ভারী লাগতে শুiæ করবে। এবার ধীরে ধীরে নাক দিয়ে দম নিন। ধীরে ধীরে নাক দিয়ে দম ছাড়ুন। পাঁচ/ছয় বার এই স্বাভাবিক পদ্ধতিতে দম নেয়ার পরে আপনার শরীর স্বাভাবিকভাবে শিথিল হতে থাকবে। এবার মনে মনে বলুন, আরাম, আরাম, আরাম।

অনুভব কাiæন আপনার শরীর বলতে আর কিছুই নেই। আপনার বলতে রয়েছে শুধু আপনার চেতনা এবং আপনার মন। আপনি এখন পরিপূর্ণ শিথিল। শিথিলায়নের গভীর স্তরে পৌঁছে গেছেন আপনি। আপনার ব্রেইন ফিকোয়েন্সি নেমে গেছে বিটা লেভেল থেকে চরম সুখময় আশীর্বাদ পূর্ণ আলফা লেভেল। এবার আপনার মনের আলফা ড্রইং iæমে গিয়ে উপস্থিত হোন। আরাম করে আপনার চেয়ারে বসুন। আগে থেকেই আপনি আপনার এই আলফা ড্রইং iæম মনের মত করে সাজিয়ে রেখেছেন। কারণ এই ড্রইংiæমে বসেই আপনি যা কল্পনা করবেন তার প্রতটি জিনিস বাস্তব রূপান্তরিত হবে। আর এখানে বসেই করবেন উচ্চারিত প্রতিটি শব্দই এক মহাশক্তিতে রূপান্তরিত হবে। আপনার চেতনার সাথে মিলব ঘটবে এক অতিচেতনার।

অটোসাজেশনের/প্রত্যয়নের নমুনা ঃ

এ পর্যায়ে আপনি ভাবতে পারেন যে, আপনার স্মৃতিশক্তি আগে যে পর্যায়ে ছিল সে পর্যায়ে থেকে উন্নত হচ্ছে। সাহসের দৃঢ়তা বাড়ছে? আত্মবিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। আপনি আরও ভাববেন যে, অমূলক ভীতি, নেতিবাচক চিন্তা, কথা এবং নেতিবাচক কথার প্রতিক্রিয়া সকল কিছু থেকে মুক্ত হচ্ছি। আপনি আরও ভাববেন যে আপনি যা চাইছেন তা ইতিবাচক চিন্তা দিয়েই পাবেন। যেমন–

প্রত্যয়ন (১) রোগ থেকে মুক্তি ঃ

প্রতিটি মানুষের কাছেই তার সুস্থ, সুন্দর নীরোগ জীবন কাম্য। সুতরাং আপনি বলবেন যে, আমার হার্ট, ফুসফুস, লিভার, কিডনী, পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয় সব কিছু সঠিকভাবে কাজ করছে। আমার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রখর হচ্ছে। আমরা স্নায়ু এবং মস্তিষ্ক সব সময়ই সচেতন এবং সঠিকভাবে কাজ করছে।

প্রত্যয়ন ২ ঃ মুহূর্তেই প্রাণবন্ত অনুভূতি ঃ

আপনি আলফা ড্রইং iæমে চেয়ারে বসে বলবেন যে, আমি এখন চমৎকার আরাম এবং প্রশান্তি অনুভব করছি; আমার মন এখন সজীব এবং প্রাণবন্ত। এক থেকে সাত গণনা করে যখন আমি এই চমৎকার পরিবেশ থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় জাগ্রত হব, তখন আমি সম্পূর্ণ প্রাণবন্ত হয়ে যাব। আমার কর্ম-উদ্দীপনা বাড়বে। আমি হাস্যজ্জল ভাবে সুন্দর জীবন উপভোগ করব।

প্রত্যয়ন-৩ ঃ শিক্ষাজীবনে সাফল্য ঃ

শিক্ষার্থীরা এই প্রত্যয়নটি করে বিশেষ উপকার পেতে পারেন। আপনি আলফা ড্রইং iæমে বসে বলুন, আমি যা পড়ছি তার প্রতিটি লাইন আমার মনে থাকবে। আগামীকাল পরীক্ষায় যা আসবে তা আমি সম্পূর্ণ উত্তর দিতে সক্ষম হব। আমি আমার মেধা সম্পূর্ণ কাজে লাগাতে পারব।

প্রত্যয়ন-৪ ঃ স্মৃতিশক্তির উন্নতি ঃ

আমার স্মৃতিশক্তির উন্নতি হচ্ছে। প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী যা আমার মনে রাখা প্রয়োজন তাই-ই আমার মনে থাকবে।

প্রত্যয়ন-৫ ঃ নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে সাফল্য ঃ

এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব কর্মজগত রয়েছে। হতে পারে সঙ্গীত জগত, খেলাধূলার জগত, রাজনীতির ক্ষেত্রে, শিক্ষা ক্ষেত্রে, অথবা যে কোনও সৃজনশীল ক্ষেত্রে। আপনি আপনার নিজস্ব কর্মজগত অনুযায়ী বলুন, আমি আমার সর্বোচ্চ মেধা প্রয়োগ করে আমার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে আমি সফল হব।

প্রত্যয়ন-৬ ঃ আত্মবিশ্বাস এবং সম্মান বৃদ্ধি ঃ

প্রতিটি মানুষই এই পৃথিবীতে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। যার যেরকম অবস্থানই হোক না কেন, আপনি বলুন আমার আত্মবিশ্বাস বড়ছে। আমার আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হচ্ছে। সুতরাং সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের কারণে আমি সব ধরণের কজে সফলতা অর্জন করতে পারব। আমার সম্মান বৃদ্ধি পাবে উত্তরোত্তর। এই পরিবারে, সমাজে, সর্বোপরি চারপাশের মানুষজনের মাঝে আমার সম্মান বৃদ্ধি পাবে উত্তরোত্তর।

প্রত্যয়ন-৭ ঃ খারাপ অভ্যাস থেকে মুক্তি ঃ

মানুষ মাত্রেই তার মাঝে ভাল এবং মনদ এই দুটি দিকই থাকবে। সফল মানুষ তিনিই, যিনি খারাপ বা মনদ দিক গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে সুনদর জীবন লাভ করতে পারেন। সুতরাং আলফা ড্রইং iæমে প্রবেশ করে বলুন ঃ আজ থেকে আমার মাঝে কোনও খারাপ অভ্যাস থাকবে না। প্রতিনিয়ত আমি খারাপ অভ্যাসগুলো দূর করে নতুন সুনদর, অন্যের জন্য অনুকরণীয় অভ্যাস গড়ে তুলছি। আমার জীবন হচ্ছে সুনদর থেকে সুনদরতর।

প্রত্যয়ন-৮ ঃ ঘুম ঘুম অনুভূতি দূর ঃ

অনেকেরই ঘুম ঘুম ভাব অনুভূত হয়। গা ম্যাজ ম্যাজ করে। আপনারা আপনাদের মনের মত আলফা ড্রই iæমে প্রবেশ করে বলুন আমার ঘুম ঘুম ভাব দূর হয়ে যাচ্ছে। আমি সম্পূর্ণ তরতাজা এবং কর্মোদ্দম।

প্রত্যয়ন-৯ ঃ ব্যবসায় সফল হওয়া ঃ

প্রতিটি মানুষ অর্থ বিত্তে উন্নতি চায়। আর সেই মানসে সে যদি ব্যবসা করতে চায় তখন তার উদ্দেশ্যই থাকবে ব্যবসা সফল হওয়া। আপনি বলুন, আমি যে ব্যবসাই করছি সেই ব্যবসাতেই উন্নতি করছি। আমি কখনও অসৎ কর্ম তৎপরতা চালাবো না আমার ব্যবসায়ে। আমি সম্পূর্ণ সৎ থেকে ব্যবসা চালিয়ে যাবো। আমি সম্পূর্ণ সফল হয়ে উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করব।

প্রত্যয়ন-১০ ঃ খাবার গ্রহণ এবং হজম ঃ

আপনি আপনার আলফা ড্রইংiæমে বসে আপনার চেয়ারে বসে বলুন আমি আমার পছনদসই খাবার গ্রহণ করব। যা আমার স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন শুধু সেগুলোই আমি গ্রহণ করব। যা আমার iæচির সাথে পছনদসই আমি সেগুলোই খাব। এই খাবারগুলো আমার শরীর সঠিকভাবে হজম করবে এবং পূর্ণ প্রাণশক্তি গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

প্রত্যয়ন-১১ ঃ ধর্মীয় অনুভূতি বৃদ্ধি ঃ

আপনারা যে যে ধর্মেরই হউন না কেন আপনি বলুন আপনার আলফা ড্রইংiæমে এই মূহূর্তে থেকে আপনি সঠিক ভাবে ধর্মীয় কাজে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবেন।

প্রত্যয়ন-১২ ঃ বিভিন্ন ধরণের শারীরিক অস্বস্তি দূরীকরণে ঃ

হঠাৎ মাথা ব্যথা, জ্বর জ্বর ভাব, বমি-বমি ভাব বা যে কোনও ধরণের অস্বস্তি অনুভব হতেই পারে। আপনি বলুন ঃ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, সজীব, উচ্ছ্ব থাকতে চাই। আমি যখন ১ থেকে ৭ গণনা করে স্বাভাবিক অবস্থায় জেগে উঠব ঠিক তখন থেকেই আমার কোনও মাথা-ব্যথা, মাথা ঘোরা, বমি-বমি ভাব, বা যে-কোনও ধরণের অস্বস্তি আমার থাকবে না। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আমার কাজে মনোনিবেশ করব।

প্রত্যয়ন-১৩ ঃ মেডিটেশন মনোযোগ এবং একাগ্রতা বৃদ্ধি ঃ

আপনি বলুন আমি প্রতিদিন সঠিকভাবে মেডিটেশন চর্চা করব। আমার মনোযোগ এবং একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে। আমি নিজের তথা অন্যের সর্বোপরি মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারব।

প্রত্যয়ন-১৪ ঃ দেশ ও জাতির উন্নতি ঃ

আপনার অবস্থান যেমনই হোক। আপনার পেশা আপনার আর্থিক অবস্থা যেমনই হোক। আপনি বলুন, আমরা এক মহান জাতি। আমি এক মহান জাতির উত্তরসূরি, আমরা আমাদের প্রো-অ্যাকটিভ চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে এই বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ, সুন্দর, সৃজনশীল, কর্মঠ জাতিতে পরিণত হব।

প্রত্যয়ন-১৫ঃ স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের উন্নতি ঃ

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বিশেষভাবে সেনসিটিভ্। কোনও রকম সমস্যা সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই একজন স্বামী বলতে পারেন আমার দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। আমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ভাল থাকবে। অনুরূপভাবে, স্ত্রীরাও বলতে পারেন, আমার দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। আমার স্বামীর সাথে আমার সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। আমাদের ভালবাসা চিরস্থায়ী হবে।

প্রত্যয়ন-১৬ ঃ সুসন্তান কামনা করা ঃ

নিঃসন্তান দম্পতিরা, সর্বোপরি যে কোন দম্পতি সন্তান ধারণের আগে বলুন, আমার সন্তান হবে জ্ঞানে, প্রজ্ঞায়, মেধায়, চরিত্রে অনন্য এবং শ্রেষ্ঠ। কোনও কারণে কেউ যদি নিঃসন্তান থাকেন তাহলে বলুন অতি-অল্পকিছু দিনের মধ্যেই আপনি সন্তান লাভ করবেন। আপনার সন্তান হবে সুসন্তান।

প্রত্যয়ন-১৭ ঃ পারিবারিক শান্তি কামনা ঃ

আমরা প্রত্যেকেই সবসময়েই এক পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ। আমরা সবাই-ই চাই আমাদের পরিবারে স্বর্গের সুখ বিরাজ কiæক। আলফা ড্রইংiæমে প্রবেশ করে চেয়ারে বসে বলুন-আমার পরিবার সকল সুখের আধার। আমার পরিবার সকল শান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার পরিবার হবে অন্যের জন্য অনুকরণীয় একটি সুখী এবং আদর্শ পরিবার।

প্রত্যয়ন-১৮ ঃ নেশা থেকে মুক্তি ঃ

যারা নেশাগ্রস্থ, মাদকাসক্ত তারা এই প্রত্যয়ন করে বিশেষ উপকার পেতে পারেন। আপনি বলুনঃ আমি নেশা থেকে মুক্তি লাভ করছি। ১ থেকে ৭ গণনা করার সাথে সাথে আমি যখন স্বাভাবিক হয়ে জেগে উঠব, তখন থেকে আমার নেশাগ্রস্থতার অভ্যাস আর থাকবে না।

প্রত্যয়ন-১৯ ঃ বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি ঃ

বর্তমান যুগ আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ। আমরা বিজ্ঞানের জয়গানে উদ্ভাসিত হতেচাই। চাই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। বলুন, আমি একজন আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক মনোভাবের মানুষ। আমার বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গী ছড়িয়ে দিতে চাই সবার মাঝে।

প্রত্যয়ন-২০ ঃ কুসংস্কার থেকে মুক্তি ঃ

কুসংস্কার, কূপমন্ডুকতা আমরা কেউই চাই না। আপনি বলুন, আমি কুসংস্কাস্কারাচ্ছন্ন ধারণাগুলো থেকে মুক্ত হচ্ছি। আমার মাঝে কোনও কুসংস্কার নেই। কুসংস্কার থেকে মুক্তি পেয়ে আমি আমার জীবনকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করছি।

প্রত্যয়ন-২১ ঃ ব্রেইনের ব্যবহার বৃদ্ধি ঃ

আপনি আলফা ড্রইং iæমে গিয়ে বলুনঃ এখন থেকে আমার ব্রেইনের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার ব্রেইনের যে অংশটুকু আমি ব্যবহার করতাম এক থেকে সাত গোনার সাথে সাথে আমি যখন স্বাভাবিক অবস্থায় জেগে উঠব তখন থেকেই আমার ব্রেইনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে উত্তরোত্তর।

আত্ম প্রত্যয়ন ঃ

সর্বোপরি আপনি প্রতিজ্ঞা kaiæন নিজের সাথে। আপনি বলুন-আপনি প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাবেন। কারণ আপনি জানেন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। আপনি শিক্ষা গ্রহণ করবেন। আপনি বলুন-আমি সুশিক্ষিত হয়ে উঠছি প্রতি মুহূর্তে। আমার চারপাশের পরিবেশ আমাকে সহযোগীতা করছে শিক্ষা গ্রহণ করতে। আপনি বলুন-আমার পরিবারের মানুষগুলো সমাজের মানুষগুলো সবাই আপনাকে ভালবাসছে। আপনার ইন্দ্রিয়গুলো সবসময়ই ইতিবাচকভাবে সচেতন থাকছে। আপনি বলুন-আমি হাস্যেজ্জল, প্রাণোচ্ছল একজন মানুষ। আমি সব সময় সবার সাথে হাসি মুখে কথা বলব। সবসময় নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখব। আপনি যে ধর্মেরই হোন না কেন, বলুন আমার নীতিবোধ, বিশ্বাস সমসময় এক এবং অবিচল। সর্বোপরি বলুন, আমি কর্মোদ্যম হতে চাই। আমি কর্মোদ্যম হয়ে আমাকে গড়তে চাই। মানবতার কল্যাণ করতে চাই। অর্থাৎ যাই করবেন তার পেছনে যেন একটা ভাল, সৎ এবং মহৎ উদ্দেশ্য থাকে।

লাইফ শাইনিং মেথড়ে প্রত্যয়ন ঃ

লাইফ শাইনিং মেথড্ মেডিটেশন চর্চার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী বিজ্ঞান সম্মত মেথড্। আপনি লাইফ শাইনিং মেথডের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী মেডিটেশন চর্চা করে, প্রত্যয়ন করে বা অটোসাজেশন করে সুন্দর ও সফল জীবন লাভ করতে পারেন। তবে তার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, পরিশ্রম এবং ইতিবাচক চিন্তা। আপনি লাইফ শাইনিং মেথড়ে মেডিটেশন করে আলফা ড্রইং iæমে যেয়ে বলুন-আমি এক অনন্য মানুষ। আমি নিজেকে ভালবাসি। পৃথিবীর সবাইকে ভালবাসি। সকল বাঁধা বিপত্তি, প্রতিকূলতার মাঝেও আমার ধৈর্য থাকবে আপরিসীম। আমি নিজের তথা বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণ কামনা করছি। এক্ষেত্রে লাইফ শাইনিং মেথড্ হোক আমার নতুন আলোর পথের দিশারী।

মেডিটেশনের সাহায্যে আয়ু বৃদ্ধি

মেডিটেশনের চর্চার মাধ্যমে আয়ূ বৃদ্ধি পায় কিনা এ সংক্রান্ত অনেক গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তবে গবেষণালব্ধ ফলাফলের কথা না বলে আমরা যদি আমাদের সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করি তাহলে বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে। কারণ মেডিটেশনের চর্চার মাধ্যমে মনের শক্তির সঠিক ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ এবং সেই সঙ্গে মনের শক্তি বাড়ানোর কৌশল মানুষ শিখে। আর তাই তখন মানুষের মনে দুঃখ, দুশ্চিন্তা, ক্ষোভ, কষ্ট, ক্রোধ এগুলো আসল গেড়ে বসতে পারে না। সেজন্য মানুষ সবসময় উচ্ছ্বল, প্রাণবন্ত থাকে, আর যা মানুষের জীবনশক্তি বাড়ার বিশেষ সহায়ক।

এছাড়া সাধারণত মানুষ মৃত্যুবরণ করে যে সমস্ত রোগের কারণে যেমন-হার্ট অ্যাটাক, হাইপ্রেশার, কোলস্টেরল বৃদ্ধি ইত্যাদি। কিন্তু মেডিটেশনের দ্বারা এগুলোর প্রত্যেকটির নিরাময় যেমন-ইতিবাচকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব তেমনি এই রোগগুলো মানুষ কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে তারও একটা দিক-নির্দেশনা পেয়ে যায়-এভাবে অবশ্যই মৃত্যু ঝুঁকিটা অনেকটাই হ্রাস পায়। স্বাভাবিকভাবে মানুষের জীবনের পরিধি বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া জীবন সংহারী ক্যান্সার রোগ নিরাময়েও মেডিটেশন ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং জীবনের পরিধি সেখানেও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপরন্তু মানুষ নেতিবাচক চিন্তাকে সবসময়ই পরিহার করতে শেখে যখন সে মেডিটেশন চর্চা শুiæ করে। এভাবে কোনও রকম মানসিক চাপ ছাড়া একজন মানুষ স্বাভাবিক সুন দর জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়।

মেডিটেশন আয়ু বৃদ্ধি করে কিনা এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের একটি চমৎকার গবেষণামূলক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯০ সালের ২৮ এপ্রিলে সাপ্তাহিক "নিউ সায়েনটিস্ট" পত্রিকায়।

এই রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের দু'দল বিজ্ঞানী দাবি করেছেন যে ট্র্যান্সেন্ডেন টাল মেডিটেশন (Transcendental Meditation বা সংক্ষেপে T.M) মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করতে সক্ষম, জীবনের মানও বৃদ্ধি করতে সক্ষম। এমনকি তারা আরও বলেছেন যে, বয়স্ক ব্যক্তিরা যদি দিনে দু'বার ট্র্যান্সেন্ডেন টাল মেডিটেশন চর্চা করেন, তাহলে উচ্ছ্বাস, প্রাণবন্ততা বাড়ার সাথে সাথে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পাবে।

রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যে, আইওয়ার ফেয়ার ফিল্ডের মহাঋষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চার্লস আলেকজান্ডার ও হাওয়ার্ড শ্যান্ডলার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সাথে নিয়ে ৭৩টি রিটায়ারমেন ট হোম-এর বাসিন দাদের উপর গবেষণা পরিচালনা করেন। হোম-এর বাসিন দাদের বয়স ছিল ৮১ বছর। তাঁরা বয়সের উপর তিনটি মেডিটেশন পদ্ধতির তুলনামূলক প্রভাব পর্যালোচনা করেন।

তারা অপরিকল্পিতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনটি পদ্ধতি থেকে একটি করে মেডিটেশন পদ্ধতি শিক্ষা দেন। তিনটি MÖæপের সদস্যরা তাদের নিজ নিজ পদ্ধতিতে মেডিটেশন করতে থাকেন। আর চতুর্থ MÖæপের কোনও মেডিটেশন পদ্ধতিই শেখানো হল না।

আলেকজান্ডার এবং তা সহযোগী গবেষকরা তিন মাস পর এই চারাটি MÖæপের লোকদের অবস্থা পর্যালোচনা করেন। তারা দেখেনে যে, ৪টি MÖæপের মধ্যে যারা ট্রান্সেন্ডন টাল মেডিটেশন করছিলেন, তাদেরই সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছে। গড়ে তাদের সিস্টেলিক রক্ত চাপ ১৪০ থেকে ১২৮-এ নেমে এসেছে। আর এ কথা অবধারিতভাবে সত্য যে, উচ্চ রক্তচাপ নেমে এলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকখানি কমে যায়। আর হার্ট অ্যাটাক মৃত্যুর একটি বড় কারণ। গবেষকগণ আরও দেখেন যে, ট্র্যান্সেন্ডেন টাল মেডিটেশন চর্চা করছেন এমন সদস্যদের চিন্তাশীলতা, স্মৃতিশক্তি আগের চেয়ে অনেক অনেক বেড়ে গেছে। তিন বছর পর আবার একই হোম জরিপ চালিয়ে দেখা গেল যে, বিস্ময়করভাবে ট্র্যান্সেন্ডেন টাল মেডিটেশন MÖæপের সবাই বেঁচে আছেন। অন্যদিকে অন্য তিনটি MÖæপের প্রতিটি MÖæপ থেকেই বেশ কিছ সদস্য মারা গেছেন। এছাড়া রিটায়ার হোমের ৪৭৮ জন বাসিন দার মধ্যে যাদের এই গবেষণার আওতায় আনা হয়নি, এই সময় তাদের মৃত্যুর হার ছিল শতকরা ৬২.৫ ভাগ।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ঃ মেডিটেশনের কার্যকারিতা সংক্রান্ত গবেষণার আলোকে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন মনোদৈহিক প্রক্রিয়া যেমন উচ্চ রক্তচাপ, দৃষ্টিশক্তি, জেনিটিভ ফাংশনিং, ডিয়াস হরমোন-এর মাত্রা সেই সঙ্গে কার্যকরী ক্ষমতার অবনতি ঘটতে থাকে। মেডিটেশনের চর্চায় উপরোক্ত ব্যাপারগুলো বিশেষ উন্নতি ঘটতে থাকে। আর ট্র্যান্সেন্ডেন্টাল মেডিটেশন চর্চায় এই প্রক্রিয়াগুলোর ব্যাপক উন্নতি ঘটতে তাকে। এখানে উ[jø]খ্য যে, ডিয়াস হরমোন উৎপন্ন হয় অ্যাড্রিনাল Mø্যান্ডে, তাiæণ্যে এই হরমোনের মাত্রা বেশি থাকে এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে এর মাত্রা কমতে থাকে। আলেকজান্ডার ও তাঁর সহযোগী গবেষকরা রিটায়ার হোমে যে গবেষণা চালিয়েছিলেন, সেই গবেষণালব্ধ ফলাফলেও তাঁরা দেখেছেন যে, ট্র্যান্সেন্ডেন্টাল মেডিটেশনে উপরে উjjøখিত মনোদৈহিক প্রক্রিয়াগুলোর বিশেষ উন্নতি হয়।

সুতরাং, মেডিটেশনে আয়ু বৃদ্ধি পায়, একথা আমারা বলতে পারি। তবে এ সংক্রান্ত গবেষণা আরও বর্তমানে হচ্ছে। ভবিষ্যতে মেডিটেশনে আয়ু বৃদ্ধি সুফল আমরা আরও পাব একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

মেডিটেশনের সাহায্যে নিরাময়

মেডিটেশনের উপকারিতা নিয়ে বিগত কয়েক দশকে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। প্রায় ১০০০-এর উপর এই ধরণের গবেষণাগুলো থেকে বেশির ভাগগুলোই বিভিন্ন সাইনিটফিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। সেসমস্ত্ম গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে দেখা যায় মেডিটেশনের উপকারিতা তিনভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়।

(১) শারীরিক উপকারিতা।

(২) মানসিক উপকারিতা।

(৩) আধ্যাত্মিক উপকারিতা।

মেনিনজার ফাউন্ডেশনের বায়োফিডব্যাক এন্ড সাইকোফিজিওলজি ক্লিনিকের ডিরেক্টর ডঃ প্যাট্রিশিয়া নরিস বলেছেন, "আমাদের এখানে আমরা মেডিটেশন ব্যবহার করছি ক্যান্সারের নিরাময়ের জন্য, এইডস রোগীদের জন্য। আমরা এখানে মস্তিষ্কের নিউরন সংক্রান্ত্ম রিদমকে নরমাল বা স্বাভাবিক করার জন্য মেডিটেশন ব্যবহার করছি। অ্যালকোহল এবং ড্রাগে যারা আসক্ত তাদের জন্যও মেডিটেশন ব্যবহার করা হচ্ছে। সর্বোপরি এখানকার সব রোগীরাই মেডিটেশন ব্যবহার করছে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য। বিশেষ করে দুশ্চিন্ত্মা, হাইপারটেনশন ইত্যাদি কারণে যাদের বিভিন্ন ধরনের শারীরিক, মানসিক অসমতা সৃষ্টি হয়েছে। স্ট্রেসকে নিয়ন্ত্রণের জন্য মেডিটেশন ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই আমরা যে কারো জন্য খুবই উঁচু স্ত্মরের সুস্থতা এবং ভাল অনুভব করার জন্য মেডিটেশনের প্রাকটিসকে রিকমেন্ড করছি।"

যতই দিন যাচ্ছে, মেডিটেশন এবং মেডিটেশনের উপকারিতা সংক্রান্ত্ম গবেষণার সংখ্যা বাড়ছে। চিকিৎসকগণ, সাইকিয়াট্রিস্ট, সাইকোথেরাপিস্ট সহ প্রায় সব ধরনের পেশার মানুষ তাদের চর্চায় মেডিটেশনকে অন্ত্মর্ভূক্ত করছেন। প্রায় ছয় হাজার এর উপর চিকিৎসকগণ ট্রান্সেন্ডেনটাল মেডিটেশন (Transcendental Meditation) চর্চা করতেন এবং তাদের রোগীদের পরামর্শ দিতেন যে তারা যেন ট্রান্সেন্ডেনটাল মেডিটেশন চর্চা করে। ডীন অরনিশ, এম.ডি.প্রমাণ সাপেক্ষে বলেছেন যে, হার্টের অসুখ মেডিটেশন পদ্ধতি চর্চার মাধ্যমে তাৎপর্যমূলক ভাবে কমে যায়। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু চিকিৎসকগণ, গবেষকগণ মেডিটেশনকে সমন্বিত স্বাস্থ্য প্রোগামের মধ্যে অন্ত্মর্ভূক্ত করছেন। নিম্নে মেডিটেশনের বিভিন্ন ধরণের উপকারিতার উপর আলোকপাত করা হলঃ

১. শারীরিক উপকারিতা ঃ

বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে মেডিটেশনের শারীরিক উপকারিতাগুলো নিম্নরূপঃ

১. মেডিটেশনের মাধ্যমে যেহেতু গভীর বিশ্রাম হয় তাই সেক্ষেত্রে শারীরিক বিপাকীয় প্রক্রিয়ার হার হ্রাস পায়, হার্টবিট এর হ্রাস পায়, ফলkÖæতিতে শরীরের উপর কাজের প্রেশার কমে যায়।

২. মানসিক স্ট্রেস বা চাপের কারণের সাথে জড়িত রয়েছে দুটি রাসায়নিক পদার্থ ঃ ***ল্যাকটেট এবং কর্টিসোল***। মেডিটেশন চর্চার কারণে রক্তে ল্যাকটেট এবং কর্টিসোল কমে যায়, ফলে দুশ্চিন্ত্মা অনেক কমে যায়। মানসিক চাপ বা স্ট্রেস অনেক কমে যায়।

৩. রক্তে এবং জীবকোষে যে সমস্ত্ম পদার্থের উপস্থিতির কারণে জীবকোষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিংবা যে সমস্ত্ম পদার্থের উপস্থিতির কারণে মানুষ তাড়াতাড়ি বার্ধক্যে উপনীত হয় মেডিটেশন চর্চার কারণে সে সমস্ত্ম পদার্থের উপস্থিতির হার হ্রাস পায়।

৪. উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন নিয়ন্ত্রেণে মেডিটেশনের সাফল্য অভাবণীয়। মেডিটেশন চর্চার কারণে উচ্চ রক্তচাপ হ্রাস পায়।

৫. মেডিটেশন অস্বাভাবিক বেশি কোলেস্টোরেল মাত্রাকে কমিয়ে আনতে পারে। আর বেশি কোলেস্টোরেল হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ।

৬. মেডিটেশন আমাদের দেহের চামড়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। আর চামড়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি কম থাকে তাহলে তার সাথে উচ্চ মানসিক চাপ এবং প্রচন্ড মানসিক উদ্বেগ-এর একটা সম্পর্ক থাকে।

৭. মেডিটেশনের কারণে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া বা ফেলার বিশেষ ব্যায়াম বা চর্চা হয়। আর এতে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি প্রকৃতিরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। কারণ ফুসফুসে বিশুদ্ধ বাতাস যাতায়াত করতে পারে। আর এতে অ্যাজমা রোগীদের যথেষ্ট নিরাময় হয়।

৮. মেডিটেশন দীর্ঘদিন চর্চার কারণে আমাদের জীবনের পরিধি বৃদ্ধি পায়। যৌবণের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৯. মেডিটেশন ক্যান্সারের নিরাময়েও যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

১০. মেডিটেশন চর্চায় রক্তে এড্রিনালিন হরমোনের মাত্রা কমে যায়। রক্তে এড্রিনালিন হরমোনের মাত্রা বেশি হলে জীবকোষ ও টিস্যুর পুনর্গঠন প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায়। এছাড়া টেনশেনের কারণেও অনেক সময় রক্তে এড্রিনালিণ হরমোনের আধিক্যতা বেড়ে যায়। আর মেডিটেশন যেমন-টেনশনকে কমায় তেমনি রক্তে এড্রিনালিন হরমোনের পরিমাণকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

২. মানসিক উপকারিতা ঃ

মেডিটেশনের কারণে মানসিক উপকারিতাও যথেষ্ট। যেমন-

১. মেডিটেশন নিয়মিত চর্চায় ব্রেইন ওয়েভের কার্যকারিতা বেড়ে যায়। এছাড়া ব্রেইন ওয়েভের কার্যকারিতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রেইনের বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতাও বেড়ে যায়। বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে দেখা গেছে যে ফলkÖæwততে মানুষের সৃজনশীলতা বেড়ে গেছে বহু গুণ, নৈতিক চরিত্রের উন্নতি হয়েছে যথেষ্ট, এমনকি আই.কিউ. (I.Q)-এর মাত্রা অনেক উঁচু।

২. মেডিটেশন চর্চার কারণে মানুষ ডিপ্রেশন বা হতাশা ভোগার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে।

৩. মানসিক উদ্বেগ কিংবা টেনশনও বহুমাত্রায়হ্রাস পেতে পারে।

৪. স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

৫. শিক্ষাগ্রহণ সংক্রান্ত্ম যে কোনও দক্ষতাও মানুষের বৃদ্ধি পায়।

৬. ক্রোধ, ঘৃণা, ক্ষোভ, উত্তেজনা, বিরক্তি, সনেদহ এগুলোর কোনটিই একজন মানুষের জন্য ভাল নয়। আর মেডিটেশন চর্চার দ্বারা এগুলোর প্রত্যেকটিই প্রশমিত হয়।

৭. মেডিটেশন চর্চার দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রণ তথা আত্মপ্রকৃতি উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

৮. মানুষের মানসিক প্রশান্ত্মি বাড়ে।

৯. মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে মানুষ আবেগকে নিয়ন্ত্রণ তথা আবেগের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

১০. সর্বোপরি প্রাণশক্তি, জীবনী শক্তি বৃদ্ধির সঞ্চার হয়।

৩. আধ্যাত্মিক উপকারিতা ঃ

মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে যে শুধু শারীরিক উন্নতি সাধিত হয় তা নয়, আত্মিক উপকারিতাও মেডিটেশনের যথেষ্ট। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উপকারীতাও মেডিটেশনের ক্ষেত্রে বহুবিধ। কারণ এই পৃথিবীতে আমরা যত সাধক, মুণি, ঋষি দেখি তাদের প্রত্যেকের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় যে, তারা প্রত্যেকেই মেডিটেশন করতেন। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করতে চাইলে, আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করতে চাইলে এবং আধ্যাত্মিকভাবে কোনও উদ্দেশ্য সফল করতে চাইলে অবশ্যই মেডিটেশনের বিকল্প নেই।

সুতরাং মেডিটেশনের উপকারিতা বহুবিধ। নিম্নে বিভিন্ন মানসিক সমস্যা ও বিভিন্ন রোগের নিরাময় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মেডিটেশনের ভূমিকার উপর আলোকপাত করা হল–

১. মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ ঃ

যারা মেডিটেশন চর্চা করেন তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ফলাফল থেকে দখো যায় যে, মেডিটেশন মেনটাল স্ট্রেস বা মানসিক চাপকে বহুলাংশেহ্রাস করে। বিভিন্ন কারণেই মানুষ মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে পারে, যেমন– পারিবারিক এবং সামাজিক টানাপোড়ন, জীবনে চাওয়া এবং পাওয়ার সাথে অসমতা, অসুস্থতা এসমস্ত্ম নানা কারণে মানুষ মানসিক চাপের

সম্মুখীন হয়। বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে দেখা যায় যে মেডিটেশন মানসিক চাপকে বহুলাংশে প্রশমিত করে। বিগত ৩০ বছরে এ সংক্রান্ত বহু গবেষণা হয়েছে। ডঃ বেনসনের গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে পাওয়া গেছে যে–

- মেডিটেশনের চর্চার অক্সিজেন গ্রহণের পরিমাণ কমে যায়।
- মেডিটেশন চর্চায় শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি কমে যায়।
- মেডিটেশনের কারণে eøাড সার্কুলেশন বৃদ্ধি পায়।
- হৃদপিন্ডের হার্ট-বিটের হারও কমে যায়।
- শিথিলায়নের চরম পর্যায়ে মানুষ অবস্থান করে।
- উচ্চ রক্ত চাপ কমে যায়।

আর উপরোক্ত কারণসমূহের ফলkÖæতিতে যা হয় আর তা হচ্ছে- মানসিক স্ট্রেস বা চাপ বহুগুলে প্রশমিত হয়। উদ্বেগ-চাপ, ক্ষোভ প্রশমিত হয়ে মানুষ সম্পূর্ণ আশীর্বাদপূর্ণ, স্বচ্ছ জীবন লাভ করতে সমর্থ হয়।

২. নেশার আসক্তি থেকে মুক্তি ঃ

বিভিন্ন মাদকদ্রব্যের নেশায় যারা আসক্ত তাদের চিকিৎসার জন্য, নিরাময়ের জন্য মেডিটেশন খুবই উপকারী। কারণ "ট্রানসেন্ডেন্টাল মেডিটেশন (The Transcendental Meditation)"-এর সাহায্যে মাদকদ্রব্যে আসক্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে গবেষণা করা হয়েছে এবং গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে যে, মেডিটেশন এ ব্যাপারে যথেষ্ট নিরাময়কারক হিসেবে কাজ করে।

৩. আয়ু বৃদ্ধি ঃ

মেডিটেশন চর্চার সাথে মানুষের আয়ু বৃদ্ধির একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। কারণ সাইনিটফিক ব্যাখ্যার আলোকে বলা যায়– যে, দুটো কারণে মানুষের জীবনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। যেমনঃ– (১) শরীরের অন্তঃস্থ তাপমাত্রা হ্রাস। (২) ক্যালরিক রেসট্রিকশন বা শরীরের এনার্জির ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমিতকরণ। মেডিটেশন চর্চার কালে দেখা যায় যে, শরীরের তাপমাত্রাও যথেষ্ট হ্রাস পাচ্ছে আবার শরীরের শক্তি কিংবা এনর্জি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ চলে আসছে। আর উপরোক্ত দুটি ব্যাপারের পরিপ্রেক্ষিতে যা হয় মানুষ সমস্ত রোগ জরা ব্যাধি থেকে দূরে থেকে দীর্ঘ জীবন লাভ করে।

৪. ব্যথা উপশম ঃ

মেডিটেশন ব্যথা উপশমের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ডঃ কাবাট-জিন (Dr. Kabat-Zin, The Founder and Director of the Stress Reduction Clinic at the University of Massa chusetts Medical Center, and Associate Professor of Medicine in the Division of preventive and Behavioral medicine at the University of Massa chusetts Medical School) ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস-এর মেডিক্যাল সেন্টারের স্ট্রেস রিডাক্শন ক্লিনিক-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং ডিরেক্টর। ৭২ জন ক্রনিক ব্যথায় আক্রান্ত রোগীকে নিয়ে একটি গবেষণা করেছিলেন। এ সমস্ত রোগীরা স্বাভাবিক চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করে ততটা লাভবান হচ্ছিল না। কিন্তু এ সমস্ত রোগীদের উপর ডঃ কাবাট-জিন মেডিটেশন চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন। পুরো ৮ সপ্তাহ তিনি পুরোপুরিভাবে রোগীদের মেডিটেশন করালেন। এরপর দেখা গেল শতকরা ৭২ ভাগ রোগীদের মধ্যে শতকরা ৩৩ ভাগ রোগীদের ব্যথা উপশম হল আগের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। এছাড়া শতকরা ৬১ ভাগ রোগীদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ রোগীদের সমস্যা আগের চেয়ে সমাধান হল। তাদেরকে ডঃ কাবাট-জিন তাদের দেহ সম্পর্কে একটা ইতিবাচক ধারণা দিলেন। এতে তাদের যথেষ্ট উপকারও হল। মেডিটেশনের মাধ্যমে হয়ত একজন ক্রনিক ব্যথার রোগীর পুরোপুরি নিরাময় সম্ভব হয় না। কিন্তু একজন মানুষকে ক্রনিক ব্যথার ক্রমশঃ ধারাবাহিকতা থেকে হয়ত রক্ষা করবে। ডঃ কাবাট-জিনের গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে আমরা তাই-ই বুজতে পারি।

৫. ব্রেইন ওয়েভের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ঃ

মেডিটেশন করার সময় আমরা যখন আলফা লেভেলে উপনীত হই তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা শিথিলায়নের চরম পর্যায়ে উপনীত হই। তখন আমাদের ব্রেইনের ডানে, বামে, সামনে, পিছনে- এই চার অংশ উদ্দীপিত হয়। এপর্যায়ে ব্রেইন ওয়েবের কার্যকারিতা আমরা যে ভাবেই চাইব সে ভাবেই সম্ভব হবে। বিভিন্ন গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণে সেরকমই পরিলক্ষিত হয়েছে।

৬. ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ঃ

ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় বর্তমানে মেডিটেশনেকে ব্যবহার করা যায়। বিখ্যাত অস্ট্রোলিয়ান সাইকিয়াট্রিস্ট ডঃ এইন¯øাই মিয়াস (Dr. Ainslie Meares) ৭৩ জন ক্যান্সার রোগীকে নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। অর্থাৎ ৭৩ জন ক্যান্সার রোগীদের অন্তত্বতঃপক্ষ ২০টি সেশন মেডিটেশন করিয়ে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন– “এ সমস্ত্ম ক্যান্সার রোগীদের সবাই হতাশা এর্ব উদ্বিগ্নতা থেকে মুক্তি পাবে। সেই সঙ্গে তাদের অস্বস্তি্ম দূর হবে এবং ব্যথা উপশম হবে। শতকরা ১০ ভাগ সম্ভবনা রয়েছে এসমস্ত্ম রোগীদের টিউমার বৃদ্ধির হার ধীরতর হয়ে যাবার এবং শতকরা ৫০ ভাগ সম্ভবনা রয়েছে এ সমস্ত্ম রোগীদের ক্ষেত্রে জীবন-যাত্রার মান আগের থেকে ভাল হয়ে যাওয়ার।”

সুতরাং মেডিটেশন ক্যান্সার রোগের নিরাময়ের ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৭. উচ্চ রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণে ঃ

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে মেডিটেশনের সাফল্য অভাবনীয়। উচ্চ রক্ত চাপের সংকট সীমায় যাদের অবস্থান তারা মেডিটেশনে `ªæত প্রশান্তি্ম অনুভব করেন। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল কর্তৃক পরিচালিত ১৯৭৪ সালের এক সমীক্ষায় বলা হয়, ২২ জন উচ্চ রক্তচাপ আক্রান্ত্ম রোগীকে মেডিটেশন শেখার আগে ও পরে মোট ১২০০ বার পরীক্ষা করা হয়। এক মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত্ম সময়ের মধ্যে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে তাদের গড় রক্তচাপ ১৫০/৯৪ থেকে ১৪১/৮৮-তে নেমে এসেছে। এছাড়া ডঃ বেনসন ৩৬ জন মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং গবেষণা করে দেখেছেন যে, কয়েক সপ্তাহ মেডিটেশন চর্চার পর তাদের উচ্চ রক্তচাপ আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে।

৮. হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণে ঃ

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের মেডিসিনের প্রফেসর ডঃ হার্বাট বেনসন গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, মেডিটেশন চর্চার দiæন গড়ে হার্ট বিট প্রতি মিনিটে ৩টি বিট কমে। ফলে হার্পের কাজের পরিমাণও কমে যায়। সানফ্রান্সিসকোর কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ ডিওরনিশ ১৯৮৮ সালে দীর্ঘ গবেষণার পর প্রমাণ করেন যে, ৪০ জন গুiæতর হৃদরোগী তাদের করোনারী আর্টারিতে জমে থাকা চর্বি হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছেন। অতিরিক্ত চর্বি তাদের আর্টারি গুলোর রক্ত সঞ্চালনের পথকে ক্রমশঃ সংকুচিত করে দিচ্ছিল। এই ৪০ জন রোগী যখন মেডিটেশন শুiæ করলেন তখন তাদের আর্টারিগুলো একটু একটু করে খুলে যাওয়ার সাথে সাথে ফ্রেশ অক্সিজেন তাদের আর্টারিগুলো একটু একটু করে খুলে যাওয়ার সাথে সাথে ফ্রেশ অক্সিজেন পৌঁছানো শুiæ করল এবং তারা ভীতিকর ব্যথা থেকে মুক্তি পেলেন। সেই সঙ্গে তাদের স্ট্রোক-এর আশঙ্কাও অনেকটা কমে গেল। এছাড়া মেডিটেশন অস্বাভাবিক বেশি কোলেস্টেরল মাত্রাকে কমিয়ে আনতে পারে। কোলেস্টেরল হার্ট অ্যাটাকের প্রাথমিক কারণ। ১৯৭৯ সালে দুজন গবেষক এম.জে. কুপার এবং এম.এম আইজেন ২৩ জন উচ্চ কোলেস্টেরল সম্পন্ন রোগী বেছে নিলেন তাদের গবেষণার জন্য। তাদের মধ্যে ১২ জনকে মেডিটেশন করতে শেখানো হয়। তারা দীর্ঘ ১১ মাস মেডিটেশন করেন। ১১ মাস পর দেখা গেল যে, মেডিটেশনকারী MÖæপের কোলেস্টেরল উ‡jøখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। আর কোলেস্টেরল- এর মাত্রা কমে গেলে হৃদরোগের ঝুঁকিও কমে যায়।

৯. সন্ত্মানহীন দম্পতিদের ক্ষেত্রে ঃ

সন্ত্মানহীন দম্পতিরা অনেক সময় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত্ম থাকেন, হতাশায় ভুলেন। তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য ডঃ এলিস ডি. ডোমার (Dr. Alice D. Domar) নামক একজন সাইকোলজিস্ট মাইন্ড/বডি মেডিকেল

ইন্সস্টিটিউটে একদল সন্তানহীন দম্পতিদের উপর নিরীক্ষা চালিয়ে ছিলেন। তাদেরকে তিনি মেডিটেশন শিখালেন এবং চর্চা করতে বললেন। পাশাপাশি আরেক দল সন্তানহীন দম্পতিদের উপর নিরীক্ষা চলালেন যারা মেডিটেশন শিখেনি বা চর্চা করছে না। দেখা গেল কিছুদিন পর যারা মেডিটেশন চর্চা করত সেই সব দম্পতিরা মানসিকভাবে আগের চেয়ে ভাল অনুভব করছেন, হতাশা কেটে যাচ্ছে এবং আরও গুiæত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে মেডিটেশন চর্চা করার পর সেই সব দম্পতিদের মধ্যে অনেকে সন্তান লাভেও সমর্থ হচ্ছেন।

১০. চর্মরোগ নিরাময়ে মেডিটেশন ঃ

চর্মরোগ, খোস-পাচড়া এগুলোর নিরাময়ের ব্যাপারে মেডিটেশনের কোনও প্রভাব আছে কিনা সেজন্য ডঃ কাবাট-জিন তার ক্লিনিকে একটি গবেষণা চালিয়েছিলেন। তিনি চর্মরোগে আক্রান্ত একদল লোক বেছে নিলেন যাদেরকে তিনি মেডিটেশন চর্চা করতে বললেন। তারা মেডিকেল টিটমেন্টও গ্রহণ করছিল, পাশপাশি তারা মেডিটেশন চর্চাও করছিল। আবার আরেকদল লোক বেছে নিলেন যারা চর্মরোগে আক্রান্ত কিন্তু মেডিটেশন চর্চা করছে না, শুধুই মেডিকেল ট্রিটমেন্ট গ্রহণ করছে। কিছুদিন পর দেখা দেল যে, যারা মেডিটেশন চর্চা করত তাদের চর্মরোগ, খোস-পাচড়া তাড়াতাড়ি নিরাময় হল।

১১. অ্যাজমা রোগে ঃ

অ্যাজমা রোগীদের স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে বা ফেলতে ভীষণ কষ্ট হয়। কিন্তু ডঃ কাবাট-জিন তার গবেষণার আলোকে দেখেছেন যে, অ্যাজমা সহ শ্বাস-প্রশ্বাসের যে কোনও সমস্যায় আক্রান্ত রোগীরা যদি ব্রেথ মেডিটেশন (Breath Meditation) চর্চা করে তখন তাদের সমস্যা অনেকটাই সমাধান হয়ে যায়।

১২. বহুবিধ শরীরিক সমস্যার নিরাময়ে মেডিটেশনের ভূমিকা ঃ

সবারই শরীরে ছোট-খাট সমস্যা থেকেই থাকে। যেমন– অনেক মেয়েরাই মাসিকের আগে এবং মাসিকের সময়ে প্রচন্ড ব্যথায় কষ্ট পায়। মেডিটেশনের চর্চার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। অনেক মাথা ব্যথায় আক্রান্ত রোগীরা শুধু মেডিকেল ট্রিটমেন্ট গ্রহণ করে ক্লান্ত হয়ে যান, তারা মেডিটেশন চর্চা করে ইতিবাচক ফলাফল পেতে পারেন। পেটের বিভিন্ন সমস্যা যেমন– অজীর্ণ, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, আলসার ইত্যাদির ক্ষেত্রে মেডিটেশনের চর্চা অবশ্যই ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। অনিদ্রায় যারা ভুগছেন তারা মেডিটেশন চর্চা করে অভাবনীয় সুফল পেতে পারেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, আমাদের শারীরিক ও মানসিক সর্বোপরি একটি সুন্দর জীবন-যাপনের জন্য মেডিটেশনের ভূমিকা অপরিসীম। এছাড়াও মেডিটেশনের আরও দুটি নিরাময় ভূমিকার কথা আলোচনা না করলেই নয়, আর তা হচ্ছে–

১. হতাশা সমূলে উৎপাটন ঃ

যে কোনও কারণেই মানুষ হতাশাগ্রস্ত হতে পারে। আর যখন মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়ে যায় তখন মানুষ অসহায় বোধ করে, সবার কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরাতে চেষ্টা করে, সবকিছুতেই নিরাশা অনুভব করে। এভাবে মানুষ হতাশাগ্রস্ত থাকতে থাকতে ক্রমশঃ শারীরিকভাবেও অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর এ অবস্থায় মেডিটেশন আশার আলো দেখাতে পারে। কারণ এটা ভীষণভাবে পরীক্ষিত যে, মেডিটেশন মানুষকে আত্মপ্রত্যয়ী হতে সাহায্য করে। মানুষের আত্ম-বিশ্বাস বেড়ে যায় বহুগুণ। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ককেও পূর্ণরূপ দিতে সাহায্য করে মেডিটেশন। সুতরাং, হতাশাগ্রস্তদের জন্য মেডিটেশন হতে পারে বেঁচে থাকার দূর্লভ প্রেরণা।

২. জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে সাহায্য করা ঃ

ডঃ বরিসেনকো বলেছেন যে, মেডিটেশন মানুষের ভঙ্গুর স্মৃতিশক্তিকে পুনরায় জাগ্রত করতে সাহায্য করে। একসময় মানুষের মনে তার পূর্বের জীবনের সমস্ত দুঃখজনক স্মৃতি, কোনও তিক্ত অভিজ্ঞতা এগুলো মনে হয়ে যেতে পারে। আর তার পরিপ্রেক্ষিতে যা হয় মানুষ সেগুলোকে শুদ্ধ করতে চায়, নিজের ভূল-ভ্রান্তি শুধরে নিয়ে সুন্দর একটা

জীবন লাভ করতে চায়। আর মেডিটেশন এই স্মৃতিশক্তি জাগ্রত হওয়া থেকে শুiæ করে ভুল-Îæটি শুধরে নেয়ার ব্যাপারটিকে ত্বরান্বিত করতে থাকে। আর একটি ব্যাপার উjøখ না করলেই নয়, আর তা হচ্ছে মেডিটেশন ক্ষমা করতে শেখায়। আর ক্ষমা মহৎ গুণ। ক্ষমা স্বর্গীয়।

দ্যা ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের (The Insight Meditation Center) ফাউন্ডার ডেইজা ন্যাপিয়ার (Daeja Napier) বলেছেন, ***"মেডিটেশন মানুষকে অতীত এবং ভবিষ্যতের কোনও কিছুতে নাছোড়বান্দা হয়ে আচ্ছন্ন থাকা থেকে মুক্ত করে দেয়। সেই সাথে কিভাবে জীবনের প্রতিটি মূল্যবান মুহূর্তকে উপভোগ করবে সেই ব্যাপারে সহযোগিতা করে।"***

ডেইজা ন্যাপিয়ার আরও বলেছেন, "বেশির ভাগ নারীপুiæষই অনন্ত্ম চাওয়া, পাওয়ার প্রতি আশা-আকাংক্ষাকে ধরে রাখে। আর এতে যা হয়, এই ব্যাপারটি প্রতিমুহূর্তে আমরা যা পুরস্কার পেতাম তা গ্রহণ করতে বাধা প্রদান করে।"

আমরা প্রতিটি মানুষই যেভাবে বাস করি, আমাদের অবস্থান যেমনই হোক না কেন আমরা বাবা-মা, ভাই-বোনের ভালবাসা পাই। প্রিয় কিংবা প্রিয়ার ভালবাসায় সিক্ত হই, সহকর্মীদের সহযোগিতা পাই। গুiæজনরা স্নেহ করেন, ছোটরা শ্রদ্ধা করে, শিক্ষা গ্রহণ করি শিক্ষাগুiæর কাছ থেকে। সুতরাং কোনও অনাকাংক্ষিত কারণ ছাড়া আমাদের কোনও অপূর্ণতা থাকার কথা নয়। কিন্তু অভাব হচ্ছে আমাদের উন্নত মানসিকতার। মেডিটেশন একটি পূর্ণ, উন্নত মানসিক পদ্ধতি যা আমাদের চারপাশের সবকিছু, পরিবার, পরিজন, সমাজ সকল কিছু থেকে পূর্ণতা প্রাপ্তি গ্রহণের সুফলকে সহজলভ্য করে দেয়।

সুতরাং, এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি একজন মানুষ কিভাবে জীবনের প্রতিটি মূল্যবান মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হবে তার সঠিক দিক নির্দেশনা খুঁজে পাবে, সেক্ষেত্রে মেডিটেশনের কোনও বিকল্প নেই। আর লাইফ শাইনিং মেথড্ হতে পারে এক্ষেত্রে নতুন মাইল ফলক।

একটি পরিস্যখ্যান ঃ

১৯৮৭ সালে গবেষক ডাঃ ডেভিড ওরমে জনসন একটি ব্যাপক পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করেন। তার নিরীক্ষায় বের হয়ে আসে যে, যারা মেডিটেশন করেন, ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা তাদের তুলনামূলকভাবে অনেক কম। বয়স অনুপাতে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে যাওয়ার পরিমাণ হচ্ছে শিশু কিশোর (০-১৯ বছর পর্যন্ত্ম) ৪৬.৮ ভাগ কম। যুবক (১৯-৩৯ বছর) ৫৪.৭ ভাগ কম। বয়স্ক (৪০-এর উপরে) ৭৩.৭ভাগ কম। মেডিটেশন মনোদৈহিক স্বাস্থ্যের উপর কি প্রভাব ফেলে তার জন্য উপরোক্ত তথ্যাবলীই যথেষ্ট। অর্থাৎ একজন মধ্যবয়সী মেডিটেশনকারী যে সময়ে একবার ডাক্তারের শরনাপন্ন হবেন, ঠিক একই সময়ে যিনি মেডিটেশন করেন না, তিনি শরণাপন্ন হবেন চার বার। অর্থাৎ বয়স্করা মেডিটেশন থেকে বেশি উপকার লাভ করে থাকেন।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, সব ধরনের অসুখের চিকিৎসাই হয়ত ওষুধ বা মেডিকেল সাইন্সের অন্ত্মর্ভুক্ত কোন ট্রিটমেন্ট দ্বারা আমরা করি। কিন্ত্ম এমন কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি আছে যা সম্পূর্ণই নির্ভর করে আমাদের ইচ্ছাশক্তি বা বিশ্বাসের উপর। উদাহরণস্বরূপ, বলা যায় সাইকোথেরাপী কিংবা মেডিটেশন চর্চা। বিশেষ করে মেডিটেশন চর্চার ব্যাপারটি সম্পূর্ণই ভিন্ন। কারণ মেডিটেশন যে করছে, সেখানে তাকেই সম্পূর্ণ সাহায্যদাতার ভূমিকা পালন করতে হয়। অর্থাৎ মনকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে হয়। বিশ্বাস করতে হয় মনে প্রাণে যে, সব সুস্থ হয়ে যাবে বা তার সমস্যার সমাধান হবে। রোগী যদি মনকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করে সুস্থতার জন্য, ঔষুধ বা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট সে পাশাপাশি গ্রহণ করতে থাকে এত তার সুস্থতার ব্যাপারটি ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু যদি ব্যাপারটি হয় উল্টো। অর্থাৎ একজন প্রচুর ঔষুধ খেয়ে যাচ্ছে, অনেক ব্যয়বহুল মেডিকেল ট্রিটমেন্ট গ্রহণ করছে কিন্তু সে হতাশায় ভুগছে। ভাবছে তার রোগ কখনও নিরাময় হবে না। কিংবা তার মন যদি তার রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণই নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে তাহলে অনেক চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করেও কার্যকর ফলাফল আসবে না। সুতরাং মেডিটেশন একটি বিশেষ প্রভাষক। পরিশেষে বলা যায়, মেডিটেশন মানুষের ব্যক্তিত্ব উন্নত করে, ব্যক্তিত্বে স্থিরতা আনয়ন করে, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা আনে, দৃঢ় সঙ্কল্পতা আসতে থাকে, নম্র স্থায়ী

এবং স্থির মনোভাবসম্পন্ন হয়ে উঠতে থাকে, নিপুণতা বাড়ে কর্মতৎপরতা বাড়ে, উচ্ছল মনোভাব সম্পন্ন হয়। সত্যবাদিতা সহ অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার ব্যাপারও গড়ে উঠতে থাকে। সুতরাং রোগ নিরাময় ছাড়াও যদি একজন মানুষ শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে নিপুণতা অর্জন করতে চায় সেক্ষেত্রে লাইফ শাইনিং মেথডের সাহায্যে মেডিটেশন চর্চা হতে পারে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

মনছবি এবং মনছবির মাধ্যমে সফলতা আনয়ন

মনছবি কি এবং মনছবির প্রয়োগ সংক্রান্ত্ম বিষয় নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে এবং বর্তমানেও গবেষণা হচ্ছে।

মনছবিকে আমরা নিম্নোক্ত বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। যেমন−

মনছবি হচ্ছে সম্পূর্ণ একটি নিরাময় পদ্ধতি যা কল্পিত বা কল্পনায় ব্যবহৃত হয় অসুস্থ মানসিকতাকে শুদ্ধ করার জন্য, সুস্থ করার জন্য। এমনকি অনেক সময় শারীরিক অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্য মনছবি নিরাময়ের একটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্যও মনছবি ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে মনছবির ব্যাপারটি হচ্ছে− মনে মনে দৃশ্যমান থাকতে হবে সেই ছবিটি যা আমরা ভবিষ্যতে করতে চাই। কিংবা এমন কোনও সমস্যা হয়ত আমরা অতিক্রম করছি যার সমাধান আজই প্রয়োজন। তখন মানসপটে সেই ছবিটি ভাসতে হবে যে সমাধানটি আমরা খুব চাইছি। এর অর্থ হচ্ছে মানসপটে দৃশ্যমান ছবিটি আমাদের ব্রেইনে অনেকটা প্রোগামিং করে দেয়ার মত হতে হবে। ব্রেইনে প্রোগামি হয়ে থাকা ছবিটিকে তখন বাস্ত্মবে রূপ দেয়ার জন্য তখন ব্রেইনই দিক-নির্দেশনা দিতে শুiæ করবে। এভাবে একসময় আমরা আমাদের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারে।

তবে মনছবি দেখার ব্যাপারে নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলো বিশেষ গুiæত্বপূর্ণ। যেমন−

১. মনছবি দেখার প্রাক্কালে সবসময় চিন্ত্মা, ধারণা, কার্যপ্রণালী, অনুভূমি, উদ্দেশ্য, আচরণ, ব্যবহার বিধি ইত্যাদিতে ইতিবাচক প্রভাব বজায় রাখতে হবে।

২. নিজেকে সচল করতে হবে বাস্ত্মবসম্মতভাবে যাতে সফলতার সাথে কাজটি সম্পন্ন হয়।

৩. উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত্ম মনছবি দেখার প্রক্রিয়াটি চালিয়েই যেতে হবে বার বার।

৪. নিজের ইতিবাচক চিন্ত্মা-ভাবনার প্রতি বিশেষ গুiæত্ব আরোপ করতে হবে যেন ইতবাচক চিন্ত্মা-ভাবনা কখনই নেতিবাজক চিন্ত্মা-ভাবনাতে পরিণত না হতে পারে।

মনছবিকে আরও বোধগম্য করতে গেলে আরও বলা যায়−

মনছবি হচ্ছে নিজস্ব কিছু মানসিক চিন্ত্মার ইমেজ বা ছবির গঠনপ্রণালী কিংবা একটি সংগ্রহশালা যারা মাধ্যমে আমরা আমাদের আত্মরক্ষার জন্য দক্ষতা এবং যোগ্যতা অর্জন করতে পারব। প্রতিনিয়ত যখন আমরা আমাদের মনছবিতে সমস্যা অতিক্রমের ব্যাপারটিকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধ করতে করতে মানসপটে জয়ী হয়ে যাই, তখন এই মনের সফলতা বাস্ত্মবে পরিণত করার জন্য বাস্ত্মবেও আমরা যুদ্ধ করতে করতে একসময় সফল হতে পারব। মনছবি এভাবেই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, মনছবি আমাদের ব্রেইনের কার্যকারিতাকে বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ। তবে আরেকটি ব্যাপার গুiæত্বপূর্ণ আর তা হচ্ছে− যখন কেউ একজন মনছবি দেখবে তখন তার নিজের মনছবি সম্পর্কে, মনছবি দেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। যতটা সম্ভব মনছবিকে বাস্ত্মব অবস্থার প্রেক্ষাপটে সুদৃঢ় সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত। তাহলে সাফল্য আসতে সহজ হবে। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের চেষ্টা থাকবে যেন আমরা মনছবিকে সঠিকভাবে দেখতে পারি, অনুভব করতে পারি, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ এগুলোও অনুভব করতে পারি। কার্যকর মনছবি দেখার জন্য আমাদের নীরব, শান্ত্ম পরিবেশ প্রয়োজন যা সবধরনের বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে মুক্ত। এরকম একটি পরিবেশে সামনে রেখে। অন্ত্মত ২০ মিনিট কাল স্থায়ী মনছবি দেখব কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। এছাড়া বাস্ত্মবতার সাথে সঙ্গতি রক্ষার জন্য অনেক সময় মনছবিকে নিয়ন্ত্রণও করতে হয়।

কিভাবে মনছবি দেখার দক্ষতা বড়ানো সম্ভব ঃ

সাফল্যের প্রধান প্রভাবকই হচ্ছে-মনছবি। মনছবিকে সঠিকভাবে সফল করতে গেলে প্রয়োজন নিয়মিত চর্চা। হোক সেটা কোনও ক্লাসiæম সংক্রান্ত্ম ব্যাপার, কিংবা কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, কোনও ব্যক্তিগত কারণ বা কোনও সামাজিক কারণ ইত্যাদি। মনছবি দেখে সফর হওয়ার ব্যাপারটিও নির্ভর করে যে মানুষটি মনছবি দেখছে তার উপর। কারণ একই

ব্যাপার একজন মানুষ থেকে অন্য মানুষে ভিন্নরকম হতে পারে। মনছবি দেখার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা উচিত। যেমন–

১. মনছবি দেখতে হবে সম্পূর্ণ মন থেকে।

২. যতটা সম্ভব আমাদের মেধা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ইনি্দ্রয়কে কাজে লাগাতে হবে মনছবি দেখার ক্ষেত্রে। আমাদের অনুভূতিকে হতে হবে সৃজনশীল এবং শারীরিকভাবে যতটা সম্ভব উদ্দীপিত হতে হবে মনছবি দেখার ক্ষেত্রে।

৩. দিনে বা রাতের যে কোন সময়ে যখন আমাদের সুবিধা অর্থাৎ যখন আমরা ঘুম থেকে উঠি। কোনও কাজ শুiæ করতে চাই, কিংবা কোনও কাজ শেষ করার পর যে,– কোনও সময়ে করতে পারি। তবে সবসময়ই ঘুমের আগে কোনও উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে মনছবি দেখা উচিত।

৪. যে উদ্দেশ্যে আমরা মনছবি দেখব, সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য কি কি অবস্থার সম্মুখীন আমরা হতে পারি সেগুলো সম্পর্কেও মনছবি দেখতে হবে। এতে সাফলের গতি ত্বরান্বিত হবে।

৫. নিজের দক্ষতা যতটা সম্ভব প্রয়োগ করতে হবে যাতে মনছবি সুনিপুন হয় যতটা সম্ভব উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে।

৬. মনছবি দেখার প্রক্রিয়াটা বার বার করতে হবে। দুই একবার কিংবা দুই একদিন মনছবি দেখার পরই যে আমরা সফল হব তা নয়। এমন মনোভাবও পোষণ করা ঠিক নয় যে, যেহেতু সফলতা আসল না, তাই মনছবি দেখা বন্ধ করে দিব বরং দৃঢ় মনোভাব নিয়ে যতদিন পর্যন্ত্ম না সফলতা আসবে ততদিন পর্যন্ত্ম মনছবি দেখার চর্চা চালিয়ে যেতে হবে।

মনছবি দেখে যারা সফল হয়েছেন ঃ

ইতিহাসে যত সফল ব্যক্তিত্ব আমরা দেখি প্রত্যেকরই সাফল্যের পিছনে রয়েছে মনছবি। যেমন–

রাইট ভাতৃদ্বয় মনছবি দেখতেন যে তারা এমন এক যানবাহন নির্মাণ করবেন, যা আকাশে উড়বে। সবাই তাদেরকে পাগল আখ্যা দিয়েছিল। কিন্তু তারা নীরবে নিজেদের কাজ করে যেতে লাগলেন। একসময় তারা সফল হলেন। বিমান আকাশে উড়ল। সভ্যতার জগতে ঘটে গেল বিস্ময়কর অভাবনীয় বিপ্লব।

বোম্বের কিংবদন্ত্মীর নায়ক দিলীপ কুমার একসময় মনছবি দেখতেন চলচ্চিত্রের নায়ক হবেন বলে, ছিলেন পেশোয়ারে ফল বিক্রেতা। মনছবি সফল হল। পেশোয়ারের ফল বিক্রতা ইউসুফ হয়ে গেল ভারতীয় উপমহাদেশের চিরস্মরণীয় কিংবদন্ত্মীর নায়ক দিলীপ কুমার।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ ১৯৭৫ সালে মনছবি দেখলেন যে ২০ বছরের মধ্যে গড়ে তুলবেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবন। অথচ সেখানে সে সময় ৫০ বছরের পুরনো কোনও ভবন ছিল না। কিন্তু মনছবি একসময় বাস্ত্মবে পরিণত হল। ১৯৯৫ সালে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবন নির্মিত হল মালয়েশিয়া কুয়ালালামপুরে। কৃষিপ্রধান মালয়েশিয়া রূপান্ত্মরিত হল শিল্পপ্রধান দেশে। মনছবি নেলসন ম্যান্ডেলাকে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট করেছিল। তিনি ২৯ বছর শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদীদের কারাগারে বন্দী ছিলেন। যেখানে অতি নির্জন সেলে তাকে রাখা হয়েছিল। যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছাতে পারত না। কারাগারে থেকে মুক্তির পর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তিনি কারাগারে কি করতেন। তিনি বলেছিলেন তিনি সবসময় মনছবি দেখতেন মুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার। যেখানে কৃষ্ণাঙ্গরা তার নেতৃত্বে দেশ শাসন করছে। নেলসন ম্যান্ডেলার মনছবি সফল হয়েছিল। তিনিই হন মুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট।

এছাড়া ইতিহাস খুঁজলে আমরা এরকম আরও সফল ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাব যাদের সাফল্যের মক্তিশালী প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে মনছবি।

মনছবি সংক্রান্ত্ম ভুল ধারণা ঃ

অনেকেই ভেবে থাকেন যে, মনছবি দেখার ক্ষেত্রে সফল হবেন একমাত্র দরবেশ, সাধক, মুণি, ঋষি এরাই। কিংবা এও অনেকে ভাবেন যে, মনছবি দেখে সফর হতে হলে সুপার ন্যাচারাল পাওয়ারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এগুলো সম্পূর্ণই ভুল ধারণা। সঠিকভাবে ধৈর্য ধারণ করে নিয়মিত মনছবি দেখার চর্চা করতে থাকলে যে কোনও সাধারণ মানুষই সফল হতে পারেন।

মনছবির প্রয়োগ ঃ

মনছবির প্রয়োগ আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রেই করতে পারি। যেমন– শিক্ষাজীবনে এর সফল প্রয়োগ হতে পারে। একজন ছাত্র/ছাত্রী হয়তো মনছবি দেখতে লাগল। সে ক্লাসে সবচেয়ে ভাল রেজাল্ট করবে। এভাবে দেখতে থাকলে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে গেলে অবশ্যই সাফল্য আসবে। কেউ ব্যবসা ক্ষেত্রে সফল হতে চাইলে উদ্দেশ্য অনুযায়ী মনছবি দেখতে শুiæ করলে ব্যবসা ক্ষেত্রে সাফল্য অবশ্যই আসবে। কেউ একজন বিখ্যাত দক্ষ সঙ্গীতও হতে চাইলে সেও মনছবি দেখে সফল হতে পারে। কেউ একজন সুস্থ সুন দর জীবন যাপন করতে আগ্রহী। সুস্থতার জন্য সুস্থ দেহ এবং মন বিশেষ জাiæরী। এখানেও মনছবি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। স্মরণীয়, বরণীয় রাজনীতিবিদ হতে চাইলেও মনছবি দেখে উদ্দেশ্যকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

সুতরাং ক্ষেত্র যাই হোক না কেন মনছবি সঠিকভাবে প্রয়োগ করাই হচ্ছে মূলকথা। পরিশেষে মনছবি সম্পর্কে একটি কথা বলা বিশেষ জাiæরী। আর তা হচ্ছে বিশ্বাস। কারণ যে উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার জন্য কেউ একজন মনছবি দেখবে তার সাথে যদি শতকরা ১০০ ভাগ বিশ্বাস না থাকে তাহলে সফলতার আশা দুরাশাই মাত্র। নিজেকে আত্মিকভাবে, মানসিকভাবে মনছবির উদ্দেশ্যের সাথে একীভূত করে ফেলতে হবে। এভাবে চর্চা চালিয়ে গেলে একসময় মনছবিই বাস্তব হয়ে ধরা দেবে আমাদের জীবনে।

মেডিটেশন (মনছবি)

জীবনে সফল হতে হলে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন মনছবি। অর্থাৎ যে লক্ষ্য আপনি অর্জন করতে চান সে সম্পর্কে সুষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধারণা এবং বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে। লক্ষ্যের সাথে নিজেকে পুরোপুরি একাত্ম করতে হবে। অন্তরে লক্ষ্যকে সবসময় প্রজ্বলিত রাখতে হবে। আপনার সমগ্র কল্পনা, চিন্তা ও অনুভূতিকে লক্ষ্যের সাথে একাত্ম ও সাফল্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। আপনি অনুভূতিকে অক্ষ্যের সাথে একাত্ম ও সাফল্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। আপনি শুনে হয়ত অবাক হবেন সত্য কথা হচ্ছে আমাদের কল্পনা আর ইচ্ছার মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হলে ইচ্ছা পরাজিত হয়, জয় হয় কল্পনার। আমরা অনেক কিছু করতে দৃঢ় ইচ্ছা বা জোরালো প্রতিজ্ঞা করেও তা রাখতে পারি না। এটা হয় প্রধানত কল্পনা শক্তির সাথে দ্বন্দ্বের কারণে। আপনি হয়ত ভাবছেন ডায়েটিং করে দুই কেজি ওজন কমাবেন। দুই কেজি কমানোর পর দেখা গেছে খাওয়ার কারণে ৩ কেজি বাড়িয়ে ফেলেছেন। ইচ্ছার সাথে যুদ্ধ করে প্রতিজ্ঞা করেছেন জীবনে আর কখনও হঠাৎ রেগে যাবেন না। কিন্তু দেখা গেল প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই রয়ে গেছে। এবার শুধু রাগারাগিই নয়, হাত কাটা থেকে শুiæ করে অনেক কিছু ভেঙ্গেও ফেলেছেন। এ ধরণের জীবনের বহু ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে ব্যর্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে কল্পনা বা মনছবিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা। অথচ মনছবিকে ব্যবহার করে একাজগুলি ছাড়াও যে কোনও কঠিন কাজ সম্পন্ন করা যায়।

মনে কiæণ, আপনি বেকার। যোগ্যতা আছে কিন্তু চাকরি পাচ্ছেন না। ইন্টারভিউ বোর্ডে গেলেই আপনি নার্ভাস ফিল করছেন। অনেক প্রশ্নের উত্তর জানা সত্ত্বেও সঠিকভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন না। এবার আপনি আপনার নিয়ম মাফিক চোখ বন্ধ কiæন এবং আরাম আরাম আরাম বলে আপনার আলফা ড্রই iæমের চেয়ারে এসে বসুন। এবার দক্ষিণ দেয়ালে আপনি যে সাদা পর্দা স্থাপন করেছিলেন সেখানে মনছবি দেখুন; খুটিনাটিসহ পরিপূর্ণ দৃশ্য তুলে ধiæণ আপনার এই আলফা পর্দায়। একবারে ভিডিও ছবির মত। দেখুন ইন্টারভিউ বোর্ডে সবাই যে যার জায়গায় বসে আছে। আপনি আপনার পছন্দমত সুন্দর পোষাক পরে স্মার্টভাবে তাদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন। আপনি সালাম দিলেন। উনারা সালাম নিলেন। কুশল বিনিময় হল। কি আশ্চর্য। সবার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিচ্ছেন আপনি। কোন ভয় বা জড়তাই নেই আপনার মধ্যে। বোর্ডের কর্মকর্তারা আপনার ব্যবহার ও উত্তর শুনে একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলাবলি করলেন এবং আপনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন। চাকরি হয়ে গেল আপনার। এবার আপনার জন্যে নির্ধারিত চেয়ার টেবিলে গিয়ে আপনি বসেছেন। নির্ধারিত কাজ বুঝে নিচ্ছেন। পরিপূর্ণ তৃপ্তির সাথে কাজ করতে শুiæ করেছেন। পুরো ছবিটা আপনাকে সকল ইন্দ্রিয় যোগে অনুভব করতে হবে। বাস্তবে চাকরি পেলে আপনার যে অনুভূতি হত মনছবি দেখার সময় সেই অনুভূতি নিজের মধ্যে পুরোপুরিভাবে নিয়ে আসতে হবে। ঠিক তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি, ব্যবসায় উন্নতি লাভ, বিক্রি বৃদ্ধি, উপার্জন, অপব্যয়, চাকরি, মামলা, ব্যক্তি ইমেজ বাড়ানো, বিদেশে যাত্রায় ভিসা লাভ, স্বামী স্ত্রীর অমিল, সন্তান লাভ, মিল কারখানা বন্ধ, ভাইয়ে ভাইয়ে অমিল, ছিল বন্ধ হয়েছে শÎæ, নেতৃত্ব, হতাশা ব্যর্থতা, দুরারোগ্য ব্যাধি, মানসিক অস্থিরতা, পরকীয়া বিচ্ছেদসহ অন্যের ক্ষতি কল্পনা ছাড়া যে কোনও মনছবি আপনি করতে পারবেন।

যখনই সময় পান বেশি বেশি করে মনছবি কiæন। ভাবছেন আপনার মনছবি হচ্ছে না কিংবা পাছেন না। সেভাবনা আপনার নয় আমার। আপনি মনছবি করার ভান কiæন। এক সময় সেটা পরিণত হবে।

ধ্যান এবং ব্রেইনের সচেতনতা

আমাদের শরীর অর্থাৎ মানবদেহ বিভিন্ন অণুপরমাণুর সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি সমষ্টি যা অনুভব করে একটি অভ্যন্তরস্থ শক্তি বা এনার্জি। এই এনার্জিকে আমরা বলতে পারি অন্তঃস্থ শক্তি স্পষ্ট বাহ্যিক প্রকাশ। রঙধনুতে সাতটি রঙ যেমন ঘূর্ণায়মান শক্তির মাঝে কেন্দ্রীয়ভূত থাকে যাকে বলে চক্র; তেমনি মানুষের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত এনার্জি কেন্দ্রীভূত থাকে প্রত্যেকটি মানুষের অভ্যন্তরেই যাকে বলা হয় "আরা"। আর "আরা" হচ্ছে একটি মানুষের অন্তঃস্থ শক্তির সর্বাধিক বাহ্যিক প্রকাশ। আর মেডিটেশন বা ধ্যান হচ্ছে শরীরকে শিথিলায়নের চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, মনকে স্থির করা এবং তৎসঙ্গে অন্তঃস্থ শক্তির সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা। এছাড়া ধ্যানাবস্থা হচ্ছে মনকে নিয়ন্ত্রণের একটি সঠিক উপায়। কারণ এই মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একজন সাধারণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে আসাধারণ। মনকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এই পৃথিবীতে সাধক, দরবেশ সহ বিজ্ঞানী, লেখক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ অমরত্ব লাভ করেছেন। আবার মনকে নিয়ন্ত্রণ না করে একজন মানুষ জীবনে সমস্ত নেতিবাচক কাজে শক্তির অপচয় করে জীবনকে হয়ত ব্যর্থই করেছেন। সুতরাং মেডিটেশনের মাধ্যমে ধ্যানাবস্থা হচ্ছে আর্শীবাদপূর্ণ পৃথিবীর প্রবেশদ্বার। কেন মানুষ ধ্যানাবস্থা লাভ করতে চায় তাঁর উত্তর বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে খুঁজতে যাওয়াটা কঠিন কিছু নয়। কারণ বর্তমান পৃথিবীতে আমরা দেখি সর্বত্রই শুধু নেতিবাচক ঘটনার ছড়াছড়ি। যত যুদ্ধ-বিগ্রহ, পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ, মানুষের সাথে মানুষের বিবাদ সবকিছুই এই পৃথিবীকে যেমন করছে সংঘাতময় তেমনি মানুষের মধ্যে থেকে বিতাড়িত হচ্ছে সব মানবীয় গুণাবলীসমূহ। আর ভবিষ্যত প্রজন্ম এই নেতিবাচক ঘটানাগুলোর বিরূপ প্রভাব থেকে কিছুতেই মুক্ত নয়। তাই মন নিয়ন্ত্রণ করে কিভাবে মনের শক্তিকে কাজে লাগানো যায়, কিভাবে মনের শক্তিকে আরও বাড়ানো যায় এই ব্যাপারটি বর্তমানে বেশি গুiæত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বে মেডিটেশনের প্রসার ঘটছে বিভিন্ন কারণে। শিথিলায়ণ যেমন- মনের জন্য জাiæরী তেমনি শরীরের জন্যও খুবই জাiæরী। রাগ, ক্রোধ, ঘৃণা, ক্ষোভ, টেনশন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, স্ট্রেস বা মানসিক চাপ এগুলোও প্রশমিত হয় যখন আমাদের শরীর ও মন শিথিলায়নের চরম পর্যায়ে অবস্থান করে।

সুতরাং মেডিটেশনকে বলা যায় একটি ডিসিcøন (শৃঙ্খলা) যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মনের শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়।

চারিত্রিক ও মানবীয় গুণাবলীয় বিকাশ ঃ

একজন মানুষ জন্মগতভাবে চারিত্রিক ও মানবীয় গুণাবলী সম্পন্নই হয়। একজন প্রতিভাবান মানুষ এবং সফল মানুষ তাকেই বলা যায় যিনি মনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে, ব্রেনের দিক নির্দেশনার সাথে মনের শক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে নিজস্ব চারিত্রিক ও মানবীয় গুণাবলীয় সঠিক বিকাশ ঘটাতে সমর্থ হন। পক্ষান্তরে অনেকে মনের শক্তির সঠিক ব্যবহার না করে নিজস্ব প্রতিভার অপচয়ই করেন। তাই শুধু জন্মগতভাবে প্রতিভা সমন্ন হলেই হয় না তার বিকাশের জন্য প্রয়োজন মনের শক্তির সাথে ব্রেইনের সঠিক দিক-নির্দেশনা এবং সচেতনতার সঠিক সমন্বয়।

ব্রেইনের সচেতনতার পরিমাপ ঃ

ব্রেইনের সচেতনতাকে ব্যাখা করা সংক্রান্ত প্রায় শত শত থিউরী রয়েছে। তারপরও মডার্ন সাইন্স বর্তমানে ব্রেইনের সচেতনতাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রচুর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। মেডিকেল সাইন্স অনুসারে বলা যায় যে, ব্রেইনের কার্যকারিতা সংক্রান্ত ফলাফল থেকে ব্রেইনের সচেতনতার পরিমাপ করা যায়। কারণ আমাদের মনের কাজগুলোকে করে দেয় আমাদের ব্রেইন। সক্রিয় অবস্থায় ব্রেইন থেকে প্রতিনিয়ত খুব মৃদু বিদ্যুৎ তরঙ্গ বিকিরিত হয়। বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন, ব্রেইন ওয়েভ (Brain Wave)- ১৯২৯ সালে ডাঃ হ্যান্স বার্জার ইলেকট্রোএন সেফোলোগ্রাম (Electroen Cephalogram) (ইইজি) (EEG) যন্ত্র দ্বারা এই ব্রেইন ওয়েভ মাপেন।

কার্যকারিতা অনুযায়ী ব্রেইন ওয়েবের কার্যকারিতা অনুযায়ী মোট চারটি লেভেল রয়েছে। গ্রীক অক্ষার অনুযায়ী সেগুলোর নাম হচ্ছে-

(১) বিটা (β) লেভেল।

(২) আলফা (∞) লেভেল।

(৩) থিটা (ø) লেভেল।

(৪) ডেলটা (§) লেভেল।

ইইজি যন্ত্র এই চারটি ব্রেন ওয়েভ লেভেলের কার্যাকারিতা পরিমাপ করে।

১। বিটা লেভেল ঃ

বিটা লেভেল আমাদের স্বাভাবিক জাগতিক সচেতনতাকে ব্যাখা করে। বিটা লেভেলের শতকরা ৭৫ ভাগ জাগতিক দ্বারা আমাদের সমস্ত্ম শারীরবৃত্তীয় কার্যকারী সম্পাদিত হয়। আর বিটা লেভেলের বাঁকি শতকরা ২৫ ভাগ জাগতিক সচেতনতা মনের চিন্ত্মাশীলতা, পরিকল্পনা প্রণয়ণ এগুলো সম্পাদিত করে। বিটা ব্রেইন ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে ১৪ সাইকেল থেকে ২৭ সাইকেল পর্যন্ত্ম। তবে মানুষ যখন খুব ক্রোধে, রাগে, ক্ষোভে উত্তেজিত হয়ে যায় তখন ব্রেইন ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে প্রতি সেকেন্ডে ২৭ সাইকেলেরও বেশি হয়ে যায়। এটাকে বলে গামা লেভেল। তবে এই গামা লেবেলে স্বাভাবিক অবস্থা নয়।

২। আলফা লেভেল ঃ

ব্রেইন ওয়েভের আলফা লেভেলকে বলা হয় ব্রেইনের বিশ্রামস্থান। আবার এটাকে অসাড়, জড় কিংবা অক্রিয় স্থানও বলা যেতে পারে। কারণ মানুষ এখানে জটিলধর্মী আচরণ করে না এবং মানুষ এই স্থানে বিckøষণধর্মী আচরণও প্রকাশ করে না। আলফা লেভেলে উদ্দীপনা, উত্তেজনা ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারে। আলফা লেভেলে অতীনিদ্রয়বাদ স্যক্রান্ত্ম ঘটনাবলী ঘটে থাকে। সাধারণত দেখা যায় ঘুমের আগে এবং পরে এই ব্যাপারগুলো বেশি ঘটছে। এছাড়া আলফা লেভেল বা মেডিটেশনে অনেক সময় হালকা সম্মোহিত অবস্থায়, স্বত-প্রবৃত্ত হয়েও ঘটে থাকে। আলফা লেভেলে ব্রেইন ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সী প্রতি সেকেন্ডে ৮ সাইকেল থেকে ১৩ সাইকেল পর্যন্ত্ম। তবে ভাবাবেগ, কোন ধরনের ক্ষোভ সৃষ্টি হলে এই লেভেল বাধাগ্রস্ত্ম হয়।

৩। থিটা লেভেল ঃ

থিটা লেভেল হচ্ছে ভাবাবেশপূর্ণ একটি অবস্থা যেখানে কল্পনা, অনুভূতি, ইচ্ছা এগুলো স্বতঃপ্রবৃত্ত অবস্থায় থাকে। তবে এই লেভেলের উপস্থিতি ঘটে। অর্থাৎ ঠিক গভীর ঘুমের পূর্বাবস্থা। এই লেভেলে কেউ যখন থাকে তখন সে তার চারপাশের জগত সম্পর্কে অসচেতন হয়ে যায়। এই লেভেলের ব্রেইন ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সী প্রতি সেকেন্ডে ৪ সাইকেল থেকে ৮ সাইকেল পর্যন্ত্ম। সাধকরা মেডিটেশন কালে আলফা থেকে থিটা স্ত্মরে প্রবেশ করেই মহা চৈতন্যের সাথে যোগযোগ স্থাপন করেন। প্রকৃত পক্ষে থিটা লেভেল হচ্ছে উচ্চস্ত্মরের সৃজনশীলতা ও সচেতনতার স্ত্মর।

৪। ডেল্টা লেভেল ঃ

ডেল্টা লেভেল একেবারে গভীর নিদ্রা অবস্থায় ঘটে। এ স্ত্মরে ব্রেইনের কার্যকারিতা একবারে কমে যায়। যখন কেউ একজন ডেল্টা লেভেলে অবস্থান করে তখন সে যে-কোন ধরনের উদ্দীপনা, উত্তেজনা গ্রহণ করতে অসমর্থ থাকে। তবে দরবেশ, সাধাকগণ এই স্ত্মরেও সজাগ থাকতে পারেন কিংবা অচেতনও হয়ে যেতে পারেন। ডেল্টা লেভেলে ব্রেইন ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সী প্রতি সেকেন্ড ০.৫ সাইকেল থেকে ৩ সাইকেল পর্যন্ত্ম।

ব্রেইন ওয়েভের কার্যকারিতা অনুযায়ী মোট চারটি লেভেল সংক্রান্ত ছক ঃ

ব্রেইন ওয়েভের কার্যকারিতা সংক্রান্ত লেভেলের নাম	*ব্রেইন ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সী*	*বৈশিষ্ট্য*
বিটা	১৪-২৭ সাইকেল	# সচেতনতা # মনোযোগ # কেন্দ্রীভূত মনোযোগ # বোধশক্তি এবং ধারণা শক্তি।
আলফা	৮-১৩ সাইকেল	# শিথিলায়ন # অন্তর্দৃষ্টি দৃষ্টিগোচর করা # সৃষ্টিশীলতা/সৃজনশীলতা।
থিটা	৪- ৮ সাইকেল	# স্বতঃলব্ধ জ্ঞান # স্মৃতিশক্তি # প্রাণবন্ত দৃষ্টিলব্ধ কল্পনাশক্তি।
ডেল্টা	০.৫- ৩ সাইকেল	# গভীর নিদ্রা # নিরাময় # সচেতন অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বন্ধ।

এইনসাইল মিয়ারস (Ainsile Meares) নামক একজন সাইকিয়াট্রিস্ট ৩০ বছর ধরে সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন এবং তাঁর রোগীদের চিকিৎসার জন্য মেডিটেশনকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে যেসমস্ত রোগীদের মানসিক এবং স্নায়ুবিক রোগ ছিল। তিনি ১৯৮৬ সালে মারা যান। কিন্তু তিনি তাঁর বিভিন্ন বইয়ে মেডিটেশন বা ধ্যানবস্থা সম্পর্কে অনেক বক্তব্য বা তথ্য প্রদান করেছেন। যেমন– তিনি মেডিটেশন সম্পর্কে বলেছেন, "কেউ একজন প্রশ্ন করতে পারে যে প্রতিদিন কিছু সময় ধরে মেডিটেশন করার উদ্দেশ্য কি এর উত্তর হচ্ছে মেডিটেশন বা ধ্যান আমাদের উদ্বিগ্নতা, টেনশন, স্ট্রেসকে দূরীভূত করে। এছাড়া মেডিটেশনের প্রভাবের মধ্যে রয়েছে অন্তঃস্থ শান্তি আনয়ন, আত্মার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ স্থাপন, পরিষ্কার চিন্তা-ভাবনা, কাজ করার উদ্যম ও শক্তি বৃদ্ধি, স্ট্রেস বা চাপ থেকে মুক্তি, সেক্সুয়াল ব্যাপারটিকে সঠিকভাবে উপভোগ ইত্যাদি। কিন্তু মেডিটেশন বা ধ্যান তখনই সঠিকভাবে কার্যকর হবে যখন আমাদের ব্রেইন সঠিকমাত্রায় ক্রিয়াশীল থাকবে। আমাদের ব্রেইন কাজ করে ব্রেইন ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সী অনুযায়ী।

যখন আমাদের ব্রেইন আলফা লেভেলে থাকে তখন আমরা শিথিল হই, শান্ত হই, স্থির হই, আমাদের অর্ধসংবেদী স্নায়ুতন্ত্র উদ্দীপিত হয়। আমাদের সমস্ত শরীর আলফা লেভেলে শিথিলায়ণের চরম আনন্দ উপভোগ করে। রক্তপ্রবাহী নালীগুলো সমস্ত শরীরে রক্ত ছড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ আলফা লেভেলে শিথিলায়ণের চরম অবস্থার অভিজ্ঞাতা একজনকে উৎকৃষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন স্বাস্থ্যকর দেহ-মন পেতে সাহায্য করে। এছাড়া আলফা লেভেল একজনকে মনছবি দেখতে সাহায্য করে। আত্মিক নিরাময়ের ক্ষেত্রে কিংবা আত্মশুদ্ধির জন্যও আলফা লেভেলের গুiæত্ব অপরিসীম। তবে একজন মানুষকে সম্পূর্ণ ধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হতে হলে তার ব্রেইন ওয়েবের কার্যকারিতা অনুযায়ী লেভেলগুলো সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

আমরা আশা করব, ***লাইফ শাইনিং মেথড্***-এর সাহায্যে পাঠক মেডিটেশন চর্চা করে সঠিক ধ্যানাবস্থা অর্জন করবেন। সেই সেঙ্গে ব্রেইন ওয়েবের কার্যকারিতা অনুযায়ী চারটি লেভেলের কার্যকারিতা সম্পর্কে জেনে ব্রেইনের দিক নির্দের্শনা সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে একটি সুস্থ সুন্দর দেহ-মন এবং প্রশান্ত পার্থিব জীবন লাভ করবেন।

নেতিবাচক কথাবর্তা, চিন্তা এবং ভয়

যেসব গুণ মানুষকে মহৎ, পুণ্যবান ও আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে তাদের মধ্যে চিন্তাশীলতার গুiæত্ব সর্বাধিক। মানবিক গুণাবলী সমৃদ্ধ যথার্থ মনুষ্যত্বের অধিকারীরূপে নিজেকে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য সারা জীবন বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষকে নানা গুণের নিরলস চর্চা করতে হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে চিন্তাশীলতা একটি বিশেষ প্রভাবক। কিন্তু সেই চিন্তা যেন অবশ্যই ইতবাচক হয়। যে কোন বিষয়েই কখনই কোনও নেতিবাচক অর্থাৎ নাবোধক কথাবার্তা বলা ঠিক নয়।

নেতিবাচক কথা এবং চিন্তার প্রভাবসমূহ ঃ

১. শিক্ষাজীবনে প্রভাব ঃ

নেতিবাচক কথা এবং চিন্তার কারণে একজনের শিক্ষাজীবন সম্পূর্ণই বাঁধাগ্রস্ত হতে পারে। উদাহারণস্বরূপ, বলা যায় কাউকে তার বাবা-মা পরীক্ষায় খারাপ করার জন্য নেতিবাচক কোনও কথাবার্তা বলে যদি বকাঝকা করে যেমন– “তোর দ্বারা আর পড়াশোনা সম্ভব না”, “তোর দ্বারা ভাল কিছু সম্ভব না” ইত্যাদি। এর ফলে দেখা যাবে সন্তান উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। সত্যিই তার জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

লাইফ শাইনিং মেথডের সফল উদ্ভাবক এবং প্রশিক্ষক হিসাবে আমি “জীবন চৌধুরী” আমার কাছে আসা বহু তiæণ-তiæণীর ব্যর্থ জীবনের কেসস্টাডি গবেষণা করে দেখেছি তাদের বাবা-মা, পরিবার-পরিজনরা তাদের বুঝতে ভুল করেছেন। তাদেরকে সবসময় নেতিবাচক কথাবর্তা যেমন– “অপদার্থ”, “অকর্মণ্য”, “অলস”, “মাথা-মোটা” এসব দ্বারা তিরস্কার করেছেন। ফলkÖæতিতে এদের জীবন কখনও সফলতার মুখ দেখেনি।

২. দৈহিক প্রভাব ঃ

নেতিবাচক কথাবার্তা এবং চিন্তার দৈহিক প্রভাব বলে শেষ করা যাবে না। যেমন– অনেকেই ভাবে যে মিষ্টি বেশি খেলে ডায়াবেটিস হয়। বৃষ্টিতে ভিজলে সর্দি-কাশি হয়। বেশি টক খেলে গলার স্বর নষ্ট হয়ে যায়। বেশি টক খেলে বুদ্ধি কমে যায়। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে কোমর ধরে যায়। চুলার পাশে দাঁড়ালে বা রোদে হাঁটলে মাথা-ব্যথা হয়, বেশি কাজ করলে শরীর অসুস্থ হয়। কিন্তু এগুলো সবই নেতিবাচক কথা এবং চিন্তা। এসব কথাগুলোকেই যদি কেউ ব্রেইনে প্রোগাম করে নেয় তাহলে অবশ্যই এসব নেতিবাচক কথাবর্তার ফলাফলই ঘটতে থাকবে তার জীবনে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব নেতিবাচক কথাবর্তার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই।

৩. পেশাগত জীবনে প্রভাব ঃ

পেশাগত জীবনে প্রবেশ করেই যদি কেউ ভাবে যে তার বস তাকে দেখতে পারছে না। সে ভাল কাজ দেখাতে পাছে না। সে এই পেশাতে সুখী নয়। এসব ভাবতে ভাবতে একসময় সত্যি সত্যিই দেখা যাবে বাস্তবে যে, সে এই পেশাতে সুখী নয়। তার বস তাকে সহ্য করতে পারছে না। সে সত্যিকার অর্থে ভাল দক্ষতা দেখাতে পারছে না। নেতিবাচক কথা এবং চিন্তা একজনকে পেশাজীবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিতে পারে।

৪. দাম্পত্য জীবনে প্রভাব ঃ

দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করার পূর্বেই কোন মেয়ে যদি ভাবতে থাকে তার স্বামীর সাথে তার বনিবনা হবে না। শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে দেখতে পারছে না। কিংবা কোনও ছেলে যদি ভাবে তার হবু বধূ তার মনমত হবে না। বাস্তবে একসময় তাই হতে থাকবে।

বহু কেসস্টাডি গবেষণা করে দেখা গেছে যে, প্রকৃত ঘটনা যাই হোক না কেন নেতিবাচক চিন্তা ভাবনাও কম দায়ী নয় তার জন্য।

৫. নানাবিধ প্রভাব ঃ

এছাড়াও কেউ যদি ভাবে যে, পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশীরা কেউ তাকে দেখতে পারে না। কিংবা কেউ ভাবে যে, সে ধনী হতে পাবে না। কিংবা এই সমাজে তার কোনও মূল্য নেই। এই সমাজে তার কোনও ভূমিকা নেই। এরকম ভাবতে ভাবতে একসময় এসমস্ত্ম নেতিবাচক কথা বার্তার ফলাফলগুলোই কারও জীবনে বাস্ত্মব হয়ে উঠতে থাকবে।

নেতিবাচক কথা এবং চিন্ত্মা থেকে মুক্তি ঃ

নেতিবাচক কথা, চিন্ত্মা এবং এগুলোর প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে গেলে প্রথমে নিজেই নিজেকে সচেতন করতে হবে। ইতিবাচক চিন্ত্মাদ্বারা মনকে পরিপূর্ণ করতে হবে। সবকিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা নিজের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। এছাড়া সঙ্গদোষের একটা বিশাল প্রভাব রয়েছে আমরা তা জানি। সেজন্য যেসব মানুষেরা ইতিবাচক চিন্ত্মা-ভাবনা করেন তাদের সাহচর্য লাভ করতে পারলেও অনেকখানি উপকৃত হওয়া যাবে।

সর্বোপরি জীবনকে সুন্দর, সার্থক ও মহৎ করার জন্য সবকিছুর পাশপাশি নিজেরে মধ্যে সহিষ্ণুতা প্রয়োজন। জীবনে চলার পথে সংকটের মুখোমুখি হয়ে মানুষ যদি ধৈর্যহারা হয়ে নেতিবাচক কথা এবং চিন্ত্মা দ্বারা সেই সংকটকেই ত্বরান্বিত করে তাহলে এই মানবজীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কেননা, জীবনের কল্যাণের জন্য নেতিবাচক চিন্ত্মা পরিহার করে ইতিবাচক চিন্ত্মাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এছাড়া সৃষ্টির শুiæ থেকে জীবনকে সুন্দর ও সফল করার যে সাধনায় মানুষ নিজেকে সমর্পণ করেছে তা সফল করার জন্য ইতিবাচক কথা এবং চিন্ত্মার কোনই বিকল্প নেই।

ভয় ঃ

মানুষ সৃষ্টির আদিকাল থেকেই সংগ্রামী। সৃষ্টির প্রথম থেকেই প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে চিরদিন সংগ্রাম করে মানুষকে সামনে এগিয়ে যেতে হয়েছে। মানুষের সামনে থাকে অনেক বাঁধা-বিপত্তি। চারদিকে হিংসার উন্মত্ততা, কুটিল ষড়যন্ত্র, ভয় ও আক্রোশ-সবই মানুষকে মোকাবিলা করতে হয় প্রবল শক্তিতে, পরম আত্মবিশ্বাসে। নির্ভয়ে আত্মশক্তিতে সকল বাধা জয় করারই আত্মবিশ্বাসী মানুষের বৈশিষ্ট্য। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে তাই ভয় নয়, সাহসই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মূলধন। কারণ সাহসী মানুষ জানে যে, জীবনে ভয়কে যদি প্রাধান্য দেয়া হয় তাহলে মানুষের সকল গুনের বিকাশ ব্যাহত হয়। সেই সঙ্গে জীবন অর্থহীন হয়ে যায়। ভয় মানুষের ভয়াবহ শÎæ। ভয় মানুষকে মৃত্যুর আগে অনেকবার মেরে ফেলে। সুতরাং জীবনে অগ্রসর হতে গেলে এই ভয়কে করতে হবে জয়। ভয় নানা কারণে মানুষ পেতে পারে। তার আগে ভয় কি বা ভয়ের স্বরূপ আমাদের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ভয়, একটি সম্পূর্ণ অশুভ জিনিস। জীবন, প্রাণ, উচ্ছ্বস, আবেগ, ভালবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, শান্তি্ম ইত্যাদির সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ব্যাপার হচ্ছে ভয়। ভয় হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম শÎæ এবং যারা আতঙ্কগ্রস্ত্ম তাদের জন্য বড় এক হাতিয়ার। ভয় দেখা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, কিন্তু ভয়ের প্রবলতর শক্তির কাছে আমরা পরাজিত হয়ে যাই। আমরা যখন ভয়ে কাতর হয়ে যাই তখন ভয় যেন আমাদের শরীরের অভ্যন্ত্মরস্থ সব অঙ্গগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলে। আবার আমরা যখন ভয় পাই তখন ভয় যেন আমাদের কানে কানে ফিস ফিস করে বলে যায় ভয়ের কথা। তাই যদি আমরা ভয়কে নিয়ন্ত্রণ না করি, তাহলে দেখা যাবে যে একসময় আমরা মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে ভয়ের অধীন হয়ে যাব।

ভয়কে আমরা যদি আরও সংজ্ঞায়িত করতে চাই তাহলে বলা যায়, ভয়কে আমরা দৃশ্যমান পাই না কিন্তু সেটা আমাদেরকে পিস্ট করে ছাড়ে আমরা অগ্রসর হতে পারি না। ভয় আমাদের বোধশক্তি শূণ্য করে দেয়। আমাদেরকে সাময়িকভাবে হলেও থামিয়ে দেয়। অন্ধ ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রয়োজন সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং অধ্যবসায়।

ভয়ের কারণে আমাদের পশ্চাদপদতা ঃ

একজন মানুষ বিভিন্ন কারণে ভয় পেতে পারে। যেমন– নিরাপত্তার ভয়, সামজিক ভয়, পারিবারিক ভয় বার্ধক্যের ভয়, অসুস্থতার ভয়, দারিদ্যের ভয়। ভুতের ভয়, মৃত্যু ভয় একাকীত্বের ভয় ইত্যাদি। তবে যে ধরনের ভয়ই হোক না কেন তার কারণে আমাদের পশ্চাদপদতার শেষ নেই। যেমন–

১. ব্যক্তিগত জীবনে ভয়ের প্রভাব ঃ

ব্যক্তিগত জীবনে ভয়ের প্রভাব কতটা মারাত্মক হতে পারে তা অকল্পনীয়। যেমন– একজন মানুষ যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন কিন্তু সে প্রচন্ড ভীততার যোগ্যতা নিয়ে, তার সাথে অন্যান্যদের সম্পর্ক নিয়ে। কিংবা সে অহেতুক ভীত তার ভবিষ্যত জীবন নিয়ে। এ সমস্ত ভীতির কারণে যা হবে তা হচ্ছে সে কখনও তার যোগ্যতা সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারবে না, অন্যান্যদের সাথে সম্পর্ক কখনই স্বাভাবিক রূপ লাভ করবে না। তার ভবিষ্যত জীবনও অহেতুক ঝামেলায় জড়িয়ে যাবে। এভাবে একজনের ব্যক্তি জীবন হতে পারে সমস্যার আবর্তনে আবর্তিত শুধুমাত্র অহেতুক ভয়ের কারণে।

২. সামাজিক জীবনে ভয়ের প্রভাব ঃ

অহেতুক ভীতির কারণে হয়ত কোনও বড় উদ্যোগ যা সমাজের জন্য মঙ্গলজনক হত সেটা নেয়া হয় না। এত সমাজ বঞ্চিত হয় বড় কোনও ভাল উদ্যোগের সুফল থেকে।

৩.ভয়ের কারণে শারীরিক প্রভাব ঃ

কথায় বলে "বনের বাঘে খায় না মনের বাঘে খায়।" সেজন্য সবসময় যদি আমরা রোগ-শোকের ভয় করি তাহলে দেখা যাবে, রোগ শোক যত না আমাদের শরীরকে কাবু করছে তার চেয়ে বেশি আমরা কাতর থাকছি রোগ-শোকের ভয়ে। কারণ মন হচ্ছে সকল শক্তির নিয়ন্ত্রা। আর সেই মনই যদি সবসময়ই ভীতসন্ত্রস্ত থাকে তাহলে শারীরিকভাবে অতটা শক্তিশালী কখনই হওয়া যায় না।

৪. ভয়ের কারণে মানসিক প্রভাব ঃ

অহেতুক ভয় একজন মানুষকে মানসিকভাবে সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু করে দেয়। আর ভয়ের কারণে অসুস্থ মন সবসময়ই আমাদেরকে ইতিবাচক চিন্তা থেকে বিরত রাখে।

৫.ভয়ের বহুবিধ প্রভাব ঃ

একজন মানুষ ভয়ের কারণে পেশাগত জীবনে, শিক্ষাজীবনে, দাম্পত্যজীবনে নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা এসে সামনে দাঁড়াতে পারে।

অহেতুক ভয় থেকে মুক্তির চেষ্টা ঃ

এই পৃথিবীতে ভয় পায় না এরকম একটি মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু সফল মানুষ সে, যে ভয়কে জয় করতে পেরেছে। ভয়কে উপহাস করেছে। সাহসীকতার সঙ্গে ভয়কে মোকাবেলা করেছে। আর তার জন্য প্রয়োজন প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য, পরিশ্রম এবং নিজের প্রতি সৎ থাকার অপরিসীম চেষ্টা। সেই সঙ্গে প্রয়োজন মানুষের মাঝে যে শক্তি আছে তার পরিপূর্ণ ব্যবহারের চেষ্টা। নিজস্ব শক্তি ব্যবহার না করে মানুষ অনেক সময় শুধু ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে এমন মনে করে মানুষ সব প্রতিবন্ধকতা মেনে নেয়। সে সময় মানুষ বিপদ দেখে দুর্বল হয়ে পড়ে, অহেতুক ভয়ে ভীত থাকে। তাই অহেতুক ভয় থেকে মুক্তির অন্যতম প্রধান উপায় হল শুধু ভাগ্যের উপর নির্ভর না করে ভাগ্যেকে গড়তে চেষ্টা করা। সবসময় নেতিবাচক চিন্তা পরিহারও ভয় থেকে মুক্তির অন্যতম প্রধান উপায়। সর্বোপরি মানবজীবনকে যথার্থ সৌন্দর্যমন্ডিত করে তোলে তার নৈতিক মূল্যবোধ। আর মনুষ্যত্ব অর্জনের সাধনা। এই সাধনা বিফলে যাবে যদি না মানুষ অহেতুক ভয় থেকে মুক্তি লাভ না করে। মানুষের সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আদর্শবাদিতা ইত্যাদি গুনে সমাবেশেই নৈতিকতার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। কিন্তু নৈতিকতার স্বরূপ প্রকাশেও প্রতিবন্ধকতা আসে যদি না অহেতুক ভয় আমাদের পিছু না ছাড়ে। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, ভয়কাতর জীবন নিয়ে বেঁচে থাকাও অবমাননাকর। ভীiæতা, কাপুiæষতা ও জড়তা পরিহার করে আত্মশক্তিতে শক্তিমান হয়ে বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করে জীবনের সাফল্য আনতে হবে। সংসার বড়ই জটিল জায়গা, আমরাও বিভিন্ন জটিল সমস্যায় আক্রান্ত। সাহসের সঙ্গে এসবের মোকাবেলা করাই সবচেয়ে মর্যাদাকর। যারা ভয় পায় তাদেরকে বিপদ আরও বেশি গ্রাস করে। জীবনের সাফল্যের পথকে মসৃণ করতে হবে। নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস রেখে কবির কথায় বলতে হবে ঃ

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা,

বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

ইতিবাচক ভয়ের ফলাফল ঃ

ইতিবাচক ভয় অবশ্যই যুক্তি সঙ্গত এবং সার্বজনীন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মানুষ যদি আগুন, পানি, বোমা, এসিড, চোর, ডাকাত, সন্ত্রাস এগুলো সম্পর্কে ভীত থাকে তাহলে তার ফলাফল অবশ্যই ইতিবাচক। তাহলে এগুলো থেকে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাও অনেক কম থাকবে। আরও বলা যায়, রাস্তা দিয়ে বেপরোয়া গতিতে গাড়ী চালালে যদি অ্যাকসিডেন্টের ভয় না থাকে তাহলে একদিন না একদিন দুর্ঘটনা অবশ্যই ঘটবে; বরং এক্ষেত্রে ভীত হওয়াটাই জাiæরী। সাঁতার না জেনে পানিতে নামলে ডুবে যাওয়ার ভয় থাকবে। আর এ ভয়টা জীবন রক্ষার জন্য জাiæরী। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার ভয় না থাকলে কৃতকার্যতা আসবে না। সুতরাং ইতিবাচক ভয় আমাদের জীবনে গ্রহণযোগ্য।

ভয় দূর করতে মেডিটেশন ঃ

নেতিবাচক ভয়কে দূর করার চিন্তা করা মাত্র হয়ত দূর করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন নিষ্ঠাসহকারে দীর্ঘদিনের চেষ্টা। প্রয়োজন সঠিক উপায়ে চেষ্টা। মেডিটেশনের সাহায্যে আমরা আমাদের অহেতুক ভয়কে দূর করার জন্য প্রয়োজনে মনছবির সাহায্য নিতে পারি। প্রয়োজনে নিজেরদের অটোসাজেশন দিতে পারি।

মেডিটেশন (নিরাময় সেন্টার ও গুiæজী)

আলতো করে চোখ বন্ধ কiæন। চার থেকে পাঁচ বার ধীরে ধীরে দম নিন, ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। মনে মনে বলুন, আরাম আরাম, আরাম। পুরোপুরি শিথিল হয়ে গেছেন আপনি। ভাবুন, আলফা ড্রইং iæমের বামপাশে সুন্দর একটি প্রবেশ পথ। এই প্রবেশ পথ দিয়ে গেলেই আলফা ড্রইং iæমের কাছাকাছি আরেকটি iæম যার নাম নিরাময় সেন্টার। এখানে দুটি চেয়ার পাতানো। একটি ডানদিকে, একটি বামদিকে। পুরো নিরাময় সেন্টারটি ঝকঝকে তকতকে এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো। এমন কোনও পৃথিবীতে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি নেই, যা এই নিরাময় সেন্টারে নেই। এই যন্ত্রপাতির দ্বারা আপনি যে কোনও কঠিন রোগের অপারেশন পর্যন্ত্ম সফল করতে পারেন। এর পরে যখনই আপনি শিথিলায়নের পর্যায়ে গিয়ে এক হতে দশ পর্যন্ত্ম গণনা করবেন, তখনই আপনি নিরাময় সেন্টারে গিয়ে পৌঁছে যাবেন। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ। অনুধাবন কiæন আপনি আপনার নিরাময় সেন্টারে পৌঁছে গেছেন। এবার বামের চেয়ারটায় আরামকরে বসুন। অনুধাবন কiæন, আপনি যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছেন, তার পাশেই একজন দাঁড়িয়ে আছেন। বুঝতে পারলেন, উনিই গুiæজী। উনিই আপনাকে সর্ব বিষয়ে পথ দেখাবেন এবং কঠিন অপারেশনে পর্যন্ত্ম সহায়তা করবেন। আপনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। দেখলেন সুন্দর পাঞ্জাবী, পায়জামা পরিহিত সর্ববিষয়ে জ্ঞানী গুiæজী আপনার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনি সালাম দিলেন এবং কুশল বিনিময় করলেন। গুiæজীর সাথে হাত মিলালেন এবং গুiæজীকে ডানের চেয়ারে বসতে দিলেন। এবার আপনার মনঃপুত যে কোনও মানুষকে আপনার সামনে দাঁড় করান। মাথা থেকে পা পর্যন্ত্ম ভাল করে দেখুন তার কোনও সমস্যা আছে কিনা। তার মাথা, হার্ট, ফুসফুস, লিভার, কিডনী, অগ্ন্যাশয় এবং শরীরের সমস্ত্ম কিছু ভাল আছে কিনা। যদি ভাল থাকে লাল দেখাবে। যে জায়গায় সমস্যা থাকবে কাল কাল ছাই বর্ণের দেখাবে। এছাড়াও আপনি যদি বুঝতে না পারেন, গুiæজীকে জিজ্ঞেস কiæন, গুiæজী আপনাকে সর্বাঙ্গীণভাবে সহায়তা করবেন। এখন দেখুন তার যে জায়গায় কাল কাল ছাই বর্ণ দেখা যাচ্ছে সেই জায়গাগুলোতে, আপনি একটা রাবার দিয়ে মুছে নিন। আপনাকে আগেই বলেছি; এই নিরাময় সেন্টারে সমস্ত্ম কিছু আপনার হাতের নাগালেই রয়েছে, সেখানে থেকে একটি রাবার নিন। যেখানে যেখানে কাল কাল ছাই বর্ণ দেখা যাচ্ছে, সেই জায়গাগুলো রাবার দিয়ে মুছে দিন। দেখবেন সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠছে। এভাবে যতবার আপনি নিরাময় সেন্টারে ঢুকবেন ততবার দেখবেন আপনার গুiæ আগে থেকেই ডান চেয়ারে বসে আছে। আপনি নিরাময় সেন্টারে ঢুকেই গুiæজীকে সালাম দিবেন। কুশল বিনিময় করবেন। হাত মেলাবেন এবং আপনার চেয়ারে বসবেন। এবার আপনার কোনও কিছু জানার থাকলে গুiæজীকে প্রশ্ন কেরবেন। গুiæজী আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিবেন। বাস্ত্মবে গুiæজী আপনার জীবনের অনেক কিছু না জানলেও এক্ষেত্রে গুiæজী আপনার চেয়ে মহাজ্ঞানী এবং মনোজাগতিক সকল সমস্যার পথ প্রদর্শক। গুiæজী আপনার পছন্দমত যে মনোজাগতিক সকল সমস্যার পথ প্রদর্শক। গুiæজী আপনার পছন্দমত যে কাউকেই মানতে পারেন। হতে পারে আপনার পরিচিত শিক্ষক, মসজিদের ইমাম কিংবা আপনার কোনও প্রিয় ব্যক্তিত্ব। অথবা অপরিচিত কাউকেই মানতে পারেন। যাকে আপনি আপনার কল্পনায় মনের মত করে রূপ দেবেন। তবে হ্যাঁ, আপনি যার কাছে মেডিটেশন শিখছেন তাকেই গুiæজী মানলে আপনার জন্যই সুবিধা হয়, সহজ হয়। এর পরে যতবার আপনি সমস্যায় পড়বেন, আপনার নিজের কল্যাণে কিংবা অন্যের কল্যাণে ততবারই শিথিলায়নে গিয়ে এক হতে দশ গোনার সাথে সাথে আপনি নিরাময় সেন্টারে গিয়ে উপস্থিত হবেন। দেখবেন নিরাময় সেন্টারে আপনার গুiæজী আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনার যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে এক থেকে পাঁচ গণনা করে আপনি নিরাময় সেন্টার থেকে বেরিয়ে আসুন। ধীরে ধীরে চোখ খুলুন। হাত পা নাড়ুন। অনুভব কiæন আপনাকে কত প্রাণবন্ত্ম এবং সজীব দেখাচ্ছে।

কিভাবে জীবনে সফল হওয়া যায়

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই চায় জীবনে সফল হতে। আমরা সবাই সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখি প্রতিটি মুহূর্তে। আমাদের শিক্ষা জীবনে, চাকুরীতে, ব্যবসায়ে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, অন্যান্যদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখি। কিন্তু সফল হওয়ার ব্যাপারটা অনেকটা চ্যালেঞ্জিং।

সাধারণত আমরা দেখি বেশির ভাগ মানুষই হয়ত বিশ্বাস করে যে, তারা বড় কোন সাফল্য অর্জন করতে পারবে না করণ তাদের যথেষ্ট প্রাচুর্য নেই, তাদের যথেষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। তাদের যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা নেই। এ ধরনের নেতিবাচক চিন্তায় তাদের মন সব সময় পরিপূর্ণ থাকে। তারা ভাগ্যকেও সব সময় দোষারোপ করে থাকে। ভাগ্য তাদের সুপ্রসন্ন নয়। তাদের জন্ম হয়েছে সাফল্য অর্জন করার জন্য নয়। এছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক চিন্তায় তাদের বিশ্বাস এক সময় খেই হারিয়ে ফেলে।

কিন্তু একজন মানুষ জানে না তার দ্বারা কতটুকু সাফল্য অর্জন সম্ভব হতে পারে। দরকার শুধু বিশ্বাস এবং পরিশ্রম সেই সঙ্গে সঠিক দিক-নিদের্শনা।

বিশ্বাসের ভিত্তিটা খুবই মজবুত এবং দৃঢ় হতে হবে। একজনকে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিশ্বাসগুলো আস্থার সঙ্গে অর্জন করতে হবে। যেমন–

১. আমি অবশ্যই সফলকাম হব।
২. আমি সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করব অবশ্যই।
৩. আমি এই পৃথিবীর সবচেয়ে সফল একজন মানুষ।

উপরোক্ত চিন্তাগুলো ইতিবাচকভাবে মনের মাঝে গাঁথা থাকতে হবে।

মানুষ যদি নিজের ভাবনা নিজে না করে তাহলে এই পৃথিবীর অন্য কেউ তার চিন্তা-ভাবনা করে দেবে না। আর সেটা সফলকাম হওয়ার পূর্বশর্ত।

এই পৃথিবীতে একজন সফল শিক্ষক, ব্যবসায়ী, প্রশাসক, রাজনীতিবিদ, গায়ক, অভিনেতা, খেলোয়াড়, গবেষক, চাকুরে এদের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যাবে প্রত্যেকেরই একটা বিষয়ে মিল রয়েছে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, তারা যা করছে সেটা প্রকৃতপক্ষে যা করার ছিল সেরকমই হচ্ছে। অর্থাৎ তারা একদম পারফেক্ট। নিজেদের নিয়ে তারা কখনও দ্বন্দে ভুগেনি। সবসময়ই তারা ভেবেছে কিভাবে সাফল্যের শীর্ষে আরোহণ করবে। একসময় ঠিকই তাদের বিশ্বাসের বলে তারা সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। সফলহওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সামনে বাধা আসেনি তা নয়। কিন্তু কোনকিছুই তাদের দমাতে পারেনি। তবে বিশ্বাসের সাথে সাথে সমান্তরালভাবে একজনকে পরিশ্রমী হতে হবে।

সুতরাং, বলা যায় সফল হওয়ার জন্য আমরা অনেক পদক্ষেপই গ্রহণ করতে পারি।

প্রথমত ঃ উপলব্ধি করতে হবে নিজের যোগ্যতার মাত্রা সম্পর্কে। তারপর বিশ্বাসের ভিত্তি মজবুত করে অধ্যবসায় চালিয়ে যেতে হবে।

কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দৃঢ়ভাবে চেষ্টা চালিয়ে না গেলে শুধু শুধু বিশ্বাস স্থাপন করে খুব একটা সফল হওয়া যাবে না।

দ্বিতীয়ত ঃ সবসময় পজিটিভ চিন্তা কিংবা ইতিবাচক চিন্তাগুলোকে মস্তিষ্কে ঠাঁই দিতে হবে। যেমন–

– আমি একজন সফল মানুষ।

– আমি ঠিক যেমনটি চাই তেমন সাফল্যই আসবে।

– আমি একজন ধনী মানুষ হব কারণ আমার সেই যোগ্যতা আছে।

– আমি একজন সফল শিক্ষাবিদ হব কারণ আমার সেই মেধা আছে।

–আমি পারিবারিক জীবনে সফল হব কারণ আমার সেই একন্তু ইচ্ছা আছে ইত্যাদি।

তৃতীয়ত ঃ কখনই নেতিবাচক চিন্তাসমূহকে মনে ঠাঁই দেয়া যাবে না। যেমন– আমি এ কাজ পারব না। আমার যোগ্যতা নেই। আমি মানুষের যাথে মিশতে পারি না। আমি সামাজিক নেই। আমার মেধা নেই। এধরনের নেতিবাচক চিন্তাভাবনাগুলো মন থেকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে।

চতুর্থত ঃ এরপর যে লক্ষ্য নিয়ে একজন সফল হতে চায় সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধারণা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে। লক্ষ্যের সাথে নিজেকে পুরোপুরিভাবে একাত্ম করতে হবে। অন্তরে লক্ষ্যকে সবসময় উজ্জ্বল রাখতে হবে। অক্ষ্যের সাথে সমগ্র কল্পনা, চিন্তা এবং অনুভূতিকে একাকার করে ফেলতে হবে।

পঞ্চমত ঃ এরপর মনছবি দেখতে হবে। বিশ্বাসযুক্ত সৃজনশীল কল্পনার নামই হচ্ছে মনছবি। মনছবি ছাড়া ইচ্ছাশক্তি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না মনছবি দ্বারা আমাদের অন্তঃস্থ শক্তি প্রচন্ডভাবে উজ্জীবিত হয়। মনছবি দেখা যতই একজনের পক্ষে কঠিন হোক না কেন প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি এবং পরিশ্রম দ্বারা সেই বাধা অতিক্রম করা সম্ভব।

সুতরাং সফল হওয়ার জন্য একটু একটু করে অগ্রসর হতে হবে। প্রথমেই সাফল্য আসবে এরকম ভাবা ঠিক না। দিনের পর দিন চেষ্টা চালিয়ে এক সময় সফলকাম হব এই মনোভাব পোষন করে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

উদাহরণস্বরূপ, বলা যায় বর্তমান যুগ হচ্ছে কম্পিউটারের যুগ শুধুমাত্র ই-মেইলের মাধ্যমে লক্ষ কোটি মাইল দুরবর্তী স্থানে আমরা যোগাযোগ করতে পারছি এক মুহূর্তে। ওয়েবসাইটে মুহূর্তেই ভেসে উঠছে লক্ষ লক্ষ তথ্য যা আমাদের প্রয়োজন। তথ্যপ্রযুক্তির এই উন্নতি একদিনে হয়নি। বহু বছরের চেষ্টায় আজকের এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ। সুতরাং আমাদের উচিত ধৈর্য ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তাহলে যে কোনও লক্ষ্যে সাফল্য অবশ্যই সুনিশ্চিত।

মহেঞ্জোদারো সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত মূর্তির
প্রতিকৃতি : অভয়মুদ্রা রত ধ্যানী

বাম হাতে আলিফ লাম হে

অভয় সংকেত

প্রাচীন মুণি, ঋষি, সাধকগণ বিভিন্ন অলৌকিক শক্তি বলে অসাধ্য সাধ্য করতেন। তারা বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণ করতেন। দরবেশগণ দিনের পর দিন ইসম জপ্ করতেন বা জিকির করতেন। দরবেশদের এই ইসমগুলোর মধ্যে রয়েছে 'আ্jøাহু', 'ইয়া হু', 'ইয়া হক'সহ বিভিন্ন জিকির। ঋষিরা জপ করতেন 'ওম'সহ বিভিন্ন ধরনের জপ মন্ত্র। এগুলোর একটি ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া যায় যে, যাই উচ্চারণ করা হোক না কেন তার ফলাফল অবশ্যম্ভাবী। কোনও কার্য সাধানের কথা মনে করেও তারা এমন করতেন। কারণ তারা বিশ্বাস করতেন যে, এতে সমস্যা সমাধানের জন্য যে মনোদৈহিক অবস্থার প্রয়োজন হয় তা সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে দেখা যেত যে তাই হচ্ছে।

মার্শাল আর্ট যারা চর্চার করেন তারাও শক্তি প্রয়োগ করার আগে ধ্বনি উচ্চারণ করেন। তারা হয়ত এক হাত দিয়ে ১০/১২টি বরফের ¯ø্যাব ভেঙ্গে ফেলার আগেও এক ধরনের ধ্বনি উচ্চারণ করছেন। এটা তারা করেন দেহ ও মনের শক্তি এক হওয়ার জন্য।

আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে বিষয়টিকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

কনডিশন রিফ্লেক্স সম্পর্কে ব্যাখ্যা ঃ

কনডিশন রিফ্লেক্স সম্পর্কে বিখ্যাত iæশ বিজ্ঞানী ইভান পাভলভ কুকুর নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি তার গবেষণাগারে কুকুরকে নির্দিষ্ট সময়ে খাবার দিতেন। খাবার দেয়ার সাথে সাথে কুকুরের মুখ দিয়ে লালা বের হত। খাবার ও মুখের লালার সাথে রয়েছে এক অচ্ছেদ্য যোগাযোগ। এরপর পাভলভ কুকুরকে খাবার দেয়ার সময় ঘনটা ধ্বনি বাজাতেন। ঘনটা ধ্বনি বাজানোর সাথে সাথে খাবার দিতেন এবং মুখ দিয়ে লালা পড়তো। এরপর একদিন ঘনটা ধ্বনি দিলেন কিন্তু ভাবার দিলেন না। কিন্তু দেখা দেলে কুকুরের মুখের লালাগ্রন্থি থেকে লালা ঝরছে। পাভলভ এই ঘটনাটি একই দিনের বার বার করলেন। প্রত্যেকবারই দেখা গেল ঘনটা ধ্বনি শোনার সাথে সাথে কুকুরের মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। কুকুরের মস্তিষ্ক ও লালাগ্রন্থি ঘনটা ধ্বনির সাথে
খাবারকে এক করে ফেলেছে। এজন্য ঘনটা ধ্বনির সাথে খাবার দেয়ার প্রয়োজন হয় না। ঘনটা ধ্বনিই কুকুরের লালাগ্রন্থিকে সচল করে দিয়েছে। ঘনটা ধ্বনির সাথে লালা নিঃসরনে কোনও বাস্তব কারণ না থাকলেও কিছুদিন অভ্যাসের ফলে তা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং সেটা কুকুরের সত্তার সাথে মিশে গেছে। এটাই হচ্ছে পাভলভের বিখ্যাত ***কনডিশন রিফ্লেক্স মতবাদ। এ মতবাদ অনুসারে বলা যায়, দু'ধরনের উদ্দীপকের সাথে কোন অবস্থাকে যুক্ত করলে, পরে যদি আসল উদ্দীপককে সরিয়ে নেয়া হলেও সকল উদ্দীপকের প্রভাবে একই অবস্থার সৃষ্টি হয়।***

তবে শুধু মুখের লালার ক্ষেত্রে নয়, প্রাণীর শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাও পাভলবের কনডিশন রিফ্লেক্স দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্সস্টিটিউট অব হেলথ্-এর গবেষক ডাঃ হার্বার্ট স্পেকটর একদল মূষিকের

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বড়ানোর জন্য টি-সেলকে তৎপর করে তুলতে পলি আই সি নামে পরিচিত রাসায়নিক ইনজেকশন দেন। সেই সঙ্গে যখন মূষিকদের পলি-আই-সি ইনজেকশন দেয়া হতো তখন কর্পূরের গন্ধ ছাড়ানো হতো। এরকম অবস্থা অব্যাহত থাকলো প্রায় কয়েক সপ্তাহ। এরপর ইনজেকশন দেয়া বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কর্পূরের গন্ধ ছাড়ানো হত। ডাঃ স্পেকটর লক্ষ্য করলেন যে, শুধুমাত্র কর্পূরের গন্ধ ছাড়ানো হলেও মূষিকের রক্তের টি-সেল কাউন্ট বেড়ে গেছে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, কর্পূরের গন্ধের পরিবর্তে গোলাপের গন্ধ ব্যবহার করলেও ফলাফল একই দাঁড়াচ্ছে। আমাদের মনোদৈহিক অবস্থার ক্ষেত্রেও কনডিশন রিফ্লেকের বৈজ্ঞানিক ধারণাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। এই কনডিশন রিফ্লেক্স পদ্ধতি অনুসারে কোন ধ্বনি, মন্ত্র, ইসম, কোনও ভঙ্গি আমাদের কাছে হয়ে উঠতে পারে জাদুর মত। তবে এজন্য প্রয়োজন ক্রমাগত প্রচেষ্টা এবং কঠোর আত্মবিশ্বাস।

অভয় সংকেত ঃ

প্রচীন মুণি, ঋষিদের ভাস্কর্যসহ মহামতি বুদ্ধের ভাস্কর্য দেখলে আমরা দেখতে পাব যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এসব ভাস্কর্যে অভয় সংকেত পরিলক্ষিত হচ্ছে। একে অভয় মুদ্রা বা জ্ঞান মুদ্রাও বলা হয়। পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে বসা অবস্থায় এসব ভাস্কর্যে অভয় সংকেতের প্রদর্শন বিদ্যমান। অভয় সংকেত প্রকৃতপক্ষে কনডিশন রিফ্লেক্সের প্রাচীন প্রয়োগ।

অভয় সংকেতের প্রাচীন কথা বা ইতহাস ঃ

প্রচলিত আছে যে, বৌদ্ধ ধর্মের শÎæরা বুদ্ধকে সুকৌশলে হত্যা করার জন্য বুদ্ধ যে পথ দিয়ে যাতায়াত করতেন সে পথে এক পাগলা হাতীকে ছেড়ে দেয়। পাগলা হাতি উন্মুক্ত অবস্থায় বুদ্ধের দিকে ছুটে আসছিল। হাতীকে তখন উন্মত্ত অবস্থায় দেখে আশীবাদের ভঙ্গিতে বুদ্ধ হাত উঁচু করে অভয় সংকেত প্রদর্শন করেন। হাতী তখন আস্তে আস্তে বুদ্ধের সামনে বসে পড়ে। বুদ্ধ হাতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। এরপর তাঁর গন্তব্যে চলে যান।

অভয় সংকেত সম্পর্কিত কিছু ব্যাখ্যা ঃ

অভয় সংকেত কেন বৃদ্ধাঙ্গলী ও তর্জনীর সমন্বয়ে শুধুমাত্র ২ আঙ্গুলে করা হয়। এটা ৩ বা ৪ আঙ্গুল মিলিয়ে করা হয় না। এর জন্য জ্যোতিষ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে।

ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ক্ষেত্র হচ্ছে শুক্র বা ভেনাসের ক্ষেত্র। তর্জনীর ক্ষেত্র হচ্ছে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে। জ্যোতিষ বিজ্ঞানে শুক্র ও বৃহস্পতি এই দুটো গ্রহই প্রবৃদ্ধি। শুধু তাই নয় সাফল্যের প্রতীক এবং কল্যাণের প্রতীক বলেও বিবেচনা করা হয়। আর হাতের মাঝের আঙ্গুল বা মধ্যমার ক্ষেত্রে শনির ক্ষেত্ররূপে বিবেচিত। শনি হচ্ছে এবং বিলম্বের প্রতীক। প্রাচীন সাধকরা এ কারণে ভেনাসও জুপিটারের প্রবৃদ্ধিকেই সংযুক্ত করেছেন। কিন্তু শনির প্রভাবকে সঙ্গত কারণেই যুক্ত করতে চাননি। তারা অভয় সংকেত হাতের দু'আঙ্গুল অর্থাৎ তর্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গলী দিয়েই করেছেন। বর্তমানে আধুনিক সফলকাম বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিত্বরাও সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য অভয় সংকেতের প্রদর্শন করছেন।

অভয় সংকেতের অরেকটি ব্যাখ্যা ঃ

অভয় সংকেতের অরেকটি ব্যাখ্যা রয়েছে। ডান হাতে অভয় সংকেত করে আমাদের সামনে নিয়ে আসলে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, হাতে আরবী “আলিফ”, “লাম”, “হে” অর্থাৎ আjøাহু হয়ে আছে। অর্থাৎ কেউ যখন অভয় সংকেত করছে তখন সে প্রকৃতপক্ষে আjøাহ্‌কেই স্মরণ করছে। অর্থাৎ সে তার সৃষ্টিকর্তাকেই স্মরণ করছে। আর সৃষ্টিকর্তাকে আন্তরিকভাবে স্মরণ করার মানে হচ্ছে যে কোনও সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত করা।

মেডিটেশন এবং অভয় সংকেত ঃ

আমরা জানি মেডিটেশন চর্চার সময় আমরা যখন আশীর্বাদপূর্ণ আলফা লেভেলে পৌঁছাতে পারি তখন আমাদের ব্যক্তি চেতনার সাথে মহাচেতনার যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। তখন আমাদের মন যেভাবে চাইবে সেভাবেই আমাদের সমস্যার সমাধান হবে। আর এক্ষেত্রে অভয় সংকেত আমাদের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। অর্থাৎ মেডিটেশন চর্চার প্রাক্কালে অভয় সংকেত করার ফলkÖæতিতে আমাদের মেডিটেশনের আলফা লেভেলে পৌঁছা সহজতর

হয়ে যাবে। অভয় সংকেতের মাধ্যমে আমরা যে উদ্দেশ্যে মেডিটেশন করতে চাইছি, সেই উদ্দেশ্যে সফলতা আনয়নও সহজতর হবে।

অভয় সংকেতের ব্যবহার ঃ

যে কোন কল্যাণকর, ইতিবাচক কাজেই অভয় সংকেত ব্যবহার করা যাবে যেমন–

১. পড়াশোনার ক্ষেত্রে ঃ

যে কোন কঠিন বিষয় বা স্বাভাবিক পড়াশোনা করার আগে অভয় সংকেত দ্বারা শুiæ করতে হবে। মনে মনে ভাবতে হবে যে, যা পড়ছি তা যেন ভালভাবে পড়া হয় এবং মনে থাকে। এছাড়া ক্লাসiæমেও অভয় সংকেত করে লেকচার শোনা যেতে পারে।

২. পরীক্ষা দেয়ার সময় ঃ

যে কেউই পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় নার্ভাস অনুভব করে। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে অভয় সংকেত করে মনে মনে ইতিবাচক চিন্তা করতে হবে যেন পরীক্ষায় যা প্রশ্ন আসে সব মনে পড়ে এবং সব লিখতে পারা যায়। এছাড়া কোনও মৌখিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে, ভাইভা বোর্ডে যাওয়ার আগে অভয় সংকেত প্রদর্শন করে তারপর গেলে যে কেউ আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে।

৩. ব্যবসা ক্ষেত্রে ঃ

নতুন কোনও ব্যবসা শুiæ করতে গেলে কিংবা কারও সাথে কোনও ব্যবসায়িক লেনদেন শুiæ করার প্রাক্কালে অথবা কারও সাথে কোনও চুক্তি করতে গেলে অভয় সংকেত প্রদর্শন করে শুiæ করলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

৪. মন-মানসিকতার ক্ষেত্রে ঃ

কোনও কারণে মন খারাপ হলে কিংবা কোনও কারণে নিজের রাগ, ক্রোধ, ক্ষোভ প্রশমন না করতে পারলে অভয় সংকেত প্রদর্শন করে ভাবতে হবে যে, নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি। এভাবে মন-মানসিকতার ক্ষেত্রে অভয় সংকেত একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫. ভীতি দুর করতে ঃ

মানুষ যে কোনও কারণে অহেতুক ভয় পেতে পারে। সে ভয় হতে পারে ভূতের ভয়, নিরাপত্তার ভয়, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার ভয়, লোকভয়, ব্যর্থতার ভয়, দারিদ্র্যের ভয় ইত্যাদি। যেকোন ভয়েই অভয় সংকেত করলে ভীতি দূর হবে। তবে অভয় সংকেত যে করছে, তা অন্যকে দেখানোর কোনও প্রয়োজন নেই।

৬. কারো সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে ঃ

আমরা হয়ত কারো সাথে কথা বলতে চাইছি, কিন্তু জানি যে, সে অতটা ন্যায়পরায়ণ কিংবা যুক্তিপরায়ণ নয়। কিন্তু তার সাথে কথা বলা জাiæরী। সেক্ষেত্রে অভয় সংকেত করে তার সাথে কথা বলতে গেলে অবশ্যই প্রয়োজন মোতাবেক কথা বলা যাবে।

৭. অপ্রীতিকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঃ

উদাহরণস্বরূপ, বলা যায় যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বা কেউ বাড়ি ফিরতে দেরি করছে। কেউ হঠাৎ অকারণে ভুল বুঝতে শুiæ করছে। কিংবা কোনও কারণে ঝগড়া লেগে যাচ্ছে। এধরণের পরিস্থিতিতে অভয় সংকেত প্রদর্শন করে মনে মনে ভাবতে হবে যে, সব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে। সব ধরনের উত্তেজনাই প্রশমিত হবে।

৮. প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে যাওয়ার আগে কিংবা কোনও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঃ

হঠাৎ কোনও জিনিস কেনার প্রয়োজন হলে যেমন– কোনও ওষুধ কিনতে যাওয়ার প্রয়োজন, কোনও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন তার পূর্বে অভয় সংকেত করে মনে মনে ভাবতে হবে যে, যা কিনতে যাচ্ছি কিংবা যা সংগ্রহ করতে যাচ্ছি সবই পেয়ে যাব। অবশ্যই তা বাস্তবেও পরিণত হবে।

৯. রাস্তাঘাটে বের হওয়ার আগে ঃ

রাস্তাঘাটে বের হতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে তখন ভীড় করে যে, কত ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কিংবা গন্তব্যস্থলে নির্বিঘ্নে পৌঁছাতে পারব কিনা। সেক্ষেত্রে যে ব্যাপারটি গুiæত্বপূর্ণ আর তা হচ্ছে অভয় সংকেত করে নিজের মনে ভাবতে হবে যে, গন্তব্যস্থলে ঠিকভাবে পৌঁছানো যাবে। কোনও রকম কোনও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে না।

১০. সুস্থতার জন্য ঃ

সুস্থতার জন্য প্রতিদিন তিনবার অভয় সংকেত করে ভাবা যেতে পারে যে, আমি সুস্থ থাকব কিংবা ভাল থাকব। কিংবা কোনও রাগে-শোকে অভয় সংকেত প্রদর্শন করে মনে মনে ভাবা যেতে পারে যে, আমার রোগ শোক নিরাময় হয়ে যাবে। সর্বোপরি উপকার হবে বা ইতবাচক দিক আছে এমন যে কোনও কাজেই অভয় সংকেত ব্যবহার করা যেতে পারে। উপরে উjøখ করা হয়নি কিন্তু ইতিবাচক দিক সম্পন্ন তাহলে সেক্ষেত্রেও অভয় সংকেত ব্যবহার করা যেতে পারে।

অভয় সংকেত ব্যবহারে নিষেধ ঃ

সবসময়ই প্রয়োজনীয় এবং ইতবাচক দিক আছে বা জাiæরী জায়গায় অভয় সংকেত ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু খাম-খেয়ালীর বশে কিংবা অন্যের ক্ষতি হবে এমন কোনও ক্ষেত্রেই অভয় সংকেত ব্যবহার করা যাবে না। অথবা কোনও ক্ষতিকর দিক কিংবা কোনও নেতিবাচক দিক আছে এমন কোনও ক্ষেত্রেই অভয় সংকেত ব্যবহার করা যাবে না।

লাইফ শাইনিং মেথডের সাহায্যে নিরাময়

আমাদের এই মানবদেহ ভীষণ রহস্যময়। আমরা যদি আমাদের দেহ এবং শরীরবৃত্তীয় কাজ কর্মের কথা চিন্তা করি তখন সত্যিই আমরা অবাক না হয়ে পারি না। আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজকর্ম এক সুনির্দিষ্ট নিয়মতন্ত্রে বাঁধা। ধরা যাক, আমাদের শরীরে কোথাও কাঁটা ফুটল। সাথে সাথেই একটা বেদনার অনুভূতি আমাদের সুক্ষ্ম স্নায়ূ-কেন্দ্র ধাক্কা দিবে। আর সেই ধাক্কা আমাদের মস্তিস্কে পৌঁছে যাবে। মস্তিস্ক থেকে একটা সাবধান বাণী আমরা অনুভব করব যে কাঁটা ফোটার স্থান থেকে আমাদের আঘাত প্রাপ্ত শরীরের অঙ্গকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এরকম অনেক অবাক করা উদাহরণ দেয়া যাবে যা আমাদের শরীরের বিভিন্ন ধরনের কাজ। মানব দেহের সৃষ্টিশৈলীও অত্যন্ত বিস্ময়কর। আমাদের শরীর ক্ষzদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমষ্টি। আমাদের শরীরে রয়েছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। দৈহিক প্রতিরোধ ক্ষমতা ছাড়াও আমাদের রয়েছে মানসিক প্রতিরোধ ক্ষমতা। বিভিন্ন কারণে আমরা রোগাক্রান্ত হই। তার মধ্যে যেমন শারীরিক অসুস্থততা রয়েছে আবার মানসিক অসুস্থতাও রয়েছে। তবে মনের ব্যাপারটি বিশেষ গুiæত্বপূর্ণ কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন গবেষণার পর বলেছেন, ***"মন সেরা ডাক্তার আর মানবদেহ সেরা ফার্মেসী।"***

বেশির ভাগ ক্ষেতেই বিভিন্ন রোগের কারণ মানসিক। আমাদের মন সবকিছুর নিয়ন্তা। মনের শক্তি অপরিসীম। আমরা মনের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে সেই সঙ্গে মনের শক্তিকে বাড়িয়ে বিভিন্ন রোগ নিরাময় করতে পারি। হতে পারে সেই রোগ মানসিক কিংবা শারীরিক।

তবে মনকে নিয়ন্ত্রণ এবং মনের শক্তি বাড়ানোর জন্য আমাদের সঠিক গাইড লাইন কিংবা সঠিক দিক-নির্দেশনার প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রে ***লাইফ শাইনিং মেথডের*** সাহায্যে মেডিটেশন চর্চা হতে পারে সঠিক গাইড লাইন। কারণ ***লাইফ শাইনিং মেথড*** একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি। এর সাহায্যে নিরাময়ে বিভিন্ন দিক এখানে তুলে ধরা হল ঃ

১. লাইফ শাইনিং মেথডের সাহায্যে শারীরিক নিরাময় ঃ

এই মেথডের সাহায্যে আমরা শিথিলায়নের চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাই। যখন পুরোপুরিভাবে আমরা আমাদের মনকে কেন্দ্রীভূত করতে পারি তখন আমরা আমাদের সকল ধরনের জাগতিক সচেতনতা থেকে মুক্ত হয়ে যাই। শরীরে কোন ব্যথা, অস্বস্থি, অসুস্থতা এগুলোও তখন নিরাময়ের সুযোগ পায়। আমরা মেডিটেশনের চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়ে নতুন করে শক্তি, উদ্যম গ্রহণ করতে পারি। বর্তমান বিশ্বে বহু ডাক্তার, বিশেষজ্ঞ মেডিটেশন চর্চার কথা তাদের রোগীদের বলছেন বিভিন্ন রোগের নিরাময়ের চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে। যেমন– মানসিক চাপ সংক্রান্ত অসুস্থতা, হৃদরোগ, হার্টের অসুখ, ফুসফুসের অসুখ, শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত অসুস্থতা, অ্যজমা, মাইগ্রেন, গ্যাস্ট্রিক, আলসার ইত্যাদি। লাইফ শাইনিং মেথডের সাহায্যে আমরা মেডিটেশন চর্চা নিরাময় করতে আমরা বিভিন্ন ধরনের রোগের নিরাময় করতে পারি। সেই সঙ্গে একটি সুস্থ, সুন্দর জীবন লাভে সমর্থ হতে পারি।

২. লাইফ শাইনিং মেথডের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের মানসিক এবং আবেগ সংক্রান্ত সমস্যার নিয়ন্ত্রণ ঃ

মানুষ মাত্রেই তার বিভিন্ন মানসিক সমস্যা থাকবে। যেমন– উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, ভয়, একাকীত্ব, হতাশা, নিজেকে খুব হীনমন্য ভাবা কিংবা নিজেকে খুব উঁচু মানের ভাবা ইত্যাদিসহ যে কোনও ধরনের মানসিক সমস্যা হতে পারে। এছাড়া মানুষ বিভিন্ন ধরনের প্রতিদ্বন্দিদ্বতা এবং সমস্যার সম্মুখীন হয়, বিভিন্নজনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়। কিন্তু যখন আমরা মেডিটেশন করি তখন আমরা গুপ্ত ঐশ্বরিক শক্তির কিছুটা হলেও সংস্পর্শে আসি। মেডিটেশন তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট ভালবাসাপূর্ণ আলোরূপে প্রতীয়মান হয়। মেডিটেশন চর্চা করতে করতে তখন আমাদের মাঝে এক উপলব্ধি জাগ্রত হয় যে আমরা কখনই এক নই। আমাদের সাথে আমাদের সৃষ্টিকর্তা আছেন। এরকম সুখ, আনন্দ, শক্তি একমাত্র আমরা মেডিটেশন চর্চার পরিপ্রেক্ষিতেই অনুভব করতে পারব। যখনই আমরা অন্তস্থ অনুভূতি অনুভব করতে পারব তখনই আমাদের সব ধরনের দুঃখ দুর্দশা দূরীভূত হতে থাকবে। মেডিটেশন চর্চার সময় আমরা যে অনুভূতি লাভ করব তা আমরা যখন আমাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যাপৃত থাকব তখনও আমাদের সাথেই থাকবে। সুতরাং ওষুধ, কিংবা অ্যালকোহল এসব বাদ দিয়ে মেডিটেশনের সাহায্যে মানসিক এবং আবেগ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা হচ্ছেন একটি চিরস্থায়ী সমাধান। কারণ মেডিটেশন হচ্ছে এমন একটি ওষুধ যা আমরা সবসময়ই আমাদের সাথে বহন করছি, যখন

যেভাবে প্রয়োজন সেভাবেই আমরা তা ব্যবহার করতে পারব। আর লাইফ শাইনিং মেথডের সাহায্যে মেডিটেশন চর্চায় আমাদের মাঝে আমরা সঞ্চিত করতে পারি অফুরান প্রাণশক্তি।

৩. লাইফ শাইনিং মেথডের সাহায্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা ঃ

লাইফ শাইনিং মেথডের সাহায্যে মেডিটেশন চর্চা আমাদের পুরাতন ধ্যান-ধারণাকে ভেঙ্গে সম্পূর্ণ আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক ধারণার সৃষ্টি করতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটি গল্পের কথা উýjøখ করা যায়। গল্পটি সম্রাট আকবরের জীবন থেকে নেয়া। একদিন সম্রাট আকবর তার রাজ-সভাসদদের কাছে একটি প্রশ্ন করেছিলেন। জানতে চাইলেন সভাসদদের কাছে তার প্রশ্নের উত্তর। তিনি বালিতে একটি লাঠি দিয়ে একটি রেখা লাইন আঁকলেন। তার প্রশ্ন ছিল সেই রেখাটিকে কেউ কোনও রকম স্পর্শ না করে রেখাটিকে কেউ ছোট করতে পাবে কিনা। তখন সভাসদদের মধ্যে বীরবল ছিলেন বুদ্ধি বিচক্ষণতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তখন বীরবল একটি লাঠি দিয়ে বালিতে আকেটি লাইন বা রেখা টানলেন যা সম্রাট আকবরের অঙ্কিত রেখার সামন্তরাল ছিল। কিন্তু বীরবলের অঙ্কিত সমান্তরাল রেখাটি সম্রাট আকবরের অঙ্কিত রেখার চেয়ে লম্বা ছিল। এভাবেই সম্রাট আকবরের অঙ্কিত সরল রেখা বা লাইনটি কোনও রকম স্পর্শ ছাড়াই ছোট হয়ে গেল।

উপরোক্ত ঘটনাটিকে যদি লাইফ শাইনিং মেথডের সাহায্যে মেডিটেশন চর্চার সাথে একীভূত করতে চাই তাহলে হয়ত অনেক পাঠকই অবাক হতে পারেন। কিন্তু এর ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া যেতে পারে যে, লাইফ শাইনিং মেথডের সাহায্য মেডিটেশন চর্চা করতে থাকলে হয়ত আমাদের জীবন থেকে যাদুর মত সব ধরনের দুঃখ-দুর্দশা, রোগ-শোক, অসুস্থতা, সমস্যা দূর হয়ে যাবে না। কিন্তু আমাদের জীবন একটি সঠিক দিক-নিদের্শনা মোতাবেক অগ্রসর হতে থাকবে। সবধরনের দঃখ-দুর্দশা, রোগ-শোক, অসুস্থতা, সমস্যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিরাময় হয়ে জীবন একটা সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অর্জনের মধ্যে দিয়ে আমরাও জীবনের অর্থ খুঁজে পাব। অর্থাৎ দুঃখ-দুর্দশা, সমস্যা, হতাশা, রোগ-শোক, কষ্ট, ব্যথা-বেদনা এগুলো থাকবেই জীবনে কিন্তু এগুলোর দ্বারা আমরা চাঁপা পড়ে যাবো না। এখানে বলা যেতে পারে যে, বীরবলের অঙ্কিত রেখাটি যদি লাইফ শাইনিং মেথডের সাহায্যে মেডিটেশন চর্চার সাথে তুলনীয় হয়ে থাকে, তাহলে সম্রাট আকবরের অঙ্কিত সরলরেখাটি আমাদের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, কষ্ট, রোগ-শোক, ব্যথা-বেদনার সাথে তুলনীয় হবে।

৪. লাইফ শাইনিং মেথডের সাহায্যে মেডিটেশন চর্চায় মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ

মেডিটেশন চর্চার মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করার ক্ষমতা অত্যাশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন– ক্যারিয়ার, লেখাপড়া, খেলা-ধূলা, সৃজনশীলতা, পেশাগত ক্ষেত্রে, যে কোনও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মেডিটেশন চর্চা শ্রেষ্ঠত্ব আনয়নের পথ সুগম করে। জ্ঞান অর্জনের বহুবিধ পথ সুপ্রশস্ত হয়। এছাড়া আধ্যাত্মিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। আধ্যাত্মিক জগতের সমৃদ্ধতা নিয়ে বর্তমান বিজ্ঞান খুব একটা গবেষণায় অগ্রসর হয়নি। কিন্তু মেডিটেশন চর্চার সাহায্যে আধ্যাত্মিক সচেতনতা বৃদ্ধি আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূতকরণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

৫. লাইফ শাইনিং মেথডের সাহায্যে মেডিটেশন চর্চায় মৃত্যুভয় দূর ঃ

একমাত্র মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমেই আমরা আমাদের আত্মাকে আমাদের দেহ হতে পৃথক ভাবতে শিখি। আমরা আত্মাকে নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে শিখি। মৃত্যুর পর আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে আমাদের প্রতিটি কর্মের হিসেব দিতে হবে। এ উপলব্ধি আমাদের মাঝে গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে যার জন্য মৃত্যুভয় দূর হয়ে আমরা ভাবতে শিখি যে এই পার্থিব জীবন ক্ষণস্থয়ী।

৬. লাইফ শাইনিং মেথডের সাহায্যে মেডিটেশন চর্চায় আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন ঃ

মেডিটেশন চর্চায় ক্রমশ আমাদের সচেতনতার বিস্তৃতি প্রসারিত হতে থাকে। আমরা আমাদের অন্তরে শান্তি, ভালবাসা অনুভব করতে থাকি। আমরা আljøাহ্‌কে অনুভব করার তাগিদ অনুভব করি। আর অন্তরে যদি এইiæপ অনুভূতি বিরাজমান থাকে, তখন স্বভাবিকভাবেই আমরা একে অন্যের প্রতি ভালবাসা অনুভব করতে পারব। আমরা আমাদের

পরিবার, সমাজ, জাতি, দেশ সকল কিছুর প্রতি সচেতন হয়ে উঠব, শান্তিপ্রিয় হয়ে উঠব। আjøাহ্র সৃষ্ট সকল সৃষ্টির মাঝে আমরা এক ঐকতান অনুভব করতে সক্ষম হব, যা এই পৃথিবীকে করবে সুন্দর থেকে সুন্দরতর।

৭. সর্বোপরি এই পৃথিবীকে সুন্দর করতে লাইফ শাইনং মেথড ঃ

লাইফ শাইনিং মেথডের সাহায্যে মেডিটেশন চর্চা করতে করতে যখন আমরা অন্তঃস্থ শান্তি নিজেদের মাঝে প্রতিষ্ঠা করতে পারব, তখন অন্তঃস্থ শান্তি সূর্যের আলোক রশ্মি যেরূপ বিচ্ছুরিত হতে থাকে সেরূপ বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। যার ফলkÖæতিতে এই বিচ্ছুরিত রশ্মি যাকেই স্পর্শ করবে সেই-ই যেন পরশ পাথর হয়ে উঠতে থাকবে। ভালবাসা, শান্তির সৌরভ বিকশিত হতে থাকবে আমাদের পরিবারে, বন্ধুদের মাঝে, সমাজে, দেশে সর্বোপরি এই পৃথিবীতে শান্তি, সুখ তথা ভালবাসার এক স্বর্ণযুগ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। মেডিটেশন চর্চার সাহায্যে এই পৃথিবীকে আমরা সাহায্য করতে পারি একটি উৎকৃষ্টতর স্থানে পরিণত হওয়ার জন্য।

তবে নিরাময়ের জন্য মেডিটেশনের পাশাপাশি প্রার্থনা করাটা কiæরী। যে কোনও মানুষ যে ধর্মালম্বীই হোক না কেন, নিজস্ব ধর্ম অনুযায়ী যে কেউ রোগমুক্তির জন্য, সমস্যা সমাধানের জন্য, যে কোনও কিছুর জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করতে পারেন।

আমাদের প্রিয় নবী হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন যে, প্রতিটি রোগের নিরাময় আছে। নিরাময়ের জন্য ঔষধ ছাড়াও তিনি দোয়ার উপর বিশেষ গুiæত্ব আরোপ করেছেন। তাই নিজের, অন্যের যে কোনও কিছু নিরাময়ের জন্য, জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের জন্য পরম কiæণাময়ের কাছে নিয়মিত প্রার্থনা করাটা জiæরী। চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ ল্যারীডসি বলেছেন যে, প্রার্থনা ও বিজ্ঞান পৃথক কিছু নয়।

সুতরাং নিরাময়ের জন্য লাইফ শাইনং মেথডের সাহায্যে মেডিটেশন চর্চার সাথে সাথে নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী নিয়মিত প্রার্থনা আমাদের জীবনকে করতে পারে সুন্দর, এই সমাজকে করতে পারে নিয়মতান্ত্রিক। সর্বোপরি এই পৃথিবীকে করতে পারে স্বর্গসম সুখের আবাসস্থল।